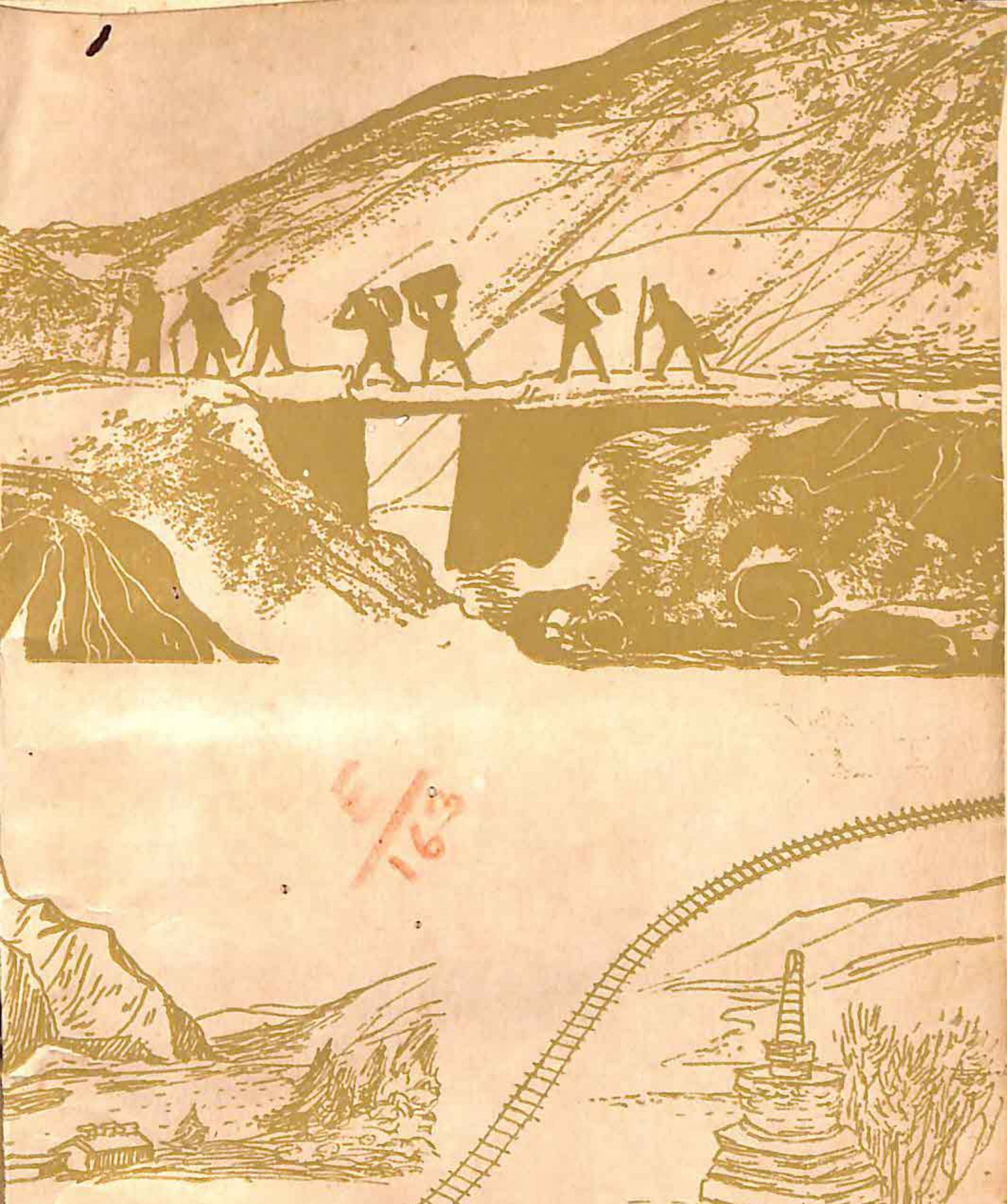


রম্যাণি বীক্ষ্য

রম্যাণি বীক্ষ্য

হিমাচল পর্ব

RAMYANI BEEKSHYA
HIMACHAL PARVA
(A Bengali Travelogue)
By Subodh Kumar Chakravarti
Price : Rs. 8·00 (eight) only.

রম্যাণি বীক্ষ্য

১. দক্ষিণ ভারত পর্ব   ২. দ্রাবিড় পর্ব   ৩. কালিন্দী পর্ব
৪. রাজস্থান পর্ব   ৫. সৌরাষ্ট্র পর্ব   ৬. মহারাষ্ট্র পর্ব
৭. উৎকল পর্ব   ৮. উত্তর ভারত পর্ব
৯. হিমাচল পর্ব

শাশ্বত ভারত

১. দেবতার কথা   ২. ঋষির কথা

এই লেখকের লেখা

রূপম্ ?	তুঙ্গভদ্রা
একটি আশ্বাস	কী মায়া
মণিপদ্ম	আয় চাঁদ
সেই উজ্জ্বল মুহূর্ত	আরও আলো
অয়ি অবন্ধনে	কল্কিরুবাচ
জনম জনম	মেঘ

রম্যাণি বীক্ষ্য

হিমাচল পর্ব

*　　*

শ্রীসুবোধকুমার চক্রবর্তী

*　　*

এ, মুখার্জী অ্যাণ্ড কোং (প্রাইভেট) লিঃ

প্রকাশক :
শ্রীঅমিয়রঞ্জন মুখোপাধ্যায়
ম্যানেজিং ডিরেক্টার
এ. মুখার্জী অ্যাণ্ড কোং প্রাঃ লিঃ
২ বঙ্কিম চ্যাটার্জী ষ্ট্রীট,
কলিকাতা-১২

তৃতীয় সংস্করণ, শ্রাবণ, ১৩৭২
দ্বিতীয় মুদ্রণ : কার্ত্তিক, ১৩৭১

প্রথম প্রকাশ : ভাদ্র, ১৩৭১

মূল্য টা. ৮·০০ (আট টাকা) মাত্র

প্রচ্ছদপট : সিদ্ধেশ্বর মিত্র

মুদ্রাকর :
শ্রীসুকুমার ভাণ্ডারী
রামকৃষ্ণ প্রেস
৬, শিবু বিশ্বাস লেন
কলিকাতা-৬

উৎসর্গ

শ্রীঅন্নদাশঙ্কর রায়

শ্রদ্ধাস্পদেষু

এই পর্বে পূর্ব পাঞ্জাবের কাহিনী বিবৃত হয়েছে। কিন্তু খণ্ডিত পাঞ্জাবে পঞ্চনদের গৌরব আর নেই। হিমালয়ের উপত্যকায় কয়েকটি ছোট রাজ্য নিয়ে যে হিমাচল প্রদেশ তার কথাও আছে। পঞ্চনদের বদলে হিমালয়ের মহিমা বেশি প্রকাশ হয়েছে বলেই এই পর্বের নাম হিমাচল পর্ব।

১২০, অফিসার্স কলোনি,
কাঁচরাপাড়া

গ্রন্থকার

সত্যং বৃহদ্ ঋতম্ উগ্রং
দীক্ষা তপো ব্রহ্ম যজ্ঞঃ পৃথিবীং ধারয়ন্তি।
সা নো ভূতস্য ভব্যস্য পত্ন্যুরুং লোকং পৃথিবী নঃ কৃণোতু ॥

—অথর্ববেদ, ১২।১।১

Truth, great law that is stern, consecration, austerity, prayer and sacrifice (ritual), these uphold the earth.
May that Earth, the mistress of our past and future, make a wide world for us.

—Atharvaveda, XII. 1. 1.



সিমলা পাহাড় থেকে বরফের দৃশ্য



সিমলার রিজ



সিমলার রিজ—ব্যাণ্ড স্ট্যাণ্ড



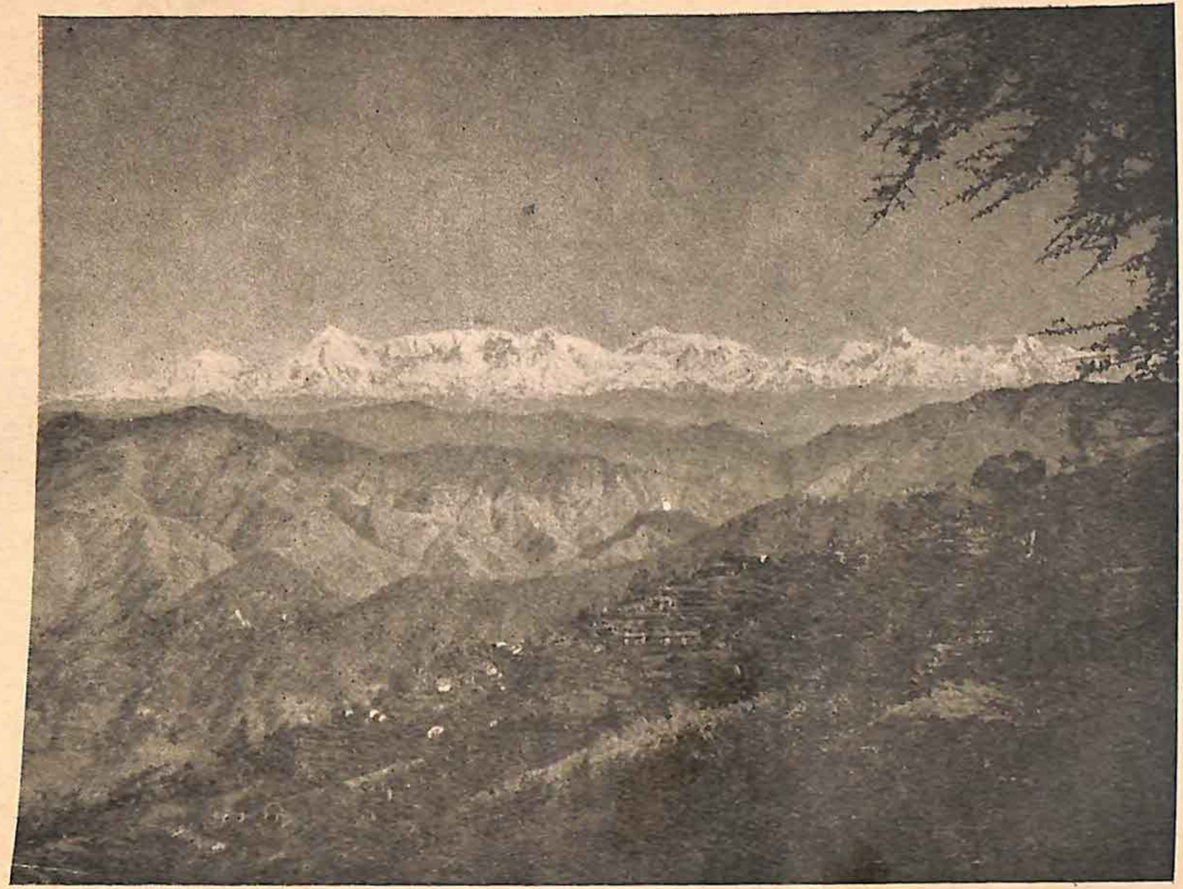
সিমলার রিজ—পিছনে গির্জা ও জাখু পাহাড়



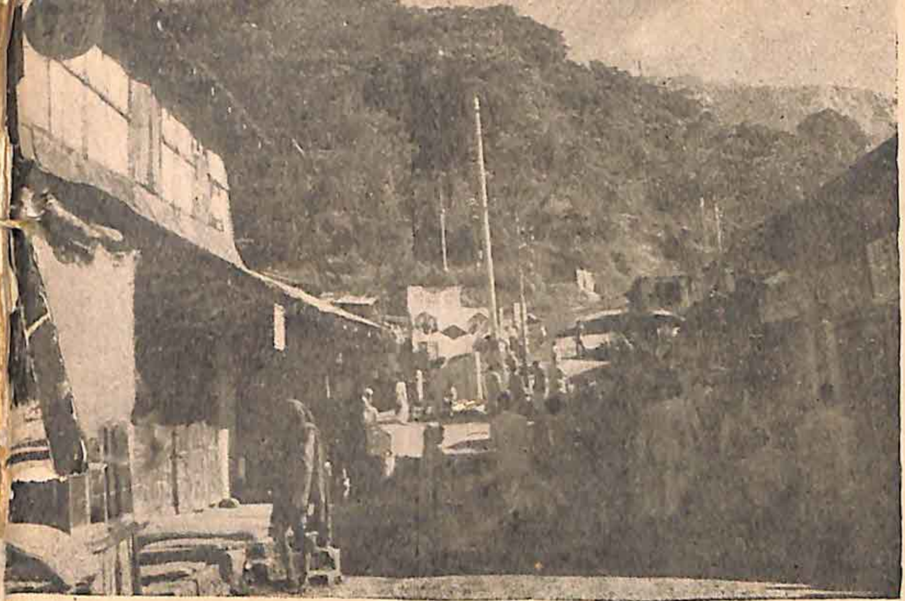
জাখু পাহাড় থেকে সিমলা শহর



পার্বতী মহিলা

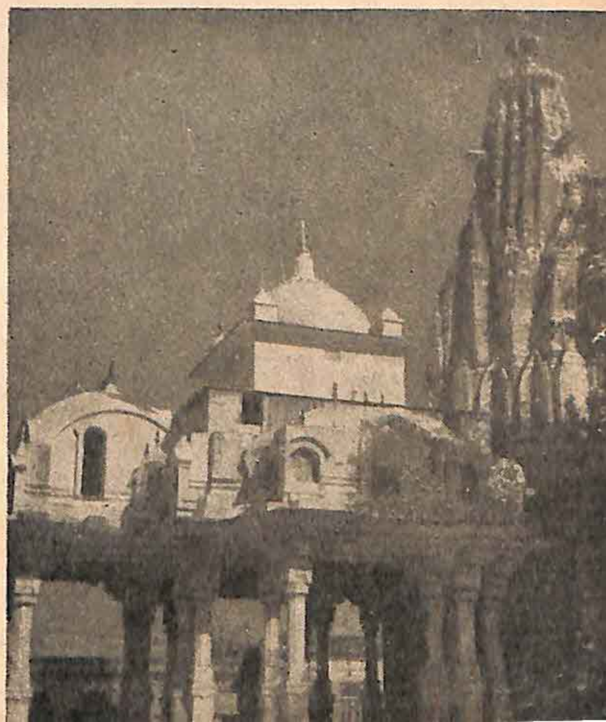


হিমাচল



ধর্মশালা

কাংড়ায় বজ্রেশ্বরী মন্দির





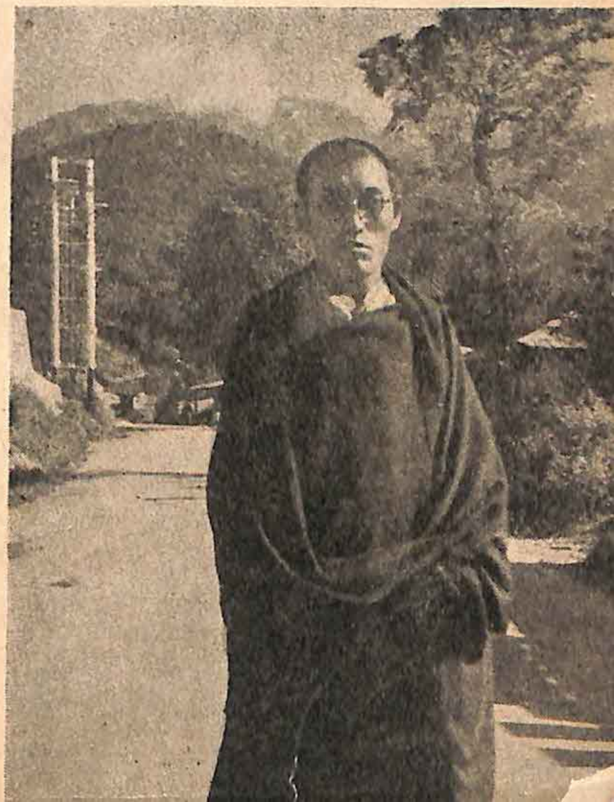
কাংড়া উপত্যকায়
জ্বালামুখীর মন্দির



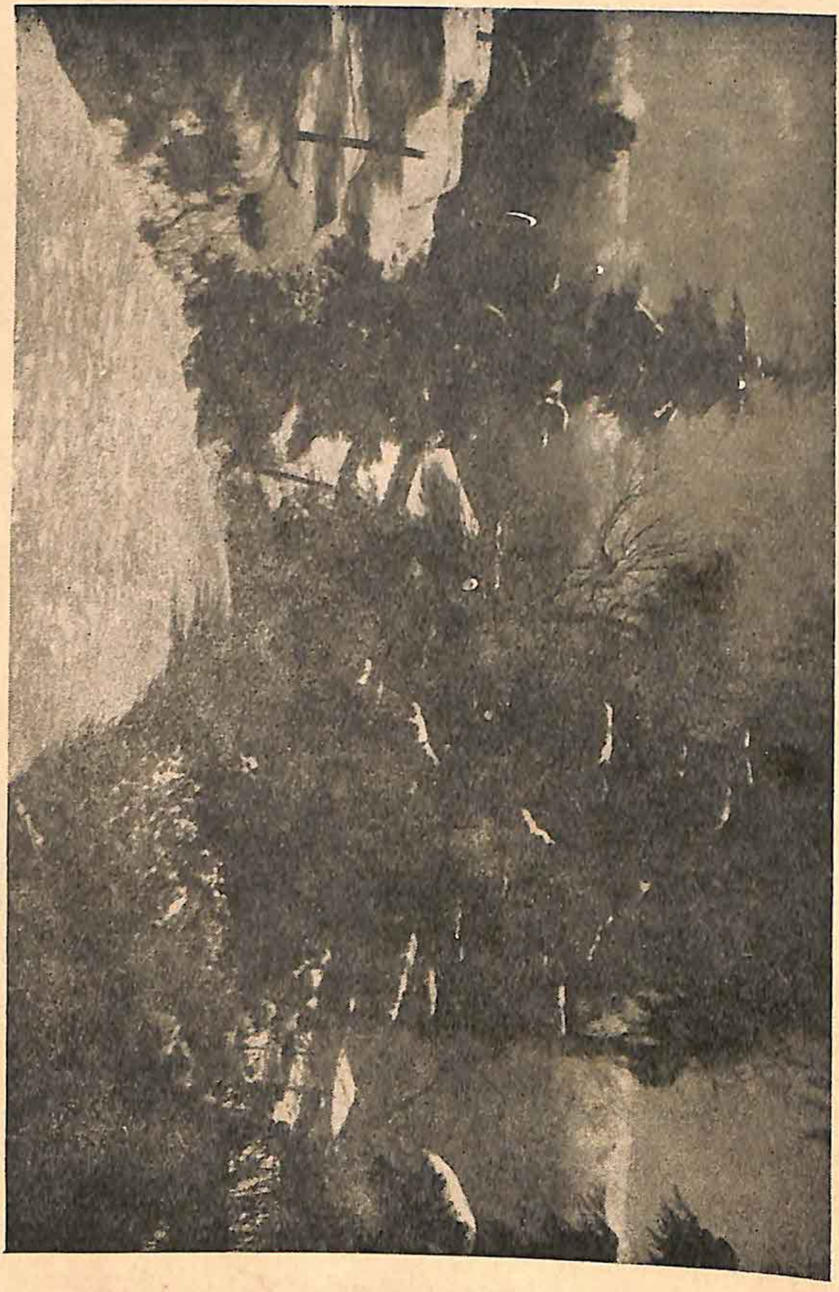
কাংড়ায় বজ্রেশ্বরী মন্দির—পিছনে ধবলাধার শ্রেণী



পার্বতী জীবন



ধর্মশালার পথে
তিব্বতী লামা



১

অলৌকিক ঘটনায় আমাদের আর বিশ্বাস নেই। বৈজ্ঞানিক যুক্তি না দেখালে সত্য ঘটনাও আমরা অনেক সময় অবিশ্বাস করি। বর্তমান সভ্যতায় আমাদের বিশ্বাসের গণ্ডি উত্তরোত্তর ছোট হচ্ছে। ভূতে বিশ্বাস হারিয়ে আমাদের সাহস বাড়ে নি, কিন্তু ভগবানে আস্থা হারিয়ে আমাদের চরিত্রবল নষ্ট হয়েছে। ধর্ম মেনে আমরা ধর্মকে বড় করি না, ছোট হবার প্রলোভন থেকে নিজেকে রক্ষা করি।

হরিদ্বার থেকে মসুরি যাবার গল্প আমি দিল্লীতে বলতুম না। বলেছিল চাওলা। সামান্য ছুটো ঘটনা এমন সাজিয়ে বলেছিল যে তাকে অলৌকিক বলেই সকলের মনে হল।

কলকাতা থেকে আমরা পূজার আগে বেরিয়েছিলুম। আমি আর মনোরঞ্জন। জ্যোতিষের গণনায় মনোরঞ্জন যথেষ্ট উন্নতি করেছে। তার উদ্দেশ্য ছিল ভৃগুর অন্বেষণ। আমি তার সঙ্গী। শুধু ভ্রমণ ছাড়া আর কোন উদ্দেশ্য আমার ছিল না। প্রথমে আমরা বেনারসে এসেছিলুম, তারপরে হরিদ্বারে। কিন্তু সেই জ্যোতিষীর সাক্ষাৎ আমরা পাই নি। যাঁর সাক্ষাৎ পেলুম, তিনি একজন নিতান্ত সাধারণ ভদ্রলোক। হরিদ্বার থেকে বাসে আমাদের সঙ্গে হৃষীকেশ যাচ্ছিলেন। বৃদ্ধ ভদ্রলোক। হাবে ভাবে আমি তাঁকে স্থানীয় লোক বলেই মনে করেছিলুম। কিন্তু তাঁর মুখে বাঙলা কথা শুনে মনোরঞ্জন জিজ্ঞাসা করেছিল : আপনি কি হরিদ্বারেই থাকেন ?

ভদ্রলোক হেসে বলেছিলেন : বুড়ো বয়সে আর কোথায় থাকব ! কেন, কাশীতে !

ভদ্রলোক বললেন : অনেক দিন আগে এক ভদ্রলোকের সঙ্গে

এই পাহাড়ে সাক্ষাৎ হয়েছিল। বাঙলা দেশে পদ্মার পারে তাঁর বাড়ি। কী একটা কথায় তিনি বলেছিলেন, শেষ বয়সটা তিনি ঐ পদ্মার পারেই কাটাবেন।

কেন ?

সে ঐ পদ্মার সঙ্গে প্রেম। নিজের চোখে পদ্মা আমি দেখি নি, পদ্মার রূপের বর্ণনা আমি দিতে পারব না।

আমি জিজ্ঞাসা করেছিলুম : আপনার প্রেম কি এই হিমালয়ের সঙ্গে ?

উত্তরে ভদ্রলোক শুধু হেসেছিলেন।

এঁকে আমি খানিকক্ষণ একা পেয়েছিলুম। মাইল সাতেক অতিক্রম করে আমাদের বাস এসে সত্যনারায়ণের মন্দিরের সামনে দাঁড়িয়েছিল। যাত্রীরা সবাই নেমে পড়লেন, নামলেন না সেই ভদ্রলোক। আমি এক নজরে মন্দিরটা দেখে সকলের আগেই ফিরে এলুম। দেখলুম, ভদ্রলোক তখনও চুপচাপ বসে আছেন। কী মনে করে আমি তাঁর পাশে এসে বসলুম।

ভদ্রলোক আমাকে তাঁর পাশে বসতে দেখে একটুখানি হাসলেন। কিন্তু কোন কথা কইলেন না।

আমিই তাঁকে প্রশ্ন করলুম : হৃষীকেশে আপনি বুঝি কাজে যাচ্ছেন ?

তিনি উত্তর দিলেন : গীতাভবনে কয়েকজন গুণীলোক এসেছেন, তাঁদের পায়ের কাছে খানিকক্ষণ বসবার ইচ্ছা।

এর পরে আমি কী জিজ্ঞাসা করব ভেবে পেলুম না।

ভদ্রলোক নিজেই বললেন : আপনাকে বড় অশান্ত দেখছি।

আমাকে ?

ভদ্রলোক হেসে বললেন : এই প্রশ্ন করেই আপনি আমার সন্দেহটা সমর্থন করলেন।

এই মুহূর্তে আমার কাশীর কথা মনে পড়ল। সেদিন রাতে

দশাশ্বমেধ ঘাটেও আমাকে একজন এই রকমের কথা বলেছিলেন। আমি সেই কথা বলতেই ভদ্রলোক বললেন: সাধারণ বেশে সেখানে অনেক মহাপুরুষ ঘুরে বেড়ান শুনেছি। আপনি হয়তো তাঁদেরই কারও সাক্ষাৎ পেয়ে থাকবেন।

হেসে বললেন: আমাকে যেন সে রকম কিছু ভাববেন না।

আমি কোন উত্তর দিলুম না।

ভদ্রলোক বললেন: পাহাড়ে বোধহয় আপনি এই প্রথম আসছেন?

আজ্ঞে।

পাহাড়ের নিচে থেকেই ফিরে যাবেন, উপরে উঠবেন না।

কেন?

পাহাড় একবার ভাল করে দেখলে মনে আর শান্তি থাকবে না। বারে বারে আপনাকে টানবে। তা ছাড়া—

ভদ্রলোক থেমে গেলেন।

আমি বললুম: বলুন।

ঘরে বোধহয় আপনার মন টেকে না।

আমি চমকে উঠলুম না, কোন কৌতূহলও প্রকাশ করলুম না। শান্ত ভাবে প্রশ্ন করলুম: কোন দিনই কি টিকবে না?

ভদ্রলোক হেসে বললেন: আমি আমার অনুমানের কথা বলছি।

তাই বলুন।

এ শুধু এই বয়সের ধর্ম। কিছু দিন পরেই আপনার মন স্থির হবে। আপনার প্রতিষ্ঠার পথে বাধা সরে যাচ্ছে, আপনি সুখী হবেন।

আমি জিজ্ঞাসা করতে পারলুম না, তার কত দেরী আছে।

যাত্রীরা তখন একে একে ফিরে আসছেন। ভদ্রলোক বললেন: এ আমার অনুমানের কথা। অভিজ্ঞতার কথা। আমি তো সাধু মহাপুরুষ নই, গণৎকারও নই। শুধু মানুষ দেখে কথা বলি।

এ গল্প আমি চাওলাকে বলি নি। আমি এর পরের ঘটনা তাকে

বলেছিলুম। লছমনঝুলায় গঙ্গা পার হয়ে হেঁটে আমরা গীতাভবনে এসেছিলুম। সবাই যখন ঘুরে ঘুরে সব কিছু দেখছিলেন, আমি খুঁজছিলুম বাসের সেই বৃদ্ধ ভদ্রলোককে। এক জায়গায় ঘাসের উপর কয়েকজনকে দেখতে পেলুম। রৌদ্রে বসে তাঁরা কিছু আলোচনা করছিলেন। আমি এগিয়ে যেতেই পরিচিত ভদ্রলোকটিকে চিনতে পারলুম।

তিনিও আমাকে চিনলেন। বললেন: কেমন দেখলেন সব?

সংক্ষেপে বললুম: ভাল।

এইখান থেকে কি মসুরি যাবেন?

কেন বলুন তো?

আত্মীয় বন্ধু কেউ এখন আছেন না সেখানে?

আমার মনে হল, তিনি আমাকে মসুরি যেতে বলছেন। বলছেন, সেখানে কোন আত্মীয় কিংবা বন্ধুর সাক্ষাৎ পাব। জিজ্ঞাসা করলুম: আপনি কি আমাকে মসুরি যেতে বলছেন?

ততক্ষণে মনোরঞ্জনও সেখানে এসে পড়েছিল। আমার প্রশ্ন শুনে বিস্ময়ে বুঝি হতবুদ্ধি হয়ে গেল।

ভদ্রলোক বললেন: না না, যেতে আমি বলব কেন! আমি এমনিই এ কথা বললুম।

নৌকোয় করে গঙ্গা পার হবার সময় মনোরঞ্জন জিজ্ঞাসা করেছিল: তুমি কি সত্যিই মসুরি যাবে ভাবছ?

আমি উত্তর দিয়েছিলুম: জানি নে।

কিন্তু কেন জানি না, আমার মনে হয়েছিল যে সেখানে গেলে হয়তো স্বাতির সাক্ষাৎ পাব। তারা ছাড়া আর আমার আত্মীয় বন্ধু কে আছে!

ভদ্রলোককে আমার বড় রহস্যময় মনে হয়েছে। তিনি নিজেই বলেছিলেন, সাধারণ বেশে কাশীতে অনেক মহাপুরুষ ঘুরে বেড়ান। কিন্তু কে মহাপুরুষ আর কে নন, তা কি বেশ দেখে চেনা যায়!

মনোরঞ্জন একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলেছিল : কপালে অনেক দুঃখ আছে।

আমি বলেছিলুম : দুঃখ তো সুখেরই ভূমিকা।

মসুরি এসে আমি স্বাতির দেখা পাই নি, দেখা পেয়েছিলুম চাওলা ও মিত্রার। তারা রেজেস্ট্রি করে বিবাহের পর হানিমুনে এসেছিল। এই ঘটনা শুনে দুজনেই স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল। তারপর চাওলা বলেছিল : সত্যিই অবিশ্বাস্য।

মিত্রা বলল : তাহলে আরও একটু বলি। কাল দুপুরে আমাদের ফিরবার কথা ছিল। সময় মতো বাস স্ট্যাণ্ডে গিয়েও জায়গা পাই নি।

কাল দুপুর বেলায় বোধহয় ঠিক এই সময়েই সেই বৃদ্ধ ভদ্রলোক আমাকে মসুরি যাবার কথা বলেছিলেন। তা না বললে আমি মনোরঞ্জনের সঙ্গেই কলকাতায় ফিরতুম। আমার বুকের ভিতর এক রকমের অদ্ভুত বেদনা গুমরে উঠেছিল। আমি অনেকক্ষণ কোন কথা বলতে পারি নি।

তারপরে আমার হরিদ্বারে ফেরা হয়নি। চাওলারা জোর করেই দিল্লীতে টেনে আনল। আর মামার ড্রয়িং রূমে বসে শোনাল এই গল্প।

মামী স্তম্ভিত হয়ে সব শুনলেন। স্বাতি হাসল অবজ্ঞার হাসি।

মামা বললেন : এতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই।

স্বাতি বলল : কেন?

মামা বললেন : শৈশবে রামায়ণ পড়বার সময় তো সবই সত্য ভেবেছিলুম, একটু বয়স হতেই মনে হল যে কবি বাল্মীকি অনেক বাজে কথা লিখেছেন। এখন কী ভাবি জান? ভাবি, বিজ্ঞানের আরও উন্নতি হলে রামায়ণের সমস্ত কথাই সত্য বলে প্রমাণ হবে।

স্বাতি মামার মুখের দিকে তাকাল।

মামা বললেন : প্রথমেই ধর দশরথের শব্দভেদী বাণের কথা।

আজ কি এ কোন অসম্ভব কথা, না পুষ্পক রথের গল্পই আর অসম্ভব মনে হয়! ছেলে বেলায় আমরা এ সব দেখি নি বলেই অবিশ্বাস করেছিলুম, আর আমাদের এই অবিশ্বাসের কথা শুনেই তোমরা এখন আশ্চর্য হবে।

এ কোন নূতন কথা নয়, এ আমি আগেও শুনেছি বলে মনে পড়ল। কিন্তু স্বাতি প্রতিবাদ করে বলল : মানুষের দৈববল কোন দিন ছিল কি না জানি নে, কিন্তু এখন যে নেই সে বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ।

কেন?

এ যুগের সাধু-সন্ন্যাসীর দৈববল থাকলে তারা ভিক্ষে করে খেত না, লোকে তাদের পায়ে গিয়ে মাথা কুটত।

চাওলা বলল : খাঁটি কথা। গোপালবাবু যে মানুষটিকে দেখেছিলেন, তিনি সাধু-সন্ন্যাসী নন, ভিক্ষে করেও তিনি খান না। আর লোকে যাতে তাঁর পায়ে মাথা না কোটে, তার জন্যে তিনি গেরুয়া কাপড় গায়ে তোলেন নি।

মামা বললেন : আমাদের কথা একবার ভেবে দেখুন। পূজোর ছুটিতে বেরব বলে তল্পি বেঁধে বসে আছি। গোপালের খবর নেই। দেশে চিঠি লিখে আর 'তার' পাঠিয়ে কোন ফল হল না, দুদিনের জন্যে বেড়াতে গিয়ে আপনারা তাকে ধরে আনলেন।

বলে মিত্রার দিকে তাকালেন।

মিত্রা উত্তর না দিয়ে শুধু হাসল।

চাওলা বলল : ঘরে ফিরে আপনার চিঠিপত্র দেখে গোপালবাবু নিশ্চয়ই পস্তাত।

স্বাতি হেসে উঠে বলল : গোপালদা ঐ কাজটাই ভাল পারে।

কথাটা মিথ্যা নয়। ব্যর্থ জীবনের জন্য যেমন শুধুই হাহাকার, তেমনই সাময়িক অসাফল্যের জন্য কিছুক্ষণ পস্তানো। ছোটখাট

পাওয়ায় মন ভরে, কিন্তু জীবন ভরে দেওয়ায়। আজও আমি কাউকে কিছু দিতে পারি নি।

কিছু বলুন।

চাওলা আমাকে জাগিয়ে দিল।

বললুম : রাজধানীতে বলবার লোক অনেক আছে, অভাব শুধু শ্রোতার। এখানে আমাকে শ্রোতা হবার সুযোগ দিন।

চাওলা হা-হা করে হেসে উঠল, বলল : ঠিক বলেছেন। বক্তৃতায় আমাদের কাছে পৃথিবীর সব দেশ হেরে যাবে।

পরে স্বাতি আমাকে বিস্ময়ে অভিভূত করেছিল। চাওলারা চলে যাবার পরে আমাকে একান্তে ডেকে বলেছিল : তুমি যে আজ আসবে আমি জানতাম।

কী করে ?

রাতে স্বপ্ন দেখেছিলাম। স্থির জলে একখানা নৌকোয় আমরা ভেসে বেড়াচ্ছি। পাহাড়ে ঘেরা নীল জল, আর পর্দা ঝোলানো সুন্দর নৌকো।

এ তো কাশ্মীরের ছবি।

তা হবে।

তাতে আমি আজ আসছি, তা কী করে জানলে ?

আমার স্বপ্ন কখনও মিথ্যা হয় না।

স্বাতির আর একটি স্বপ্নের কথা আমার মনে পড়ল। দ্বারকা যাবার পথে চলন্ত গাড়ির ভিতর ফিসফিস করে বলেছিল : গোপালদা, এক অকূল সমুদ্রের ধারে আমি সেই মন্দির দেখলাম। আধখানা মন্দির। উপরের দিকটা যেন নেই, যেন কোন কালে ছিল না। তবু কী অপূর্ব! দুরন্ত সমুদ্র এসে পায়ের উপর আছড়ে পড়ছে, ধুয়ে দিতে চাইছে মন্দিরের চারি দিকটা। ভিজে বারুদের মতো সমস্ত

গর্জন তার শেষ হয়ে যাচ্ছে, থাকছে শুধু দীর্ঘশ্বাসের মতো শব্দ আর সাদা ফেনা। এ কোন্ মন্দির গোপালদা?

আমি জবাব দিয়েছিলুম : সোমনাথ।

কিন্তু আধখানা মন্দির কেন দেখলাম?

কেন জানি না, সোমনাথের নামে আমারও চোখের সামনে আধখানা মন্দির জেগে ওঠে। আজ না হয় সোমনাথের নূতন মন্দির এখনও অসম্পূর্ণ, কিন্তু স্বাতি কেন স্বপ্নে তা দেখবে! কেন সম্পূর্ণ দেখবে না সোমনাথকে! তারপরেই নিজের ভুল বুঝতে পেরেছিলুম। বলেছিলুম : কটা লোক সোমনাথের সম্পূর্ণ মন্দির দেখেছে স্বাতি! প্রভাস পত্তনের মাটিতে বুঝি অভিশাপ আছে, মন্দির এখানে ভেঙে পড়ে।

সেবারে আমরা সোমনাথ দেখেছিলুম। সোমনাথের নূতন মন্দির তখনও অসম্পূর্ণ। বললুম : এবারে কাশ্মীর দেখব।

স্বাতি বলল : বাবা আশঙ্কা করেছিলেন, তুমি আসবে না।

কেন?

আমরা তোমাকে অপমান করেছি।

অপমান!

করি নি কি?

আমি কী উত্তর দেব সহসা ভেবে পেলুম না। বললুম : এ প্রসঙ্গ আজ থাক।

স্বাতি মেনে নিয়ে বলল : থাক।

২

আমি আমার নিজের জীবনের কথাই ভাবছিলুম। কোথা থেকে কোথায় এসে কী ভাবে আজ জড়িয়ে পড়েছি। এমন ভাবে নিজেকে জড়িয়েছি যে, আর বোধহয় মুক্তির পথ নেই। বন্ধনও নেই। তবু কেন এমন হল, সেই কথা ভেবেই আশ্চর্য হচ্ছিলুম।

বেশি দিনের পুরনো কথা নয়। আজও দু বছর পূর্ণ হয় নি। যে দিন পূজার ছুটি হয়, সে দিন আর বাড়ি ফেরা হল না। হাওড়া স্টেশনে নিজের গাড়ি ফেল করে সাত নম্বর প্ল্যাটফর্মে এসেছিলুম মাদ্রাজ মেল দেখতে। এই পরিবারের হাতে বন্দী হয়ে গেলুম।

সপরিবারে মামা বেরিয়েছিলেন দক্ষিণ ভারত ভ্রমণে। জমিদার অঘোর গোস্বামী ইংরেজ আমলের রায় সাহেব। তারা আর দু বছর এ দেশে থেকে গেলে নিঃসন্দেহে রায় বাহাদুর হতেন। স্বাধীন ভারতে তিনি খেতাব পরিত্যাগ করে পার্লামেণ্টের মেম্বার হয়েছেন। দেশের আইনে তাঁর জমিদারী গেছে, কিন্তু ব্যবসা ফেঁপে উঠেছে। কয়েক বছর আগে বিশ্ববিদ্যালয় ছেড়ে যখন তাঁর সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলুম, মামা তখন আমাকে চিনতে পারেন নি। না পারবারই কথা। মাকেই বোধহয় ভাল করে চিনতেন না। নিজের বোনকেই আজকাল লোকে ভুলে যাচ্ছে, তায় পাতানো বোন। সেও মায়েদের পাতানো। আমাকে চিনতে না পারার জন্যে আমি সে দিন কিছু মনে করি নি। গরিবকে চেনা যে বিপদের কথা তা তো জানি। তাই সংক্ষেপে নিজের পরিচয় দিয়েই বেরিয়ে এসেছিলুম।

হাওড়া স্টেশনে তাঁদের চাকর হারিয়ে গিয়েছিল। এ কথা জেনে আমি বলেছিলুন : খুঁজে দেখি।

খুঁজে দেখবেন মানে! চিনবেন কী করে?

বলে একটা কামরার দরজায় দাঁড়িয়ে স্বাতি খিল খিল করে

হেসে উঠেছিল। এই জনসমুদ্রের ভিতর একটা অপরিচিত লোককে কি খুঁজে পাওয়া যায়!

সেদিন মামাকে বড় অসহায় দেখেছিলুম। জানালার ভিতর মামীর চোখ ছলছল করেছে বেদনায়, আর স্বাতির বড় বড় চোখে আমার সঙ্গী হবার সম্মতির প্রতীক্ষা। আমি তাঁদের চিনি না বলতে পারি নি, আমার মন সেই আহ্বানে সাড়া দিয়েছিল। চলতি ট্রেনে আমি উঠে পড়েছিলুম।

তারপর কত দেশ দেখলুম তাঁদের সঙ্গে। সমগ্র দক্ষিণ ভারত আর দ্রাবিড় দেশ। দক্ষিণে রামেশ্বর আর কন্যাকুমারী থেকে মহিসুর আর হায়দ্রাবাদ। অজন্তা ইলোরার কথা আজও স্পষ্ট মনে আছে।

গত বছর পূজার সময়েও মামা আমাকে 'তার' পাঠিয়ে ডেকেছিলেন। দিল্লী থেকে বেরিয়ে জয়পুরে তাঁরা আমার জন্য অপেক্ষা করছিলেন। তাঁদের সঙ্গে রাজস্থান আর সৌরাষ্ট্র দেখলুম, ফিরলুম মহারাষ্ট্র দেখে।

এবারের পূজার এখনও দিন কয়েক দেরি আছে। এবারে তাঁদের চিঠি আমি পাই নি, 'তার'ও না। কিন্তু আমার বিধাতা আমাকে টেনে এনেছেন। আমার বাউণ্ডুলে বিধাতা। আমি শান্তি চাইলেও আমার কপালে তা নেই। কবে আমি স্থির হয়ে বসতে পারব, তা সেই বিধাতাই জানেন।

দিল্লীতে আমি এর আগে একবার এসেছি। সেও স্বেচ্ছায় আসি নি। জ্ঞানশঙ্করবাবু আমাকে এলাহাবাদে ডেকেছিলেন। শুনেছিলুম মামার কাছেই আমার সংবাদ পেয়েছিলেন। তাঁর অগাধ সম্পত্তি, কিন্তু কোন সন্তান নেই। প্রথম পক্ষের ছেলেমেয়েরা বাঁচে নি, দ্বিতীয় পক্ষের কোন সন্তানই হয় নি। ভাইএর ছেলে পোষ্য নিলেন, সে বাঁচল না। উপযুক্ত সংসারী ছেলে আনলেন বোনের কাছে চেয়ে, সেও একদিন হঠাৎ মারা গেল। জ্ঞানশঙ্করবাবু আমাকে পোষ্য নিতে চেয়েছিলেন। কিন্তু আমি রাজী হই নি, রাজী হতে পারি নি।

সেই উপলক্ষ্যেই দিল্লী এসেছিলুম। সে এক বসন্তের ঘটনা। তারপরেই আরও একটা বসন্ত কেটে গেছে।

মিত্রাদের সঙ্গে আমার দিল্লীতেই পরিচয় হয়েছিল। কমার্স মিনিস্ট্রির নূতন অফিসার রানা ব্যানার্জির বোন মিত্রা। তাদের বাপ হলেন বৃটিশ আমলের দুঁদে সিভিলিয়ান নীতীশ ব্যানার্জি। স্বাতির চেয়েও সে বেশী রোগা, বেশী ফর্সা। পায়ে চঞ্চলতা নেই, মুখে নেই বাচালতা। চশমার কাচের ভিতর দিয়ে তার যে দৃষ্টি দেখেছি, তাতে স্নিগ্ধতাও নেই। কাচের উপর আলো পড়ার মতো তার দৃষ্টি সারাক্ষণ তীব্র দেখায়। মনটাও তীব্র। তাই দিল্লীতে আমার সামনেই আমার সম্বন্ধে যে কথা বলেছিল, আজও তা স্পষ্ট মনে আছে। বাউলির ধারে দিল্লী দেখার প্রোগ্রাম করতে বসে স্বাতি বলেছিল : দিল্লী আমরা দেখেছি। গোপালদা কিন্তু না দেখেও আমাদের চেয়ে বেশি জানে।

উত্তরে মিত্রা একটা বক্রোক্তি করেছিল, বলেছিল : কলকাতার একজন হিরো বলে শুনেছি।

মিত্রাদের সঙ্গে তখন আমার একটি সন্ধ্যার পরিচয়। আমি যে দিন দিল্লী এসেছিলুম, তার পরের সন্ধ্যায় তারা দুই ভাই বোনে বেড়াতে এসেছিল। মামার পুরনো পরিচিত তারা। ব্যানার্জি সাহেব তাঁর কলেজের বন্ধু।

মিত্রারা কেন এসেছিল, সে কথা শুনেছিলুম পাঞ্জাবী যুবক চাওলার কাছে। বলেছিল : দু দিন পরে তুমি কোটিপতি হবে, পাবে অর্ধেক রাজত্ব। এ দিকে রাজকন্যার মত হলেই হল। রাজা নিজেই তাঁর রাজকন্যা পাঠিয়েছিলেন তোমার কাছে।

নিজের কথাও চাওলা বলেছিল : মিত্রার মনের কথা জানতে পারি, এমন সাধ্য আমার নেই। তবে বিয়ে করতে রাজি হলে বুঝতুম, খাঁটি জিনিস পেয়েছি। মিত্রা কখনও মিথ্যা বলবে না।

সত্যিই মিত্রা মিথ্যা বলে নি। ওখলায় আমাকে টেনে এনে

বলেছিল : চাওলাকে আমি ভালবাসি, কিন্তু বিয়ে করব না। সে কথা ওকে আমি জানিয়ে দিয়েছি।

আমি বলেছিলুম : ভালই যখন বাসেন, তখন বিয়ে করতে আপত্তি কী ?

মিত্রা উত্তর দিয়েছিল : তার সঙ্গে আমার মতের মিল নেই। সে ভাবে ঘুঁটে কুড়োনির দুঃখই দুঃখ, রাজকন্যার দুঃখ দুঃখ নয়। তার মন সমাজ-সচেতন, কিন্তু একটা মতবাদকে ঝেড়ে ফেলতে গিয়ে আর একটা মতবাদের ভারে বেঁকে গেছে। লোকটা এখন আর সুস্থ নয়।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত মিত্রা চাওলাকেই বিয়ে করেছে। কী করে এই বিবাহ সম্ভব হল, সে কথাও আমি জেনেছি। মসুরি থেকে ফেরবার পথে সব কথাই তারা আমাকে বলেছে।

স্বাতির পরামর্শে মিত্রা আজকাল চাকরি করছে। তার ধারণা, এ যুগে একজনের রোজগারে সংসারের অভাব কোন দিন ঘোচে না। অন্তত প্রথম জীবনে। স্বামী স্ত্রী দুজনকেই এখন সমান সংগ্রাম করতে হয়। তার উপর ব্যক্তিগত স্বাধীনতা আছে। তার এম. এ. পরীক্ষার ফল বেরলে সে নিজেও চাকরি নেবে। ন্যাশনাল লাইব্রেরিতে সে একটা ব্যবস্থাও করে রেখেছে।

মিত্রা বলেছিল : চাওলাকে কেন বিয়ে করছি না, স্বাতি সেই কথা জানতে চেয়েছিল। আপনাকে যা বলেছিলুম, তাকেও তাই বললুম। আপনি আমার প্রতিবাদ করেন নি, কিন্তু স্বাতি কি বলল জানেন ? বলল, রাজার ঘরে যতক্ষণ, ততক্ষণই রাজকন্যে। সেকালের রাজকন্যারা যখন মুনি ঋষিকে বিয়ে করতেন, তখন কি আর কেউ তাঁদের রাজকন্যে বলত ! বলল, মিস্টার চাওলাই ঠিক বলেন। রাজার ঘরের রাজকন্যার জন্যে আমাদের কোন দুঃখ নেই ; যখন তিনি ঘুঁটে কুড়োনির মতো ঘুঁটে কুড়োন, তখন তিনি আর রাজকন্যে নন, তখন তিনি আমাদেরই মতো সাধারণ মানুষ। তাঁরও দুঃখ বেদনার জন্যে আমরা দায়ী হব।

চাওলা বোধহয় এ সব কথা আগে শোনে নি। তাই সে আনন্দে চেঁচিয়ে উঠেছিল।

মিত্রা বলেছিল : স্বাতি আমাকে আরও একটা কথা বলেছে। সে কথাটিও আমি সযত্নে মনে রেখেছি। সে বলেছিল, মনের মিলনের জন্যে তো কোন উপঢৌকনের প্রয়োজন নেই, অর্থ প্রতিপত্তি কেন তার প্রতিবন্ধক হবে!

এ কথা শুনে চাওলা আর চেঁচাতে পারে নি, নির্বাক বিস্ময়ে আমার মুখের দিকে তাকিয়েছিল।

রানার কথাও আমার মনে পড়ল। বোনের সঙ্গে বেড়াতে এসে বিপদে পড়েছিল। এমন একটি মেয়েকে তার ভাল লাগল যার মনের গড়ন বড় দৃঢ়। স্বাতির কাছ থেকে তো সাড়াই পায় নি, উৎসাহও পায় নি তার বাবার কাছে। যেটুকু প্রশ্রয় সে পেয়েছিল, তা শুধু মেয়ের মায়ের কাছেই। মামী তাকে সুপাত্র মনে করেছিলেন। যে কোন মেয়েরই মা তাই করবেন। কিন্তু মামা? মামাকে আজও আমি চিনতে পেরেছি কি! স্বাতি বলে, পেরেছি। কেন বলে তা আমি জানি। তাঁকে না চিনলে আমি তাঁর ডাকে ছুটে আসতুম না। আমি কি মামার জন্যেই আসি! হাসি পায় তার কথা শুনে।

এই রানার সঙ্গেই স্বাতির বিবাহ স্থির হয়েছিল। কিন্তু আমি জানতুম যে এ বিয়ে হবে না। কেননা বিয়েটা রানা করবে না, মিস্টার ব্যানার্জি তার বিয়ে দেবেন। তিনি জানেন যে স্বাতির বাবার সিন্দুকে যা আছে তাতে গোপালের ভাগ্য ফিরতে পারে, কিন্তু রানার জন্যে লোভনীয় নয়। রাজস্থান ভ্রমণের সময় এই কথা আমি স্বাতিকে বলেছিলুম। স্বাতি জিজ্ঞাসা করেছিল : রানাবাবু এ কথা বোঝেন না?

বললুম তো, রানা বোকা।

তারপরে চাওলার কথা উঠেছিল। স্বাতি বলেছিল : তিনি বলছেন, মিত্রাদি তাঁকে বিয়ে করতে শিগগিরই রাজী হবেন।

তার পরেই হেসে বলেছিল: মিস্টার চাওলা বলেছিলেন যে রানাবাবুও নাকি তাঁরই মতো ভাবছে।

তাতে হাসবার কী হল?

স্বাতি বলেছিল: হাসবার কথা নয়! রানাবাবুর সঙ্গে আমার বিয়ে তো ঠিকই হয়ে আছে। এতে আবার ভাবাভাবি কী!

আমি গম্ভীর হয়ে বলেছিলুম: সত্যিই তো!

এ বিবাহ শেষ পর্যন্ত হয় নি। রানা তার অফিসের একজন স্টেনোগ্রাফারকে বিয়ে করেছে।

আমি আশ্চর্য হয়ে মিত্রাকে জিজ্ঞাসা করেছিলুম: আপনার বাবা রাজী হলেন?

উত্তর চাওলা দিয়েছিল। বলেছিল: পাগল! মিস্টার ব্যানার্জি তাকে গলা ধরে বার করে দিয়েছেন।

আমি ভেবে পাই নি, এত সাহস রানার কোথা থেকে হল।

কানের কাছে মুখ এনে চাওলা বলেছিল: প্রেম।

এই দুটি অক্ষরের ভিতর কত শক্তি নিহিত আছে, তার পরিমাপ আজও হয় নি। গল্পে উপন্যাসে কাব্যে মহাকাব্যে অনেক কাহিনী পড়েছি, দেখেছিও অনেক মানুষকে। রানাকেও দেখলুম। যে ছেলে বাপের আদেশ অমান্য করে আবু পাহাড়ে এল না স্বাতিকে পাবার লোভে, সেই ছেলেই একদিন এমন দুঃসাহসের কাজ করল।

মসুরি থেকে ফেরার পথে এই কথা হচ্ছিল। গভীর ভাবে মিত্রা বলেছিল: বাবাকে আমরা খুবই দুঃখ দিলাম।

মামার কাছে মিস্টার ব্যানার্জির যে পরিচয় পেয়েছি, তাতে তাঁর মর্মান্তিক দুঃখ পাবার কথা। শুধু রানা নয়, মিত্রাও তাঁকে দুঃখ দিয়েছে। চাওলার হাতে মেয়ে দেবার ইচ্ছা তাঁর ছিল না। সে কথা আমি চাওলার মুখেই শুনেছিলুম। আমাকে বলেছিল: তুমি নিজের মুখে তোমার যে পরিচয় দিয়েছ, সে স্প্লেন্ডিড।

তাই নাকি!

চাওলা বলেছিল : তোমার সম্পত্তির মধ্যে নাকি একখানা ভাড়াটে ঘর, আর ডালহৌসি স্কোয়ারে সারি সারি টেবলের ভেতর একখানা কাঠের চেয়ার।

হেসে বলেছিল : ব্যবসাদারের মধ্যে আমারও এই অবস্থা। তোমার সঙ্গে মিলেছে ভাল।

গলা নামিয়ে বলেছিল : প্রেমের ব্যাপারেও আমি কাঁচা ছিলুম। গল্পটা সংক্ষেপে বলি। মিস ব্যানার্জির সঙ্গে পরিচয় অন্তরঙ্গ হবার পর হঠাৎ একদিন মনে হল, মেয়েটা আমায় ভালবাসে। মনে হতেই যা হল, নিজেকে হিরো বানিয়ে তুললুম। ঝোঁকের মাথায় একখানা গাড়িও কিনে ফেললুম। কিন্তু হলে হবে কী! ঝানু আই-সি-এস আমাদের সিনিয়ার ব্যানার্জি। ঝপ করে একদিন পঞ্চাশ হাজার টাকা চেয়ে বসলেন। বললেন, বড় জরুরি দরকার, যতটা দিতে পার ততটাই কাজে লাগবে। ধার কর্জ করে বাপের কাছে চেয়ে কি আর কিছু দিতে পারতুম না, কিন্তু পিছিয়ে এলুম। একটা মেয়ের লোভে নিজের ভবিষ্যৎটা নষ্ট করব! পরে জানতে পেরেছিলুম, বুড়ো আমার ব্যাঙ্ক ব্যালান্সের খোঁজ নিয়েছিলেন অমনি করে।

হাসতে হাসতে চাওলা যোগ করেছিল : বুড়োর ধারণা, পয়সাওয়ালা ছেলে প্রেমে পড়লে টাকা বার করবেই, আর ধার কর্জ করে দিলে প্রেমটা খাঁটি বুঝবে।

এ কথা শুনে সেদিন আমি হেসেছিলুম। কিন্তু মিত্রার কথা শুনে আমি হাসতে পারি নি। ভদ্রলোক যে মানুষকে ঘৃণা করতেন, তা জেনেছি মামার কাছে। প্রেসিডেন্সী কলেজে তাঁরা এক সঙ্গে পড়েছেন। বি. এ. পাশ করে মিস্টার ব্যানার্জি বিলেত গেলেন, ফিরলেন সিভিলিয়ান হয়ে। মামা তাঁর পৈতৃক জমিদারী দেখছেন শুনে বলেছিলেন, ফুল। সম্পত্তি দেখছে, না অধঃপাতে গেছে। আসকারা দিয়ে গভর্নমেণ্ট এক গুষ্টি অপদার্থ পুষছে। যাদের চালচুলো ছিল না,

আর যাদের প্রচুর ছিল, তাদের দুদলকেই তিনি ঘৃণা করেছেন। তবু আজ আমার এই ভদ্রলোকের জন্য দুঃখ হল।

চাওলা বলল : তোমার বাবা দুঃখ পেতেনই। নিজের জন্যেই দুঃখ পেয়েছেন।

নিজের জন্যে কেন ?

গদি হারাবার আগে ইজিপ্টের রাজা ফারুক কী বলেছিলেন মনে আছে ?

না।

বলেছিলেন যে পৃথিবীতে একদিন শুধু পাঁচটি রাজা থাকবে। চারটি তাসের রাজা, বাঙলায় তোমরা সাহেব বল ; আর ইংলণ্ডের রাজা, বর্তমানে রানী।

তার সঙ্গে—

সম্বন্ধ আছে দোস্ত, সম্বন্ধ আছে। ব্যানার্জি সাহেব তাঁর ছেলেমেয়ের জন্যে রাজকন্যা আর রাজপুত্র যোগাড় করতে পারতেন না। চেষ্টা চরিত্র করলে হয়তো মন্ত্রীর পুত্র কন্যা পাওয়া যেত। কিন্তু সে যে পাঁচবছরী মন্ত্রী। যাঁদের আসন কায়েমী, তাঁদের জীবনের মেয়াদ ফুরিয়েছে। ছেলে মেয়ের বদলে নাতি নাতনী ধরতে হত।

মিস্টার ব্যানার্জির অবসর নেবার সময় হয়েছে। অবসর নেবার পরে তাঁর কী পরিবর্তন হয়, তা জানবার আগ্রহ হচ্ছে।

আগামী মঙ্গলবার মামারা হিমাচল যাত্রা করছেন। পাঞ্জাবের উপর দিয়ে হিমাচল প্রদেশ। সিমলা হয়ে যাবেন কি না স্থির করেন নি। কোন্ কোন্ শহর দেখবেন, তা আমাকেই ঠিক করতে হবে। কুলু কাঙ্গড়া দেখবেন, এবং ভাল লাগলে কাশ্মীর। কাজেই মামা স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দিয়েছেন যে পুরোপুরি দায়িত্ব আমারই।

আমি না এলে কী করতেন ?

ধরে আনতুম। স্বাতির ছুটি আছে, সেই ধরে আনতে পারত। প্লেনে কলকাতা দিল্লী তো এক দিনের মামলা।

মামাকে আমি হেসে বলেছিলুম: আমি হরিদ্বারে ছিলুম।

পাইপটা মুখ থেকে নামিয়ে মামা বলেছিলেন: বুঝলে গোপাল, মনের টান হল চুম্বকের মতো। ওর কাছে কলকাতা আর হরিদ্বারে তফাত নেই। তুমি কি চিঠি আর 'তারে'র টানে এসেছ, এসেছ মনের টানে।

বলে পাইপটা আবার মুখে তুলেছিলেন।

কিন্তু মামী এ কথা শুনে খুশী হন নি। তিনি যে খুশী হবেন না, তা আমি জানি। অতীতেও তিনি খুশী হতেন না। কিন্তু আমার মনে পড়ল, এই মামীর জন্যই এ পরিবারের সঙ্গে আমার সম্বন্ধ স্থাপিত হয়েছে। সেবারে হাওড়া স্টেশনে চাকরের অভাবে মামা যখন যাত্রাভঙ্গ করবেন কি না ভাবছিলেন, মামী আমাকে বলেছিলেন: তুমি আমাদের সঙ্গে যেতে পার না গোপাল?

এই কথাতেই থই পেয়ে মামা আমার হাত দুটো জড়িয়ে ধরেছিলেন।

মামী যখন এই অনুরোধ করেছিলেন, তখন তাঁর মন ছিল তীর্থের দিকে। তখন তিনি অন্য কোন আশঙ্কার কথা ভাবেন নি। সেটা পরে মনে পড়েছিল। চলতি গাড়িতে উঠে তাঁদের জিনিসপত্র যথা-স্থানে গুছিয়ে রেখে বসতেই তিনি বলেছিলেন: তোমার বোন স্বাতিকে বুঝি তুমি আগে কখনও দেখ নি?

আমার মনে হয়েছিল, মামী এই সম্বন্ধের কথা তুলে আমাকে সতর্ক করে দিয়েছিলেন। তারপর মাদ্রাজে পৌঁছে বলেছিলেন স্বাতির বিয়ের কথা, অগ্রহায়ণে দিন স্থির হয়েছে। কিন্তু এ কথা একবারও বলেন নি যে তাঁদের সঙ্গে সম্বন্ধ আমার পাতানো। সে কথা একদিন রাতে মামার মুখে শুনেছিলুম। তাঁর বিগত জীবনের অনেক কথাই

তিনি বলে যাচ্ছিলেন। মামী অস্বস্তি বোধ করে বলেছিলেন ঃ তোমরা শোবে না আজ ?

মামীকে আমি খানিকটা আরাম দেবার চেষ্টা করেছিলুম। বলেছিলুম ঃ জানেন মামীমা, স্বাতি আজ আমার ওপর ভীষণ চটেছে ?

কেন বলতো।

আপনার মনে আছে তো, আমার মুখখানা বাঁদরের মতো বলে সকালে সে কী ঠাট্টা ! আজ বিকেলে আমার এক বন্ধু বললেন, আমার বোন বলে বেশ চেনা যায় ওকে, একই রকম মুখের আদল।

মামী হেসেছিলেন, কিন্তু স্বাতি হাসে নি আর মামা তখনও গম্ভীর হয়ে অনেক কিছু ভাবছিলেন।

তারপর জয়পুর থেকে মামা যে আমাকে ডেকে পাঠিয়েছিলেন, তাতেও মামীর সম্মতি ছিল না। আজমীরে এ কথা স্বাতি আমাকে বলেছিল।

আমি জিজ্ঞাসা করেছিলুম ঃ কেন বলতো ?

গম্ভীর হয়ে স্বাতি বলেছিল ঃ মা আমাকে খুব ভাল মেয়ে বলে জানেন। তোমার মতো খারাপ ছেলের সঙ্গে মেলামেশা তিনি মোটেই ভাল চোখে দেখেন না।

সত্যি কথাও বলেছিল ঃ তুমি আমার সত্যি দাদা হলে কি আজ আমরা এত ভাবনা করতুম !

স্বাতি হেসে উঠেছিল।

আমি জিজ্ঞাসা করেছিলুম ঃ এ সব কার কথা, মামীমার ?

স্বাতি বলেছিল ঃ তাইতেই কাল সকালে তোমায় বলেছিলুম, মাকে একটু সমঝে চ'লো।

স্বাতির জন্য একটি সৎপাত্র চাই। এই সৎ মানে শুধু সৎ নয়, ধনবান ও পদমর্যাদাসম্পন্নও হওয়া চাই। কিন্তু প্রেম বলে একটা মারাত্মক শব্দ আছে। সে অন্ধ। পাত্রাপাত্রের বিচার তার নেই। এই জন্যেই বাপমাকে সর্বদা সতর্ক থাকতে হয়। অবাঞ্ছিত ছেলেদের

সঙ্গে মেয়েকে বেশি মেলামেশার সুযোগ দেওয়া কদাচ উচিত নয়। শাস্ত্রেও বারণ আছে। শুধু যে তপস্বীর ধ্যানভঙ্গ হয় তা নয়, ধ্যানভঙ্গের জন্য কন্যা হয় অপ্সরা। মামীকে দোষ দেওয়া চলে না।

মামী আমার উপরে প্রসন্ন হয়েছিলেন সোমনাথে। তার দুটো কারণ ছিল। প্রথম কালীঘাটের কালীকেষ্ট হালদার একটা মিথ্যা খবর রটিয়েছিলেন। আমি নাকি লটারির একটা মোটা টাকা পেয়েছি। আর দ্বিতীয়, সেখানকার ডাকবাঙলোয় সান্যাল পরিবার আমাকে লেখক বলে প্রাপ্যের অধিক সম্মান করেছিলেন। কিন্তু তাঁর এই সদয় ব্যবহার দীর্ঘস্থায়ী হয় নি। বোম্বাইএ আবার জো রায়ের সাক্ষাৎ পেয়েই তিনি আমাকে সরিয়ে দিলেন। বোম্বাই থেকে কলকাতায় আমি একা ফিরেছিলুম।

তারপর ?

তারপর উৎকল পর্ব। পুরীতে আমি বেড়াতে যাই নি, কলকাতা থেকে পালিয়ে গিয়েছিলুম। না পালিয়ে উপায় ছিল না। মামা লিখেছিলেন, জো রায়ের সঙ্গে স্বাতির বিয়ে হবে, আর সেই বিয়েতে সাহায্য করতে হবে আমাকে। আমি উদার হতে পারি নি, বুকের বেদনা গোপন করবার জন্যেই কলকাতা ছেড়ে পালিয়ে গিয়েছিলুম।

এ বিয়েটাও হল না। কালীকেষ্ট হালদারের কথা বিশ্বাসযোগ্য কি না জানি না, কিন্তু বিয়েটা ভেঙে গিয়েছিল। এ সম্বন্ধে কারও সঙ্গে কথা হয় নি। কাউকে কিছু জিজ্ঞাসা করা উচিত হবে কি না বুঝতে পারি নি।

এ ঘটনা বেশি পুরনো নয়। গত শীত কালের ঘটনা। তারপর বসন্ত গেছে, গ্রীষ্ম ও বর্ষাও শেষ হয়েছে। দিল্লী শহর কলকাতা হলে চারি দিকে দুর্গাপূজার আয়োজন দেখা যেত।

আমি আমার কর্তব্যের কথা ভাবছিলুম। এই পরিবারের সঙ্গী হওয়ার ভিতর খানিকটা যেন অসম্মান আছে। কেন জানি না, আমাদের সামাজিক ব্যবধানের কথা মাঝে মাঝে মনে হয়। এই

ব্যবধান বড় বেদনাদায়ক। অনেক চিন্তানায়ক একে ঘৃণা করেছেন, কিন্তু কোন প্রতিবিধান করতে পারেন নি। প্রাচীন আর্যসমাজের জাতিভেদ দূর হয়ে যে নূতন বর্ণভেদ দেখা দিয়েছে দেশের সমাজে, তার থেকে মুক্তির পথ খুঁজে পাওয়া যায় না। অর্থ প্রতিপত্তি এই বর্ণভেদের কারণ। পৃথিবীতে অর্থের প্রাধান্য যত দিন থাকবে, তত দিন এই বিধানকে আমাদের মানতেই হবে। এই পরিবারের সঙ্গে আমি হিমাচল ভ্রমণে বেরব কি না, সেই কথাই ভাবছিলুম গভীর ভাবে।

কারও কি প্রতীক্ষা করছিলুম?

৩

পিছনে পায়ের শব্দ আমি শুনতে পাই নি। আমি চমকে উঠেছিলুম স্বাতির কণ্ঠস্বর শুনে : তুমি কি ঘুমিয়ে পড়লে ?

একটুখানি সামলে নিয়ে বললুম : ক্লান্তি তো কম নেই !

উঁহু, এ তো ঘুম নয়।

তারপরেই জিজ্ঞাসা করল : আজকাল কি তুমি আফিঙ খাচ্ছ ?

কী আশ্চর্য ! কে বললে তোমাকে ?

স্বাতি বসতে যাচ্ছিল, আমার কথা শুনে থমকে দাঁড়াল।

বললুম : বুঝতে পেরেছি।

কী বুঝেছ ?

এ নিশ্চয়ই কালীঘাটের হালদারের কাজ।

স্বাতির দৃষ্টিতে এবারে বিস্ময় দেখলুম। বেশ কৌতুক বোধ হল। বললুম : ঐ বুড়ো ছাড়া এ খবর আর কেউ জানে না। পুরীতে সমুদ্রের ধারে বসে যখন তার কৌটো থেকে আফিঙের গুলি বার করেছিলেন, তখনই আমি বারণ করেছিলুম। বলেছিলুম, ও বড় সাংঘাতিক নেশা হালদার মশাই, ও আমাকে ধরাবেন না। বুড়ো কি বলেছিলেন জান ?

স্বাতি আমার মুখের দিকে চেয়ে ছিল।

বললুম : বলেছিলেন, ভয় নেই, কাউকে এ কথা বলব না। কিন্তু একবার নেশা ধরলে কি আর মুখে কিছু আটকায় ! এমন অনেক কথা বললেন যে শুনে আশ্চর্য হয়ে গেলুম।

পাশের একখানা চেয়ারে বসে স্বাতি বলল : কী বললেন ?

বললেন এক রাজকন্যার কথা। রাজার সবে ধন নীলমণি ঐ রাজকন্যা। দেখতে শুনতে রূপকথার পরীর মতো। কিন্তু বিয়ে দেবার জন্যে রাজপুত্র আর পাওয়া যায় না। পাত্রমিত্র নিয়ে রাজা একবার মৃগয়ায় গেলেন। সেখানে পছন্দ হয়ে গেল এক চাষার

ছেলে, কিন্তু রানীর হল না। রানী বললেন, চাষার ছেলের সঙ্গে বিয়ে দিলে যে মাথা হেঁট হয়ে যাবে।

তারপর ?

তারপরে রাজা সপরিবারে তীর্থ করতে বেরলেন। বরাতজোরে ভিন্ দেশের রাজপুত্রের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। রানী বললেন, এরই সঙ্গে রাজকন্যার বিয়ে দেব। কিন্তু রাজা দেখলেন, ওমা, রাজপুত্রের নোলা দিয়ে কেন জল পড়ছে! কিন্তু মুখে কিছুই বললেন না।

রাজকন্যা কী দেখলেন ?

সেইটেই হল আসল প্রশ্ন। রাজকন্যার দিকে রানী তাকালেন না। রাজা তাকিয়ে কী দেখলেন তা কাউকে বললেন না।

সেই চাষার ছেলেটা ?

সে তো একটা আহাম্মক। রাজার সুনজরে পড়েছিল বলে সে তো ধরাকে সরা জ্ঞান করেছিল। তারপরেও তার বরাত ফিরছে না দেখে আর হিসেব মেলাতে পারছিল না।

কিসের হিসেব ?

কী পায় নি তারই হিসাব।

সে হিসাব মেলাতে তো মন রাজী হয় না।

সে সকলের নয়। পৃথিবীকে ভালবাসলে অনেক বসন্ত এসে সাজি ভরে দেয়। আপশোষ করার কিছু থাকে না।

আর মানুষকে ভালবাসলে ?

যন্ত্রণার শেষ নেই।

স্বাতি সমর্থন করল না, প্রতিবাদও না। হেসে বলল : তারপর তোমার রাজকন্যার গল্প বল।

বললুম : রাজপুত্রের সঙ্গেই রাজকন্যার বিয়ের ব্যবস্থা পাকা হয়ে গেল। শাড়ি এল গয়না এল, ভারে ভারে দই মিষ্টি এল। কিন্তু—

কিন্তু কী ?

বিয়ে হল না।

কেন ?

কেউ বললে বর এল না, কেউ বললে কনে পালিয়ে গেল।

সত্যি খবরটা কী ?

রাজকন্যা ঘুষ দিয়ে নিজেই বিয়ে বন্ধ করেছিল।

সকৌতুকে স্বাতি জিজ্ঞাসা করল : কাকে ঘুষ দিয়েছিল, রাজপুত্রকে ?

একটা বিট্‌লে বামুনকে।

স্বাতি বুঝি চমকে উঠল। বলল : কে বলেছে তোমাকে ?

বললুম তো, এ সেই কালীঘাটের হালদারের গল্প। বারে বারে বলেছেন, বলব না, যার পয়সায় পুরী এসেছি তার নাম কিছুতেই বলব না। শপথ করেছি।

স্বাতি আরও আশ্চর্য হল, বলল : পুরীতে বুঝি তাঁর সঙ্গে দেখা হয়েছিল ?

দেখা হয়েছিল বৈকি।

আরও কিছু শোনবার জন্য স্বাতি আমার মুখের দিকে চেয়ে রইল।

আমার মনে পড়ল সেই পুরনো ঘটনা। মামা আমাকে স্বাতির বিয়ের সংবাদ দিয়েছিলেন। জো রায়ের সঙ্গে তার বিয়ে ঠিক হয়েছে। বম্বের জো রায়। মাঘ মাসে বিয়ে হবে। বড়দিনের ছুটিতে তিনি দিল্লী থেকে কলকাতায় ফিরবেন। আশীর্বাদ প্রভৃতি পাকা ব্যবস্থাগুলি যথাসম্ভব সত্বর সম্পন্ন করতে হবে। আমার সাহায্য চাই।

এই জো রায়ের সঙ্গে আমাদের পরিচয় হয়েছিল ওখার গাড়িতে। তিনি মিঠাপুর যাচ্ছিলেন তাঁর কোম্পানীর কাজে। আমরা দ্বারকা থেকে সেই গাড়িতেই উঠেছিলুম। জো রায় মিঠাপুরে নামতে পারলেন না, আমাদের সঙ্গে ওখায় গেলেন, গেলেন বেট দ্বারকায়। ফিরলেনও আমাদের সঙ্গে। স্বাতিকে যত খুশী করবার চেষ্টা করেছেন,

তার চেয়ে বেশি করেছেন মামা মামীকে। মামীকে জয় করতেও পেরেছিলেন। কালীঘাটের কালীকেষ্ট হালদার তাঁকে চিনতেন। তাঁর দোষ গুণ সবই জানতেন ভাল করে। তাই তাঁকেও হাত করেছিলেন ঘুষ দিয়ে। আমার ঠিকানাও জো রায়ের নোটবুকে লেখা আছে। দরকার হলে আমার সাহায্য প্রার্থনা করতেন। কিন্তু তার দরকার হয় নি।

সোমনাথে আমি মূর্খের মতো ভেবেছিলুম যে জো রায়কে হারিয়ে দিতে পেরেছি। মামীর ব্যবহারেই তাই মনে হয়েছিল। কিন্তু সে যে কত বড় ভুল, পরে তা বুঝতে পেরেছি।

এ কথা আমার আগেই বোঝা উচিত ছিল। ভারতবর্ষ স্বাধীন হয়েছে রাজনীতিতে, সমাজচেতনায় হয় নি। আজও ভারতের অস্থিতে মজ্জাতে পরাধীন সত্তার গ্লানি লেগে আছে। আজও আমরা মানুষকে তার যোগ্যতা দিয়ে বিচার করি না, বিচার করি তার অর্থ সামর্থ্যে, তার সরকারী প্রতিপত্তিতে। এ দেশ আরও অনেক দিন চাঁদির পূজা করবে।

আমি আশ্চর্য হয়েছিলুম মামার কথা ভেবে। জো রায়কে তো তিনি দেখতে পারতেন না, তাঁর কথাবার্তাতেই সে কথা প্রকাশ পেয়েছে। তিনি এ বিবাহে কি করে রাজী হলেন! তবে কি স্বাতি নিজেই আগে রাজী হয়ে গেল! সেও কি সম্ভব!

না না, এ কিছুতেই হতে পারে না। স্বাতি আর যাই করুক নিজেকে সে এমন করে ঠকাবে না। জো রায় সম্বন্ধে তার মনের কথা তো আমি জানি। নিশ্চয়ই সে তাকে নিয়ে খেলা করেছে।

কিন্তু তা কেন করবে! সে তো ঠিক তেমন মেয়ে নয়!

স্বাতি অনেক দিন আমাকে চিঠিপত্র দেয় নি। চিঠি সে কমই লেখে। কিন্তু এত বড় একটা সিদ্ধান্তের সামান্য আভাসও আমাকে দিল না, এই ভেবে আমার বিস্ময় হয়েছিল। আমার সম্বন্ধে তার দুর্বলতার পরিচয় যেমন পেয়েছি, তেমনি পেয়েছি তার বিরাগের

ইঙ্গিত। গির্ণার পাহাড়ের উপরকোটে স্বাতি আমাকে প্রশ্ন করেছিল, এমন হালকা ভাবে আর কত কাল কাটাবে ? বলেছিল, বড় অপমান বোধ হয়। আমি কি খেলার জিনিস, না বাজারের পণ্য ? সেই সঙ্গেই প্রশ্ন করেছিল, তোমার কি কোন দাম নেই এই সমাজে ? কারও কাছে নিজের যোগ্যতার প্রমাণ দিতে পার না ? তারপর নিজেই বলেছিল, এ যুগের বিচারে তোমার দাম নেই।

আমি বলেছিলুম, এ যুগ একদিন বদলাবে, আর এই ভেবেই আমার সান্ত্বনা।

স্বাতির দৃষ্টি বড় বেদনার্ত দেখেছিলুম। তাই তাকে বলেছিলুম, জান স্বাতি, স্বাধীনতা আমরা কুড়িয়ে পেয়েছি। বুকের রক্ত ঢেলে আদায় করি নি বলেই স্বাধীনতার মর্ম আমরা বুঝি না। কিছু দিন যাক্। চূড়ান্ত দুর্দশার ভেতর হাবুডুবু খেয়ে সবই আমরা বুঝতে পারব।

শান্ত গলায় স্বাতি বলেছিল, সেদিন আর তোমার সঙ্গে ঝগড়া করতে আসব না। তারপরেই সে খিলখিল করে হেসে উঠেছিল। উচ্ছল প্রাণবন্ত হাসি। বলেছিল; তুমি কী বোকা গোপালদা!

তার সেদিনের আচরণ আজও আমার কাছে হেঁয়ালি হয়ে আছে।

তারপরেই মনে হয়েছিল, এ তো হেঁয়ালি নয়। এইটেই বুঝি তার সত্য রূপ। ছলনা সমস্ত নারীরই প্রকৃতি। স্বাতি তো এই প্রাকৃতিক নিয়মের ব্যতিক্রম নয়, নারীর খণ্ড রূপকেই সে একটা সম্পূর্ণতা লাভে সাহায্য করছে। মায়াবিনী নারী!

পরের মুহূর্তেই নিজেকে আমি ধিক্কার দিয়েছি। স্বাতিকে আমি ভুল বুঝব! তার পরিহাসকে সত্য ভেবে আমি তার এত দিনের আন্তরিকতার অমর্যাদা করব মূর্খের মতো! স্বাতি আমাকে কী ভাববে!

তবু আমি কলকাতা থেকে পালিয়ে গিয়েছিলুম। জীবনের সব-চেয়ে বড় লোকসানটা চোখের সামনে হবে না, এইটুকু লাভের

আশাতেই পালিয়ে গিয়েছিলুম পুরীতে। হালদার মশায়ের সঙ্গে দেখা হয়েছিল সেইখানে। জিজ্ঞাসা করেছিলেন : আপনি এখানে কী করছেন ?

বলেছিলুম : তীর্থ করতে এসেছি।

হালদার মশাই একটা ভেংচি কেটে বলেছিলেন : আর ওদিকে সব হয়ে যাচ্ছিল ! তীর্থ করবার সময়ই বটে !

ভদ্রলোকের গল্প বলার একটা নিজস্ব ভঙ্গি আছে। আগের কথা পরে বলবেন, পরের কথা আগে। কৌতূহল জাগিয়ে মানুষকে পীড়া দেবেন। বলেছিলেন : এখানকার মাটিতে পা দিয়ে অবধি ভাবছিলুম, গোপালবাবুর সঙ্গে দেখা হলে মন্দ হয় না। অঘোর গোস্বামী দুঃখ করছিলেন, কাউকে না বলে ছেলেটা কোথায় চলে গেল !

আমি আশ্চর্য হয়ে বলেছিলুম : আপনি সেখানে গিয়েছিলেন নাকি ?

শুধু গিয়েছি নয়, অনেক কাজ করেছি। সব কথা শুনলে হালদারকে খুব খারাপ লোক বলে মনে হবে না।

কে বললে আপনাকে আমি খারাপ লোক ভাবি ?

সবাই ভাবে, আর আপনি ভাববেন না কেন।

একটু থেমে বলেছিলেন : বুঝলেন গোপালবাবু, পরনিন্দার জন্যে পরনিন্দা করি না, করি পেটের জন্যে। আর ভয় দেখিয়েই যদি রোজগার হয় তো ও কাজই বা কেন করব ! এই আপনাদের কথাই ভাবুন না। যা দেখেছি, তা কি যথেষ্ট নয় ! ইচ্ছে করলে এই কথা ভাঙিয়েই খেতে পারতুম। কিন্তু তা করি নি। আপনারা যে নির্দোষ সে কথা তো জানি।

রামেশ্বরের কথা আমার মনে পড়ল। রাত্রের আরতি দেখতে স্বাতিকে নিয়ে মন্দিরে গিয়েছিলুম। ক্লান্ত দেহে দুজনেই সেখানে ঘুমিয়ে পড়েছিলুম। হালদার মশাই এ কথা জানেন। তিনি সেখানে ছিলেন। তারপর আমাদের দুজনকে এক সঙ্গে দেখেছেন পুষ্করের

পথে, দ্বারকার সমুদ্রবেলায় অন্ধকারে, আর সোমনাথের মন্দিরের আড়ালে পূর্ণিমার চাঁদের আলোয়। এ নিয়ে সত্যিই অনেক মুখরোচক গল্প হয়। কিন্তু হালদার মশাই সে রকম কিছু করেছেন বলে শুনি নি। বলেছিলুম : সত্যি কথা।

সত্যি কথা!

হালদার মশাই হেসে বলেছিলেন : এবারে বলেছি সব কথা। বলে বিয়েটা ভেঙে দিয়েছি।

তারপরেই বলেছিলেন : হাঁ করে দেখছেন কী! এবারে এই কর্মই তো করে এলুম। যার পয়সায় এলুম, তার নাম আমি কিছুতেই বলব না।

সহসা অত্যন্ত অমায়িক হাসি হেসে বলেছিলেন : প্রতিজ্ঞা করেছি।

অনেক চেষ্টায় সমস্ত ঘটনাটা জানতে পেরেছিলুম। জো রায়ের কীর্তির কথা গোপন রাখবেন, এই অঙ্গীকার করেছিলেন পাঁচশো টাকার একশো আগাম পেয়ে। বাকি চারশো টাকা জো রায় দেন নি। হালদার মশাই তাঁর বাপের কাছে গিয়েছিলেন ছেলের খোঁজ নিতে। দরকার হলে ঠিকানাটাও চেয়ে নেবেন। সেখানেই তাঁর বিয়ের খবর শুনলেন। জো রায় যে পাত্র খারাপ, অঘোর গোস্বামীর কাছে সে কথা বলা চলে না। তীর্থস্থানে নাকি শপথ করেছেন। কাজেই জো রায়ের বাপের কাছে মেয়ের কথা বলতে হল। মেয়ে ভাল। কিন্তু—

হালদার মশাই একগাল হেসে বলেছিলেন : এই কিন্তুটি আমাকে বলতে বলবেন না।

তারপর?

বললুম বুড়োকে, বিশ্বাস না হয়, জিজ্ঞেস করুন অঘোর গোস্বামীকে, সে মিথ্যে কথা বলবে না।

জানি না হালদার মশাই কী বলেছেন। কিন্তু সে যে উপাদেয় কিছু নয়, তাতে আমার সন্দেহ নেই।

হালদার মশাই রসিয়ে রসিয়ে হেসেছিলেন, বলেছিলেন : তুই বুড়োয় কী কথা হল জানি নে। গোঁসাইজীর বাড়ি গিয়ে খবর পেলুম, বিয়ে ভেঙে গেছে।

স্বাতি আমার মুখের দিকে চেয়ে ছিল। বললুম : সমুদ্রের ধারে বালির উপর বসে বুড়ো রাজকন্যার গল্প বলেছিলেন। আর কৌটো থেকে একটা আফিঙের গুলি বার করে খেতে দিয়েছিলেন। প্রথম দিন অনিচ্ছায় খেয়েছিলুম। তারপর নেশা ধরে গেল। কিন্তু কী আক্কেল দেখ বুড়ো ভদ্রলোকের! কথা দিয়ে কথা আর রাখলেন না।

স্বাতি হেসে বলল : আফিঙখোরের গল্প কি না, হিসেবের ভুলটা চোখে পড়ছে না।

কী রকম?

রাজকন্যা যদি বিয়েতে রাজীই হবেন তো ঘুষ দিয়ে বিয়েভাঙবেন কেন?

বললুম : সংস্কৃত শ্লোকটা যেন কী?—স্ত্রিয়াশ্চরিত্রং দেবা ন জানন্তি—

কুতো গোপালদা।

বলে স্বাতি খিলখিল করে হেসে উঠল।

বললুম : গোপালদা তো দেবতা নয়, গোপালদা যা বোঝবার তা ঠিকই বোঝে।

বোঝে নাকি?

রাজকন্যার পা এখন দু নৌকোয়। ভাবছে, কুল রাখি, না শ্যাম রাখি। দুটোই রাখবার ইচ্ছা বলে বারে বারে বেসামাল হচ্ছে।

শেষ পর্যন্ত?

চণ্ডীদাস বিদ্যাপতি।

মানে?

পরিপূর্ণ গাম্ভীর্যের সঙ্গে বললুম : অলপ বয়সে পীরিতি করিয়া—

বাধা দিয়ে স্বাতি বলল : তোমার রাজকন্যের বয়েস বুঝি অল্প!

বিয়ে না হলে মেয়েদের বয়স বাড়ে না।

বল কী! আমাদের স্কুলের হেডমিস্ট্রেস যে অবিবাহিত ছিলেন।

তাঁরও মনের বয়েস কাঁচা ছিল। প্রেম করার চেষ্টা করলে হয়তো কেলেঙ্কারি করে ফেলতেন।

স্বাতি ফুলে ফুলে হাসতে লাগল, বলল: তাঁর প্রেম করার কথা আমি ভাবতেই পারি না।

কেন?

তাঁকে দেখলে যে কোন পুরুষ ভয় পাবে।

কিন্তু শেক্সপীয়র কী বলেন তা তো তুমিই আমাকে বলেছিলে।

কী?

The lover, all as frantic,
Sees Helen's beauty in a brow of Egypt.

কথাটা বুঝি তোমার খুব ভাল লেগেছে?

ভাল লাগবার মতোই কথা যে। প্রেমিকের চোখে নিগ্রো মেয়েও হেলেনের মতো রূপসী মনে হয়। প্রেম হল রঙিন কাচ।

স্বাতি বলল: হঠাৎ এই আধ্যাত্মিক মনোভাব কেন?

বললুম: তোমার হেডমিস্ট্রেসের কথায়। রাজকন্যার কথা থেকে তাঁর কথা। আমরা এখন রাজকন্যার কথায় ফিরে যেতে পারি।

তোমার রাজপুত্র কী করছে?

জানি নে।

চাষার ছেলে?

রাজকন্যার খোঁজে এসেছে রাজধানীতে।

স্বাতি আর একবার হেসে উঠল।

৪

সন্ধ্যাবেলায় চাওলা তার ছোট গাড়িখানা চালিয়ে এল। মিত্রাও সঙ্গে এল। তাদের হাতে একগোছা কাগজপত্র। আমি এগিয়ে গিয়েছিলুম। আমার দিকে সেই কাগজপত্র এগিয়ে দিয়ে চাওলা বলল : তোমার জন্যেই এগুলো নিয়ে এলুম।

আমি হাত বাড়িয়ে তা গ্রহণ করে দেখলুম, সে সব সরকারী গাইড বই ও সচিত্র পুস্তিকা। এক নজরে বিষয়বস্তুও দেখে নিলুম—সবগুলিই পাঞ্জাব রাজ্যের পরিচয়, কুলু ও কাঙ্গড়া উপত্যকার কথাও আছে। জিজ্ঞাসা করলুম : এ সব কী হবে ?

মিত্রা বলল : কেন, আপনার কাজে লাগবে না ?

মামা মামীও বেরিয়ে পড়েছিলেন। আর স্বাতি এসেছিল এগিয়ে। উত্তর সে-ই দিল, বলল : না।

না মানে ?

গোপালদা যাবেন না বলছেন।

আমি আশ্চর্য হয়ে তার মুখের দিকে তাকালুম। এমন কথা আমার সঙ্গে তার হয় নি। বোধ হয় কারও সঙ্গেই হয় নি। এ বিষয়ে আমি এখনও চিন্তা করবার অবসর পাই নি। অথচ স্বাতি আমার হয়ে আমার কর্তব্য স্থির করে ফেলেছে।

সব চেয়ে আশ্চর্য হল চাওলা, বলল : না না, গোপালবাবু এমন কথা কিছুতেই বলতে পারেন না, আমরা বলতে দেব না।

মিত্রাও জোর দিয়ে বলল : আমরা কি ওঁকে দেশে ফিরে যাবার জন্যে ধরে এনেছি ?

মামা কিছু শুনতে পেয়েছিলেন। বললেন : গোপাল কী বলছে ?

চাওলা বলল : শুনুন না কথা, গোপালবাবু নাকি আপনাদের সঙ্গে যাবেন না।

মামা বললেন ঃ যাবে না বললেই হল! কে শুনছে তার কথা।

আমরা সবাই এসে বসবার ঘরে বসলুম।

মামী আমার মুখের দিকে চেয়ে জিজ্ঞাসা করলেন ঃ তোমার ছুটি বুঝি ফুরিয়েছে?

এই সময় আমার অনেক দিন আগের একটা ঘটনা মনে পড়ল। স্বাতি আমাকে বম্বে শহর দেখবার জন্যে টেনে নিয়ে গিয়েছিল ভোর-বেলায়। কাউকে বলে যায় নি। পরে জো রায় তাকে আবিষ্কার করে বলেছিলেন, আপনি বেশ অ্যাড্‌ভেঞ্চারাস।

স্বাতি বলেছিল, গোপালদার মতো নই।

তাই নাকি!

আজ এখানে, কাল শুনবেন খাজুরাহোর ভাঙা মন্দিরে শুয়ে ঘুমচ্ছেন।

জো রায় আশ্চর্য হয়ে বলেছিলেন, বলেন কী!

তাই না গোপালদা?

বলে স্বাতি আমার দিকে ফিরে তাকিয়েছিল।

সেদিন আমার মনে হয়েছিল, স্বাতি আমাকে ফিরে যেতে বলছে। তার একটু আগে আমারও এই কথা মনে হয়েছে। আমি চলে গেলে মামী নিশ্চিন্ত হবেন, খুশী হবেন জো রায়। স্বাতির মনের কথাটি জানি নে বলেই এ প্রস্তাব করতে সাহস পাই নি। স্বাতির কথা শুনে বলে ফেললুম, ভাবছি—

স্বাতি বলল, আজই ফিরবে?

আমি চমকে উঠেছিলুম। বুকের ভিতরটা বুঝি মুচড়ে উঠেছিল। কেন এমন হল, সে কথা ভেবে দেখবার সময় পেলুম না। বললুম, আজই।

জো রায় আশ্চর্য হয়েছিলেন। কিন্তু মামী কথা কয়েছিলেন শান্ত ভাবে, তোমার ছুটি বুঝি ফুরল?

ছুটি আমার অনেক দিন আগেই ফুরিয়েছে। ছুটির কথা কোন দিন আমি ভাবি নি। সেদিনও সে কথা মনে হয় নি। তবু বলেছিলুম, আর দেরি করলে চাকরিটা যাবে।

আজও আমি মামীকে বললুম : আর দেরি করলে চাকরিটা যাবে।

মামা পাইপ ধরাচ্ছিলেন। আমার উত্তর শুনে বললেন : তোমার চাকরি তো রোজই যাচ্ছে।

স্বাতি যে মুখ লুকিয়ে হাসছিল, এবারে আমি তা দেখতে পেলুম।

মামা পাইপ ধরানো শেষ করে তাঁর মন্তব্যটা সম্পূর্ণ করলেন : সত্যি সত্যিই যদি যেত তো বাঁচতুম।

আমি এ কথার উত্তর দেবার অবকাশ পেলুম না। চাওলা বলে উঠল : আরে রেখে দিন আপনার ওজর আপত্তি, ওসব আর কেউ শুনবে না।

তারপর মিত্রার দিকে চেয়ে বলল : একটা কাগজ পেনসিল নাও তো, আমরাই এঁদের ইটিনেরারি তৈরি করে দিই।

বলে কোলের উপরে একখানা বড় মানচিত্র খুলে বসল।

স্বাতি চাওলার পিছনে এসে দাঁড়াল। বলল : ইটিনেরারি তো আমাদের একটা করাই আছে। দিল্লী থেকে আমরা পাঠানকোট যাব। তারপর কুলু কাঙ্গড়া হয়ে কাশ্মীর।

মিত্রা বলে উঠল : একেবারেই অচল। তোমাদের চলতে পারে, কিন্তু গোপালবাবুর একেবারে চলবে না।

কেন?

এবারে ওঁর কোন্ পর্ব হবে আগে জেনে নাও, পাঞ্জাব না কাশ্মীর।

চাওলা বলল : কুলু কাঙ্গড়া কিন্তু পাঞ্জাবেও না, কাশ্মীরেও না। ওর নাম হিমাচল।

স্বাতি বলল : তবে হিমাচল পর্ব হোক।

মিত্রা বলল : পঞ্চনদ পর্ব কি তবে আলাদা হবে?

এই সব আলোচনা শুনে মামা হাসছিলেন। ভারি প্রসন্ন হাসি।

আমি কোন উত্তর দিলুম না দেখে বললেন : গোপাল যা করবে, তা ঠিক করেই রেখেছে। ওকে ওর সংকল্প থেকে টলাতে পারবে না।

এ কথা মামা বোধহয় আগেও বলেছিলেন। আলোচনা এখন পুরোপুরি আমার উপরেই হচ্ছে দেখে আমি বললুম : আর যাই করুন, আপনারা কুরুক্ষেত্রটা বাদ দেবেন না। ও আমাদের দেশের একটা পবিত্র তীর্থ।

স্বাতি আমার দিকে তাকিয়ে পরম কৌতুকের হাসি হাসল। আমি তার এই হাসির অর্থ বুঝি। সে ভাবে, এ আমার মামীর মন রাখার কথা। প্রমোদভ্রমণকে তিনি তীর্থভ্রমণ মনে করতে পারলে অর্থ ব্যয়ের একটা যুক্তি খুঁজে পান। কুলু কাঙ্গড়া ও কাশ্মীরের কথায় মামী উৎসাহ দেখাতে পারেন না, কিন্তু তীর্থের নামে কোন সঙ্কোচ আর থাকে না। আমার কথা শুনে বললেন : কুরুক্ষেত্র কি এই দিকে নাকি ?

মামীর প্রশ্ন শুনে আমি স্বাতির দিকে তাকালুম। তাতেই তার হাসির উত্তর দেওয়া হল।

চাওলা বলল : এই দিকেই তো। এ যুগের সব চেয়ে বড় যুদ্ধক্ষেত্র পানিপথ আর সে যুগের কুরুক্ষেত্র দুইই কাছাকাছি। দিল্লী থেকে যে লাইন উত্তরমুখো সোজা সিমলা গেছে, তারই ওপর প্রথমে পানিপথ, পরে কুরুক্ষেত্র। তারপর আম্বালা পেরিয়ে চণ্ডীগড়। পাঞ্জাবের রাজধানী এখন চণ্ডীগড়ে।

চাওলার পিছন থেকে স্বাতি ঝুঁকে মানচিত্র দেখছিল। বলল : এ জায়গাগুলো তো খুব কাছাকাছি দেখছি।

চাওলা মুখ তুলে বলল : খুব কাছাকাছি নয়, তবে দূরও নয়। দিল্লী থেকে কুরুক্ষেত্র একশো মাইলের কিছু কম, পানিপথ মাঝপথে। তবে চণ্ডীগড় আর কালকা মাত্র মাইল দশেকের ব্যবধানে।

মামা জিজ্ঞাসা করলেন : কুরুক্ষেত্র থেকে চণ্ডীগড় ?

চাওলা এবারে আমার দিকে তাকিয়ে বলল : টাইম টেবিলটা এবারে খুলতেই হল।

বলে কাগজপত্রের ভিতর থেকে একখানা টাইম টেবিল টেনে বার করল। খানকয়েক পাতা উল্টে বলল : পেয়েছি। সাতানব্বুই মাইলে কুরুক্ষেত্র, আম্বালা একশো তেইশ মাইলে, আর চণ্ডীগড় একশো তিপ্পান্নয়। কুরুক্ষেত্র থেকে চণ্ডীগড় তাহলে তিন আর তিন ছাপ্পান্ন মাইল।

মিত্রা বলল : তিন আর তিন ছাপ্পান্ন কী করে হল?

চাওলা বলল : এ আমাদের দেশী হিসেব। এ হিসেব বুঝতে তোমাদের সময় লাগবে। তার চেয়ে লিখে নাও, দিল্লী থেকে সিমলা। প্রথমে কুরুক্ষেত্র দর্শন, তারপর চণ্ডীগড়। পানিপথের গল্প গোপাল-বাবু বলবেন।

আমি বললুম : চণ্ডীগড়ের গল্পটা তুমি শোনালে সেখানেও আমাদের নামতে হবে না।

চাওলা বলল : না না, চণ্ডীগড় বাদ দিও না। একটা নতুন রাজধানী কী করে গড়ে উঠছে সে সম্বন্ধে খানিকটা ধারণা করে নেওয়া দরকার।

চাওলার কাছ থেকে মানচিত্রটা আমি চেয়ে নিলুম। ভারতবর্ষের নয়, পাঞ্জাবের মানচিত্র এটি। খণ্ডিত পাঞ্জাব, উত্তর-স্বাধীনতা যুগে আমরা এই রাজ্যকে পূর্ব পাঞ্জাব বলি। দক্ষিণ-পশ্চিমাংশে কোন দর্শনীয় স্থান নেই। যা কিছু দেখবার, তা সবই উত্তরে। কলকাতা থেকে যে পাঞ্জাব মেল ছাড়ে, তা আম্বালার উপর দিয়ে অমৃতসরে যায়। পথে লুধিয়ানা ও জলন্ধর দুটি বড় শহর। পাতিয়ালা রাজ্য আম্বালার কাছে। জলন্ধরের নিকটে কপুরথলা। অমৃতসর থেকে লাহোরের দূরত্ব অল্প, কিন্তু লাহোর এখন পাকিস্তানে পড়েছে।

আম্বালা ও লুধিয়ানার মাঝখানে সরহিন্দ নামে একটা স্টেশন থেকে শাখা লাইন গেছে নাঙ্গাল পর্যন্ত। তার খানিকটা উত্তরে শতদ্রু নদীর উপরে বিখ্যাত ভাকরা বাঁধ। এই বাঁধের উপর দাঁড়িয়ে ভারতের প্রধান মন্ত্রী পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু একদিন বলেছিলেন যে এই

বাঁধগুলিই ভারতের নূতন মন্দির। খবরের কাগজে এই কথা পড়েছিলুম।

সিমলা অঞ্চলেও দ্রষ্টব্য স্থান অনেকগুলি আছে। পিঞ্জোর কসৌলি ধরমপুর সোলান। অল্প সময়ে এ সমস্ত জায়গা দেখতে হলে গাড়ি চাই। দিল্লী থেকে সিমলা পর্যন্ত জাতীয় রাজপথ এসেছে রেল লাইনের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে। চণ্ডীগড় থেকে একটা পথ রূপাড় আনন্দপুর হয়ে নাঙ্গাল ও ভাকরা বাঁধ পর্যন্ত গেছে। জাতীয় রাজপথ আম্বালা থেকে জলন্ধর ও সেখানে দু ভাগ হয়ে এক ভাগ অমৃতসর ও অপর ভাগ পাঠানকোট পৌঁছেছে। অমৃতসর থেকেও একটা পথ পাঠানকোট গেছে।

পাঠানকোটে রেল লাইন এসেছে তিন ধার থেকে—অমৃতসর ও জলন্ধর থেকে বড় লাইন, কাঙ্গড়া উপত্যকার যোগীন্দর নগর থেকে ছোট লাইন। দূর পাল্লার ট্রেন আসে দিল্লী আর কলকাতা থেকে।

পাঠানকোট শুধু জম্মু ও কাশ্মীর যাবার ঘাঁটি নয়, চাম্বা কুলু ও কাঙ্গড়া উপত্যকায় যাবার পথও এইখান থেকেই শুরু হয়েছে। চাম্বা উপত্যকায় ডালহৌসি, কাঙ্গড়া উপত্যকায় কাঙ্গড়া ধরমশালা জ্বালামুখী পালমপুর ও বৈজনাথ, তারপর মুণ্ডি কুলু মানালি। স্পিতি ও লাহৌল রাজ্য। সিমলা থেকেও এখানে আসবার পথ আছে।

মানচিত্রের মধ্যে আমি ডুবে গিয়েছিলুম। চমক ভাঙল স্বাতির হাসিতে। চাওলাকে সে বলছিল : মনোযোগ দেখছেন!

আমাকে লজ্জা পেতে দেখে চাওলাও হাসল।

মামা বললেন : কী দেখলে?

তাঁর দিকে তাকিয়ে আমি মামীকে পাশে দেখতে পেলুম না। তিনি কখন উঠে গিয়েছিলেন বুঝতে পারি নি। এবারে যখন রামখেলাওনের সঙ্গে ফিরে এলেন, তখন তাঁর উঠে যাবার কারণ বুঝতে পারলুম। চা কিংবা কফি এসেছে, সঙ্গে খাবার। বললুম : গলাটা ভিজিয়ে নিয়ে বলছি।

কফি তৈরি হয়েই এসেছিল, আমরা শুধু চিনি মিশিয়ে নিলুম। স্বাতি বেশ তাড়াতাড়ি সবাইকে বিতরণ করে দিল।

কফিতে আমি একটা চুমুক দেবার পরেই মামা বললেন : বল এইবারে।

আমি ভেবেছিলুম, মামা তাঁর প্রশ্নটা ভুলে গেছেন। কিন্তু তাঁর প্রশ্ন শুনে সে ভুল ভাঙল। বললুম : পাঞ্জাবে যে দর্শনীয় স্থান অনেক আছে তাতে সন্দেহ নেই। সিমলা যেমন লোকজনে সারাক্ষণ সরগরম, ডালহৌসি তেমনি শান্ত সমাহিত। অমৃতসরে সোনার মন্দির।

মামী জিজ্ঞাসা করলেন : মন্দির কোন্ দেবতার ?

চাওলা চমৎকার বাঙলা বোঝে, উত্তর দিল : সোনার মন্দির শিখদের। হিন্দু মন্দিরও আছে, তার নাম দুর্গিয়ানা।

স্বাতি চাওলাকে জিজ্ঞাসা করল : সিমলায় কোন মন্দির নেই ?

চাওলা বলল : আছে বৈকি, তারাদেবী পাহাড়ে তারাদেবী, প্রস্পেক্ট হিলে কামনাদেবী, আর সব চেয়ে ভাল লাগবে আপনাদের কালীবাড়ি। দিল্লীর কালীবাড়ির মতো সিমলার কালীবাড়িও খুব প্রসিদ্ধ। আমি যত দূর জানি, কালী হল বাঙালীর ঠাকুর। কে একজন নাকি বলেছেন যে পুরাকালে দশ ঘর বাঙালী প্রবাসে মিলিত হলেই চাঁদা তুলে একটা কালীবাড়ি গড়ে তুলত। ভারতবর্ষের কোন্ কোন্ শহরে এমন কালীবাড়ি আছে জানি নে। কিন্তু দিল্লী সিমলার কালীবাড়ি না দেখলে আপনাদের দুঃখ থেকে যাবে।

মামা জিজ্ঞাসা করলেন : কুলু কাঙ্গড়ায় কী দেখবার আছে ?

যদি আপেল খেয়ে শরীর সারাতে চান তো কুলুতে যান, নয় মানালি। দশেরার সময় থাকলে তেত্রিশ কোটি দেবতাও দেখতে পাবেন। তখন এর Valley of Gods নাম সার্থক বলে স্বীকার করবেন। আর যদি তীর্থদর্শনের বাসনা থাকে, তাহলে কাঙ্গড়ায় যাবেন। কাঙ্গড়া শহরে বজ্রেশ্বরী মন্দির, বৈজনাথে বৈজনাথ শিব, আর জ্বালামুখীতে জ্বালামুখীদেবী, আগুনের শিখাই সেখানে দেবীর মূর্তি।

বিস্মিত কণ্ঠে মামী প্রশ্ন করলেন : মানে ?

চাওলা বোধহয় এর বেশি কিছু জানে না, তাই আমার মুখের দিকে তাকাল। আর স্বাতি আমার দিকে তাকিয়ে হাসল।

আমি সবজান্তা বলে অনেকদিন আগেই তাদের কাছে বদনাম কিনেছি। লক্ষ্য করে দেখেছি যে ইতিহাস পুরাতত্ত্ব ও পৌরাণিক কাহিনী কিছু জানার জন্যেই আমার এই বদনাম। আমি যদি পৃথিবীর সমস্ত কেলেঙ্কারির কথা জেনে ফেলতুম, সমস্ত উপন্যাস গল্প ও ছায়াচিত্রের কথা, তাহলে আমাকে কেউ সবজান্তা বলত না। বিশ্বামিত্রের মায়ের নাম না শিখে যদি অড্রি হেপ্‌বার্ণের মায়ের নাম বলতে পারতুম, তাহলে এই সমাজ আমাকে ব্যঙ্গ করত না। স্বাতির মনের কথা আমি আজও ভাল বুঝি নি, তবে সে এই রকমের হাসি দিয়ে আমাকে আমার দুর্বলতার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। আমি সাবধান হয়ে যাই। আজও আমি সাবধান হয়ে গেলুম। চাওলার নির্বাক প্রশ্নের কোন উত্তর দিলুম না।

খানিকক্ষণ অপেক্ষা করে চাওলা বলল : জ্বালামুখী আমি যাই নি। এর বেশি কিছু আমার জানা নেই।

ঠিক এই সময়েই বোধহয় তার গাইড বইএর কথা মনে পড়ল। দু তিনখানা বই খুলে পাতা উলটিয়ে দেখল, পড়লও কয়েকটা করে লাইন। তারপর বলল : She of burning mouth, goddess of burning mouth. এই দেখছি জ্বালামুখীর নাম। বলছে, ঘরের মধ্যে এক রকমের গ্যাসের আলো সারাক্ষণ জ্বলছে। কখনও নেবে না, কোন দিন নেবে না। পৌরাণিক কোন কাহিনী এতে লেখে নি।

পাছে মামা কিছু জিজ্ঞাসা করে বসেন, এই ভয়ে আমি তাড়াতাড়ি বললুম : পাঞ্জাবে আর কী দর্শনীয় স্থান আছে বল।

আমার প্রশ্নে চাওলা বোধহয় আরাম বোধ করল। তারপরেই বলল : এ হল খণ্ডিত পাঞ্জাবের কথা। পঞ্চনদ আর আমাদের দেখা হবে না।

অনেকক্ষণ পরে মিত্রা কথা কইল, বলল : এ তোমার অভিমানের কথা। পঞ্চনদ তো আমরা হারাই নি। শতদ্রু বিপাশা ইরাবতী চন্দ্রভাগা ও বিতস্তা এখনও আমাদের দেশের উপর দিয়েই প্রবাহিত হচ্ছে।

এ কথা মিথ্যা নয়। হিমালয় আমাদের দেশে, আর এই সব নদী জন্মেছে হিমালয়ে। শুধু শতদ্রু আর সিন্ধুর জন্ম মানস সরোবরে।

একদা এই সিন্ধু ও সরস্বতীর মধ্যবর্তী পঞ্চনদের অববাহিকাকে সপ্ত সিন্ধব বলত। সপ্ত সিন্ধবেই আর্য সভ্যতার প্রথম বিকাশ হয় খ্রীষ্টের জন্মের দু হাজার বৎসর আগে। ধীরে ধীরে এই সভ্যতা সমস্ত ভারতবর্ষে প্রসারিত হয়েছে।

চাওলা বিমর্ষ ভাবে বলল : সে শুধু নামে। আমাদের পাঞ্জাব আজ পররাজ্যে পরিণত হয়েছে।

চাওলা যে পশ্চিম পাঞ্জাবের ছেলে, আমি তা জানি। এ আলোচনা বেশি দূর অগ্রসর হলে তার হৃদয়ের ক্ষত আরও রক্তাক্ত হবে। তাই তার মানচিত্রটা ফিরিয়ে দিয়ে বললুম : কফি তো শেষ হয়েছে, ইটিনেরারিটা এবারে শেষ করে ফেল।

চাওলা জেগে উঠল, আর হেসে উঠল সেই সঙ্গে। সবাইকে বিভ্রান্ত করবার জন্যেই বুঝি হেসে উঠল। এই হাসি দিয়ে বোঝাতে চাইল যে এতক্ষণ যে কথা সে বলছিল সে তার হৃদয়ের কথা নয়, দেশ বিভাগকে সে আর দশজনের মতোই সহজ ভাবে গ্রহণ করেছে। তার জন্য তার মনে কোন ক্ষোভ নেই, কোন অভিমান নেই।

কিন্তু আমি তার হাসির মধ্যে যেন কান্নার ধ্বনি শুনলুম।

চাওলারা আমাদের ভ্রমণের একটা খসড়া তৈরি করে দিয়ে ফিরে গেল। দিল্লী থেকে আমরা রাতের ট্রেনে সিমলা যাব। কুরুক্ষেত্র ও চণ্ডীগড়ে নামা হবে না। ভোরবেলায় কাল্‌কা পৌঁছে রেলে করে সিমলা। দিন কয়েক থেকে আশেপাশের সমস্ত জায়গাগুলো দেখে নিয়ে মোটরে চণ্ডীগড়। সেখান থেকে ভাকরা নাঙ্গাল। মোটরে ফেরার সুবিধা এই যে অল্প সময়ে কসৌলি ও পিঞ্জোর দেখে নেওয়া যাবে। আবার ভাকরা যাবার পথে রূপাড় আনন্দপুর ও নাঙ্গাল।

কুরুক্ষেত্রে নামা হবে না শুনে মামী আপত্তি করেছিলেন। তার উত্তরে চাওলা বলেছিল যে দিল্লী ফেরার পথে কুরুক্ষেত্র ভাল লাগবে। দীর্ঘ দিনের ভ্রমণে অনেক অনিয়ম ও অনাচার তো হবে, কুরুক্ষেত্রের সরোবরে স্নান করে লক্ষ্মীনারায়ণ ও দুর্গার পূজা করে দিল্লী ফিরলে অশ্বমেধ যজ্ঞের পুণ্য হবে। চাওলার এ যুক্তি মামী মেনে নিয়েছিলেন।

চাওলা বলেছিল : লুধিয়ানা ও জলন্ধরে না নামলেও ক্ষতি নেই, অমৃতসর দেখে পাঠানকোট চলে যাবেন। সেখান থেকে ডালহৌসি চাম্বা। দেখবেন, কাঙ্গড়া আর কুলু উপত্যকা। তারপর ফিরে এসে কাশ্মীর।

বলেছিল : গোপালবাবু তো সঙ্গে থাকবেন। কোথায় কত দিন থাকতে হবে সে হিসেব তিনিই করবেন। হাতে যখন সময় আছে, তখন তাড়াহুড়ো করবার দরকার দেখি না।

ওরা চলে যাবার পর আমি বাহিরে খোলা আকাশের নিচে এসে বসেছিলুম। মামা মামী বসেছিলেন সন্ধ্যা আহ্নিক করতে, আর স্বাতি সংসারের কাজ দেখার নামে ঘরের ভিতরে রয়ে গেল।

দীর্ঘ দিনের এই ভ্রমণে আমার সঙ্গী হওয়া উচিত হবে কি না বুঝতে পারছিলুম না। নিজের কোন বাধার জন্য নয়, বাধা সৌজন্যের। নিজের পয়সায় এই ভ্রমণ করি, এমন সঙ্গতি আমার

নেই। মামার উপরে আমাকে সম্পূর্ণ নির্ভর করতে হবে। এত দিন আমার লজ্জা হয় নি, কিন্তু এবারে আমার সঙ্কোচ এল।

কেন জানি না, এই পরিবারের কাছে আমি এখনও সহজ হতে পারি নি। আজ সকালে দিল্লীতে পোঁছেছি। নিজেদের বাড়ি যাওয়ার পথে চাওলারা আমাকে এখানে নামিয়ে দিয়ে গিয়েছিল। সন্ধ্যাবেলা আবার এসেছিল খবর নিতে। হাসি গল্পে আমাদের সারা দিন কেটেছে। কিন্তু তবু আমার বেসুরো ঠেকছে। কেন এমন মনে হচ্ছে তা বুঝি। সে গত বড়দিনের কথা। মামা মামী জো রায়ের সঙ্গে স্বাতির বিবাহ স্থির করেছিলেন। কিন্তু সে বিয়ে হয় নি। মামারা কলকাতা থেকে দিল্লী ফিরে গিয়েছিলেন। কেন বিয়ে হল না, তা নিয়ে আমাদের কোন আলোচনা হয় নি। কেমন করে সম্বন্ধ হল, আর কেনই বা তা ভেঙে গেল, সে সব কথা আমি জানতে চাই নি। জানতে চাইলে বোধহয় আবহাওয়াটা হালকা হত। স্বাতির সঙ্গে আমার হেঁয়ালিতে কথা হয়েছে। কিন্তু মনের কথা তারও জানা হয় নি।

আজ রাতেই আমাকে একটা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে। এঁদের সঙ্গে বেরব কিংবা দেশে ফিরে যাব। ফিরে গেলে আমার আর্থিক অসঙ্গতির জন্য লজ্জা পেতে হবে না। তবে দুঃখ পাব নূতন দেশ দেখার সুযোগ হারিয়ে।

ভারতবর্ষের এই অঞ্চলই তো আর্যদের প্রাচীনতম লীলাভূমি। বিদেশী ঐতিহাসিকেরা বলেন যে খ্রীষ্টের জন্মের দু হাজার বছর আগে এই সপ্ত সিন্ধবেই আর্য সভ্যতার প্রথম বিকাশ হয়েছিল। কিন্তু আমাদের হিসাবে এই স্থানের ইতিহাস আরও প্রাচীন। খ্রীষ্টের জন্মের তারিখ দিয়ে আমাদের সভ্যতার ইতিহাস রচনা অসম্ভব। আর কৃষ্ণের জন্মের তারিখ আমাদের জানা নেই। সেও তো দ্বাপরের কথা, ত্রেতা ও সত্য যুগ আরও আগে। সত্য যুগেই তো আর্য সভ্যতার পূর্ণ বিকাশ হয়েছিল।

এই সপ্ত সিন্ধবে সরস্বতী নদীর তীরে ঋষিরা বেদ রচনা করেছিলেন।

আর ধর্মক্ষেত্র ছিল কুরুক্ষেত্র। শতপথ ব্রাহ্মণে দেখি, কুরুক্ষেত্রে দেবতারা যজ্ঞ করতেন। জাবালোপনিষদে বৃহস্পতি যাজ্ঞবল্ক্যকে বলছেন:

অবিমুক্ত বৈ কুরুক্ষেত্রং দেবানাং দেবযজনং
সর্বেষাং ভূতানাং ব্রহ্মসদনম্।

কুরুক্ষেত্র দেবগণের যজনস্থান। ইহা অবিমুক্ত ক্ষেত্র এবং সকলের পক্ষে ব্রহ্মসদন। কুরুক্ষেত্র নাম কেন হল, তা আমরা মহাভারতে পাই।—

প্রকৃষ্টমেতং কুরুণা মহাত্মনা ততঃ কুরুক্ষেত্রমিতীহ পপ্রথে।

মহাত্মা কুরু এই স্থান বহু বৎসর কর্ষণ করেছিলেন। কুরু ছিলেন চন্দ্রবংশীয় রাজা সম্বরণের পুত্র, তপতী তাঁর মা। রাজা হয়ে ভূমি কর্ষণ কেন করতেন তা বোঝা যায় না। কর্ষণ শব্দের অর্থ এখন দুর্বোধ্য। কেউ মনে করেন, কুরু এই ক্ষেত্র আবিষ্কার করেছিলেন, কেউ বলেন যে তিনি এই স্থানের উৎকর্ষ সাধন করেছিলেন। যাই করে থাকুন, এখনও তাঁর নামেই এই স্থান পরিচিত আছে।

গীতার প্রথম শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণ কুরুক্ষেত্রকে ধর্মক্ষেত্র বলেছিলেন। কেন বলেছিলেন তা নিয়ে অনেকে আলোচনা করেছেন। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের সময় শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে গীতার উপদেশ দিয়েছিলেন। প্রায় সকলেই মনে করেন যে গীতার জন্মস্থান বলেই এই ক্ষেত্র ধর্মক্ষেত্র। আমার কাছে এই যুক্তি অসার মনে হয়েছে। শ্রীকৃষ্ণ বললেন,

ধর্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে সমবেতা যুযুৎসবঃ।

কুরুক্ষেত্র যদি ধর্মক্ষেত্র বলে পরিচিত না থাকত তাহলে শ্রীকৃষ্ণ হয়তো এ কথা বলতেন না।

অনেক দিন আমি এই কথার যুক্তি খুঁজেছিলুম। মহাভারতের শল্য পর্বের এক জায়গায় পেয়েছি যে ঋষিরা বলরামকে বলছেন যে দেবতারা কুরুক্ষেত্রে অনেক যজ্ঞ করেছিলেন। বনপর্বে আছে যে সরস্বতী ও দৃষদ্বতী নদীর মধ্যবর্তী কুরুক্ষেত্রে যারা বাস করে, তারা স্বর্গেই বাস করে থাকে।

মহাভারতের সকল কথা এখন মনে নেই। তবে কোথায় যেন

পড়েছি যে সোনার লাঙ্গল দিয়ে কুরু সাত ক্রোশ জমি কর্ষণ করেছিলেন। তিনি সেখানে কঠোর তপস্যা করেন এবং যত দিন পর্যন্ত ঐ ক্ষেত্রে মৃত মানুষেরা স্বর্গে না স্থান পায় তত দিন তিনি কর্ষণ করে যাবেন বলে স্থির করেন। ইন্দ্র তাঁর কাছে অনেকবার আসেন, এবং তাঁর এই পাগলামির জন্য পরিহাস করে ফিরে যান। শেষ পর্যন্ত তাঁকে হার স্বীকার করতেই হল। কিন্তু সকলকেই তো আর স্বর্গে ঢুকতে দেওয়া যায় না। দেবতারা বললেন, কোন একটা ত্যাগ চাই, সেই ত্যাগের জন্য মৃত্যু না হলে স্বর্গের অধিকারী হওয়া যায় না। কুরুর সঙ্গে ইন্দ্র পরামর্শ করে এই স্থির করলেন যে এই ক্ষেত্রে তপস্যা করে যে মরবে, আর মরবে যুদ্ধ করে, শুধু তারাই স্বর্গের অধিকারী হবে। তখন থেকেই এই কুরুক্ষেত্র ধর্মক্ষেত্রে পরিণত হল।

মামা কখন এসে বসবার ঘরে বসেছিলেন তা খেয়াল করি নি। চমক ভাঙল তাঁর কথা শুনে। জিজ্ঞাসা করলেন : গোপাল অমন গম্ভীর ভাবে কী ভাবছ ?

আমি কিছু বলবার আগেই স্বাতির উত্তর শুনলুম। সে বলল : গোপালদা যুদ্ধের কথা ভাবছেন।

এতক্ষণ আমি স্বাতিকেও দেখতে পাই নি। আশ্চর্য হয়ে তার দিকে তাকালুম।

মামা জিজ্ঞাসা করলেন : কোন্ যুদ্ধ ?

উত্তরে স্বাতি হেসে বলল : কুরুক্ষেত্র।

আমি বললুম : তামাশা নয়, সত্যিই আমি কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের কথা ভাবছিলুম। এত বড় একটা যুদ্ধ এখানে কেন হল বুঝতে পারি না।

তার মানে ?

বললুম : পাণ্ডবেরা ছিলেন ইন্দ্রপ্রস্থে, মানে দিল্লীতে, আর কৌরবেরা হস্তিনাপুরে। ইন্দ্রপ্রস্থের প্রতিষ্ঠার কথা মনে আছে তো ?

স্বাতি বলল : না।

পাণ্ডু যখন মারা যান, তখন যুধিষ্ঠিররা ছোট। অন্ধ জ্যাঠামশাই

ধৃতরাষ্ট্রের উপর রাজ্য রক্ষার ভার পড়ে। যুধিষ্ঠিররা পাঁচ ভাই দুর্যোধনদের একশো ভাইএর সঙ্গে এক সঙ্গে মানুষ হলেন। তাঁরা যখন বড় হলেন, তখন ধৃতরাষ্ট্র রাজ্য ভাগ করতে বাধ্য হলেন। কৌরবরা হস্তিনাপুরে রইলেন, আর পাণ্ডবরা গেলেন দক্ষিণে খাণ্ডব বনে। এইখানেই নূতন রাজধানী ইন্দ্রপ্রস্থের পত্তন হল।

বাধা দিয়ে স্বাতি বলল : এ গল্প আমাদের জানা।

বললুম : তবে পাশা খেলায় হেরে গিয়ে তের বৎসর বনবাস যাপনের পরে ফিরে এসে যুধিষ্ঠিররা যে আবার তাঁদের রাজ্য ফিরে পেতে চাইলেন, সে গল্পও তাহলে জানা।

স্বাতি বলল : জানা। কিন্তু পাশা খেলায় হেরে গিয়ে কেউ বনবাসে বায় ?

মামা বললেন : এ যুগ হলে জুয়াখেলার দায়ে জেলে যেতেন। সে যাক, তারপর কী হল তাই বল।

বললুম : দুর্যোধন বললেন, রাজ্য কেন, এক কণা জমিও আর দেব না। শ্রীকৃষ্ণ গিয়েছিলেন দুর্যোধনের দরবারে। বললেন, বেশি নয়, পাঁচ ভাই-এর জন্যে পাঁচখানি গ্রাম দাও।

দুর্যোধন শ্রীকৃষ্ণকে হাঁকিয়ে দিলেন। বললেন, বিনা যুদ্ধে নাহি দিব সূচ্যগ্র মেদিনী। কাজেই যুদ্ধ হবে। পাণ্ডবরা উত্তরে যাত্রা করলেন। কুরুক্ষেত্রের ময়দানে দুপক্ষের দেখা হল। সেইখানেই আঠারো দিন যুদ্ধ।

স্বাতি জিজ্ঞাসা করল : এতে ভাববার কী আছে ?

বললুম : সেই কথাই এবারে বলছি। ইন্দ্রপ্রস্থ তো আমরা খুঁজে পেয়েছি। দিল্লীর যেখানে এখন পুরনো কিলা, সেইখানেই ইন্দরপৎ—মানে ইন্দ্রপ্রস্থ। হস্তিনাপুরটা কোথায় ? কুরুক্ষেত্রের কাছেই কোথাও হওয়া উচিত।

মামা বললেন : ঠিক কথা। শুনেছি থানেশ্বরেই ছিল পুরনো হস্তিনাপুর। থানেশ্বর তো কুরুক্ষেত্রের গায়ে।

বললুম : থানেশ্বর নাম কোন পুরাণে পাই নি, তবে মহাভারতে

স্থাণুতীর্থের উল্লেখ আছে। সেখানে ছিলেন স্থাণ্বীশ্বর শিব। এই স্থান যে কুরুক্ষেত্রের নিকটে ছিল তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু একেই হস্তিনাপুর বলা যায় কি না আমি জানি না।

মামা বললেন : থানেশ্বরের একটা গৌরবময় অতীত ছিল।

তা ছিল। হিউএন চাঙের ভ্রমণ-কাহিনীতে আমরা সে কথা পেয়েছি। এক সময় কনৌজরাজ প্রভাকর বর্ধনের রাজধানী ছিল। গজনীর সুলতান মামুদ এই শহর আক্রমণ করে অনেক দেবদেবীর মূর্তি ধ্বংস করেন। দিল্লীর পৃথ্বীরাজ অবশ্য মামুদকে তাড়িয়েছিলেন, কিন্তু বেশি দিন রক্ষা করতে পারেন নি।

মামা বললেন : আমি কোন ইতিহাস পড়ে থানেশ্বরের কথা বলছি না। আমার এক বন্ধু দীর্ঘ দিন আগে কুরুক্ষেত্র দেখে এসে গল্প করেছিল। সেখানে নাকি এক প্রাচীন দুর্গের ধ্বংসাবশেষ এখনও আছে। দুর্গের বাহান্নটা চূড়া ছিল, কয়েকটা নাকি ভাঙা অবস্থায় এখনও আছে। সেখানে প্রবাদ প্রচলিত আছে যে দুর্গটি কুরুবংশের রাজা দিলীপ কর্তৃক নির্মিত। তখন কুরুবংশের বংশলতা মিলিয়ে দেখেছিলুম যে পাণ্ডবরা তাঁর নিচে পঞ্চম পুরুষ। সেই থেকেই আমার ধারণা হয়েছিল যে থানেশ্বরই কৌরবদের রাজধানী হস্তিনাপুর। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে সব কিছু ধ্বংস হবার পরে নতুন করে যখন হস্তিনাপুর গড়ে ওঠে, তখন হয়তো স্থাণ্বীশ্বর শিবের নামে শহরের নতুন নাম হয় স্থানেশ্বর বা থানেশ্বর।

বললুম : আপনার এই কথাটা মেনে নিলে আমার সমস্যা সরল হয়ে যায়। পাণ্ডবরা যখন কৌরবদের কাছে তাঁদের রাজ্য ফিরে পেলেন না, তখন সৈন্য-সামন্ত নিয়ে ইন্দ্রপ্রস্থ থেকে হস্তিনাপুরের দিকে অগ্রসর হলেন, এবং যুদ্ধটা হল কুরুক্ষেত্রে। পণ্ডিতদের মতো হস্তিনাপুরকে অন্যত্র কল্পনা করলে কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধ করতে যাবার কোন কৈফিয়ত পাই নে। ধর্মক্ষেত্রে গিয়ে যুদ্ধ করব, দু পক্ষ এই কথা স্থির করেছিলেন বলে আমাদের মেনে নেওয়া ছাড়া অন্য উপায় থাকে না।

মামা জিজ্ঞাসা করলেন : পণ্ডিতরা কী বলেন ?

বললুম : টড সাহেব তাঁর রাজস্থানের ইতিহাসে লিখেছেন যে হরিদ্বারের চল্লিশ মাইল দক্ষিণে হস্তিনাপুর অবস্থিত ছিল। রমেশচন্দ্র দত্ত বলেছেন যে এই শহর ছিল গঙ্গার ধারে দিল্লীর পঁয়ষট্টি মাইল উত্তর-পূর্বে। মাটির নিচে শহরের ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হয়েছে। জয়ন্তকৃষ্ণ দাত্রের হিসেব একটু অন্য রকম। তিনি বলেছেন দিল্লা থেকে সাতান্ন মাইল, আর মীরাট থেকে বাইশ মাইল, গঙ্গার বর্তমান ধারা থেকে সাত মাইল দূরে বুঝি গঙ্গার ধারে এই প্রাচীন নগরের ধ্বংসাবশেষ। রাজা দুষ্মন্ত ভরতের বংশে রাজা হস্তিন। তাঁরই নামে হস্তিনাপুর। যেমন রাজা কুরুর নামে কুরুক্ষেত্র ও কুরু জাঙ্গল রাজ্য।

স্বাতি জিজ্ঞাসা করল : মাটির নিচে হস্তিনাপুরের ঘরবাড়ি পাওয়া গেছে ?

বললুম : ঘরবাড়ি নয়, পাওয়া গেছে জিনিসপত্র। দশ বারো বছর আগে মাটি খুঁড়ে পাঁচটা স্তর পাওয়া গেছে। প্রথম স্তর বারো শো পূর্ব খ্রীষ্টাব্দেরও আগে। রাজা নিচক্ষুর আমলে যে নগর বন্যায় ডুবে গিয়েছিল, তারও প্রমাণ পাওয়া গেছে। তিনি কৌশাম্বীতে তাঁর রাজধানী স্থানান্তরিত করেন।

এ নিয়ে আরও কিছুক্ষণ হয়তো আলোচনা হত, কিন্তু তা হল না। ভিতর থেকে মামী ডাকলেন : তোমরা কি আজ খেয়েদেয়ে শোবে না ?

স্বাতি উঠে দাঁড়াল, বলল : দেখেছ, কত রাত হয়েছে !

মামা ব্যস্ত হলেন না। বললেন : রোজ তো আর গোপাল থাকে না।

মামী এবারে ঘরে এলেন। মামার কথা শুনে বললেন : গোপাল এখন পালিয়ে যাচ্ছে না।

আমরা উঠে গিয়ে খাবার টেবিলে বসলুম।

• •

খেতে বসে আমার বছর দেড়েক আগের কথা মনে পড়ল। সেবারেও এই পরিবারে আমি এমনি করে কয়েকটা দিন কাটিয়ে

গিয়েছিলুম। ফিরে যাবার সময় ভাবি নি যে আবার আমাদের এইখানেই দেখা হবে। আমি যে পথে পা বাড়িয়েছিলুম, সে বিচ্ছেদের পথ। কিন্তু কিসের টানে জানি না, সে পথে আমি এগোতে পারলুম না। বারে বারে আমাকে ফিরে আসতে হচ্ছে।

স্বাতিও যে এই কথাই ভাবছিল, তা তার কথা শুনেই বুঝতে পারলুম। সে বলল: গোপালদার কপালে রাজ্যসুখ নেই।

মামা বললেন: কেন?

সেবারে অনেক তোড়জোড় করে এলাহাবাদ গেলেন, কিন্তু—

বললুম: ভয়ে নামতে পারলুম না, এই তো?

মামা বললেন: তা ভয় পাবার মতোই কথা।

সে কালিন্দী পর্বের গল্প। এলাহাবাদের জ্ঞানশঙ্করবাবুর পোষ্যপুত্র হলে আমার রাজ্যসুখ হত। ভদ্রলোকের সন্তান বাঁচে না। এমন কি পোষ্যপুত্রও মারা গেছে। মামা এক অভিশাপের গল্প শুনিয়েছিলেন। মামী তাই আমার ভয়ের কথা ভাবছেন। কিন্তু আমি কেন সেই প্রলোভন ত্যাগ করেছিলুম, সে কথা কারও কাছেই স্পষ্ট নয়। শুধু এই কথাটি আমার কাছে স্পষ্ট হয়েছিল যে সেই লোভে আকৃষ্ট হলে স্বাতির কাছে আমি হেয় হয়ে যাব। ব্যক্তিগত যোগ্যতাকে স্বাতি শ্রদ্ধা করে। সে দ্রৌপদী হলে মহাভারতের গল্প অন্য রকম হত। অজ্ঞাতকুলশীল কর্ণকে নিশ্চয়ই প্রত্যাখ্যান করত না।

কেন আমি এলাহাবাদে নেমে জ্ঞানশঙ্করবাবুর কাছে আত্মসমর্পণ করি নি, সে কথা কেউই আমার কাছে জানতে চান নি। মামীর কথায় বুঝতে পারলুম যে কারণটা তাঁদের জানা। জীবনের মায়া আমার কাছে বড় হয়ে উঠেছিল বলে তাঁরা মনে করেছিলেন।

আমি অন্যমনস্ক হয়ে গিয়েছিলুম। মামার কথায় আবার জেগে উঠলুম। মামা জিজ্ঞাসা করলেন: তুমি কি চিরকাল তোমার কেরানীর চাকরিতেই সন্তুষ্ট থাকবে?

আর কী করতে পারি?

করবে কিছু ? যদি বল তো আমরাও কিছু চেষ্টা করে দেখি।

স্বাতি গম্ভীর ভাবে বলল : কেন, গোপালদার তো আজকাল খুব নাম, কত বড় লেখক হয়েছেন !

আমি এই পরিহাসের কথা বুঝি। কিন্তু মামা সরল ভাবে জিজ্ঞাসা করলেন : কী রকম ?

স্বাতি বলল : শোন নি সেদিন, মিত্রাদির এক বন্ধু বলছিল যে গোপালদার সঙ্গে আলাপ করতে চায়, বই পড়ে তার ভাল লেগেছে।

আমি একটা দীর্ঘশ্বাস চাপবার চেষ্টা করলুম। এ একটা বেদনার্ত সত্য। মানুষের বড় হবার চেষ্টা যত দিন গোপন থাকে, তত দিনই শান্তি। সে কথা প্রকাশ হয়ে গেলে সে উপহাসের পাত্র হয়। যত দিন না লক্ষ্যে পৌঁছান যায়, তত দিন এই যন্ত্রণা চলবে। ঠিক এই ভয়েই আমি আমার ব্যক্তিগত কথা গোপন করে যাচ্ছি। যে কাজের জন্য গত দু তিন বছর আমি কেরানীর চাকরিতে পড়ে আছি, তা কাউকে বলি নি। সে কাজ আমার সম্পূর্ণ হয়ে গেছে। গবেষণা শেষ করে আমি থীসিস দাখিল করে এসেছি। চাকরির জন্যেও আবেদন করেছি চারি দিকে।

সহসা আমার মায়ের কথা মনে পড়ল। তিনি বেঁচে থাকলে আমার বুকের যন্ত্রণা খানিকটা লাঘব হত। তাঁকে আমি চেঁচিয়ে বলতুম, মা, তোমার ছেলে আর কেরানীর কাজ করবে না, এবারে সে বড় হবার চেষ্টা করবে। কিন্তু মা তো নেই ! এ কথা আর কাউকে বলা যায় না। স্বাতিকেও না। তাকে যে আমি আজও পর্যন্ত চিনতে পারি নি। সেই আমাকে চিনতে দেয় নি। কথায় ও কাজে বারে বারে সে আমাকে বিভ্রান্ত করছে।

মামী বললেন : তাড়াতাড়ি খেয়ে নাও, গোপালের ঘুম পেয়েছে।

মামা বললেন : পাবেই তো, কাল সারা রাত নিশ্চয়ই জেগে এসেছে !

৬

পরদিন সকাল বেলাতেই চাওলা এসে উপস্থিত হল। বলল : আজ কোথাও যেও না দোস্ত, আমার সঙ্গে একবার বেরতে হবে।

কোথায় ?

তা জানি নে। সেই খবরটা সংগ্রহ করে তোমাকে নিতে আসব।

হেসে জিজ্ঞাসা করলুম : এখন কি শুধু এই কথাটাই বলতে এসেছ ?

চাওলা বলল : কতকটা তাই।

স্বাতি কখন এসে আমার পিছনে দাঁড়িয়েছিল দেখতে পাই নি। জিজ্ঞাসা করল : আজ আপনার ছুটি নাকি ?

ছুটি নিয়েছি।

আমি প্রশ্ন করলুম : কার কাছে ?

চাওলা বিস্মিত হবার ভান করে বলল : কেন, আমার তো একটিই মনিব।

স্বাতি বলল : আমি তো জানি, আপনি নিজেই আপনার মনিব।

এত দিন তাই ছিলুম। এখন যে গোলামি করছি, তা তো আপনার জানা।

এবারে আমি আশ্চর্য হলুম। বললুম : তুমি কি আজকাল চাকরি করছ নাকি !

চাকরি ! চাকরি আমাকে কে দেবে !

তবে ?

গম্ভীর ভাবে চাওলা বলল : তোমরা বিয়ে কর নি কি না, তাই বুঝতে এত দেরি হচ্ছে।

এতক্ষণে তার রহস্য বুঝতে পেরে আমরা দুজনেই হেসে ফেললুম।

চাওলা বলল : মিত্রাকে কলেজে পৌঁছনো আমার কাজ। সে তো চাকরি করছে। পৌঁছে না দিলে সে নিজেই গাড়ি নিয়ে যাবে। তাহলে আমার বিপদ। সারা দিন বাড়ি বসে থাকতে হবে।

বললুম ঃ যাদের গাড়ি নেই, তারা কি সারা দিন বাড়ি বসে থাকে ?

চাওলা বলল ঃ অভ্যেসটা খারাপ হয়ে গেছে। ভাড়াটে গাড়ি থেকে নামলে মনে হয় মানটা খাটো হয়ে গেল। বড় বিজনেসম্যান কি না!

বলে অট্টহাস্য করে উঠল।

চাওলা তরল পরিহাসে যা বলল, সে কথা মিথ্যা নয়। আমাদের মনোবৃত্তি আজ এই রকমই দাঁড়িয়েছে। বাহিরের আড়ম্বর দিয়েই যোগ্যতার বিচার করি। আমি তার হাসিতে যোগ দিতে পারলুম না।

স্বাতি বলল ঃ আসুন ভেতরে।

বলে বসবার ঘরে আমাদের ডেকে আনল।

মামা গম্ভীর মুখে পাইপ টানছিলেন। চাওলাকে দেখে বেশ খুশী হলেন। বললেন ঃ রিজার্ভেসন পাওয়া যাবে তো ?

চাওলা বলল ঃ সে আমার ভাবনা। আজ রাতে যাবেন, না কাল, সেই কথাটি আমাকে জানিয়ে দিন।

মামা আশ্চর্য হয়ে বললেন ঃ দিল্লীতে কি যাত্রীর ভিড় নেই ?

চাওলা বলল ঃ ভারতের সর্বত্রই বোধ হয় ভিড় সমান। তবে আমার একটু বিশেষ সুবিধা আছে।

কী রকম ?

এই তো সেদিন একজন মিলের মালিক আমেদাবাদে ফিরলেন। রিজার্ভেসনের জন্যে আমাকে বললেন, আমি ব্যবস্থা করে দিলুম। রাতে তাঁকে ট্রেনে তুলে দিতে এসে যা শুনলুম, তাতে চক্ষুস্থির।

প্রবল কৌতূহল নিয়ে আমরা তার মুখের দিকে তাকালুম।

চাওলা বলল ঃ ভদ্রলোক আমার হাত চেপে ধরে জিজ্ঞেস করলেন, রিজার্ভেসন কী করে পাওয়া গেল তাঁকে বলতেই হবে। আমার বিপদ এই যে সে কথা আমি কিছুতেই বলতে পারি না। একজনকে দশটা টাকা দিয়ে বলেছিলুম যে বার্থ একখানা আমার চাই, তা না হলে মান থাকে না। রাজধানীর এই গৌরবের কথা তো বাইরের

লোককে বলতে পারি না ; তাই বললুম, একটু জানাশোনা আছে বলেই সুবিধে পাই। ভদ্রলোক বললেন, আমি রেলের বড় কর্তাকে বলেছিলুম সাহায্য করতে ; তিনি অনেক চেষ্টা করে বললেন, খুবই দুঃখিত, একটিও বার্থ নেই এর। পরে আমি আপনাকে বলেছিলুম।

গল্পটা স্বাতির বোধহয় বিশ্বাস হয় নি। তার চোখের দিকে তাকিয়ে চাওলা বলল : আরও একটু বাকি আছে। ভদ্রলোক বললেন, বড় কর্তা আমার বাল্যবন্ধু, স্টেশন থেকে একটু আগে তাঁকে টেলিফোন করে এই সংবাদ দিয়েছি। কে ব্যবস্থা করে দিল, তার নাম জানতে চাইছেন ; বলছেন, এই দুর্নীতি দমন করতে হবে। সত্যি বলুন তো, কী করে আপনি এই বার্থ যোগাড় করলেন ?

স্বাতি জিজ্ঞাসা করল : আপনি সব বলে দিলেন তো ?

পাগল হয়েছেন ! আমি আমার নিজের সুখ সুবিধা দেখব, না পরের দুর্নীতি দমন করব !

স্বাতি বলল : এ আপনি অন্যায় করেছেন।

রাখুন আপনার ন্যায় অন্যায় ! দেশের হোমরাচোমরা সবাই যা করছে, দুটো গরিবে তা করলেই দোষ !

আমি জানি যে চাওলা এই কথা মনেপ্রাণে বিশ্বাস করে। ক্ষুধার তাড়নায় আত্মহত্যাকে চাওলা কাপুরুষতা মনে করে, অন্যের উদ্বৃত্ত থেকে কেড়ে খাওয়াকে সে অধর্ম বলে না। সে ঘৃণা করে ধনীর লোভকে। যার অভাব নেই, সে কেন দুর্নীতির আশ্রয় নেবে ! আর এ দেশের দুর্ভাগ্য যে সর্ব স্তরে দুর্নীতিকে সমান প্রশ্রয় দেওয়া হচ্ছে।

স্বাতি এ কথার প্রতিবাদ করতে পারল না।

মামা বললেন : আমাদের চারখানা বার্থের জন্যে বোধহয় চল্লিশ টাকা লাগবে।

চাওলা বলল : বলেছি তো, এ ভাবনা আপনার নয়। টিকিট কাটবার সময় গোপালবাবুকে সঙ্গে নিয়ে যাব।

বাধা দিয়ে স্বাতি বলল : গোপালদা কেন, টিকিট কাটতে আমি যাব।

হাসতে হাসতে মামা বললেন : এ সব ব্যাপারে আমার আর ভাবনা করতে হয় না। মেয়ে যে আমার স্বাবলম্বী হবার চেষ্টা করছে সে খবর তো পেয়েছ।

তাই নাকি।

মামা বললেন : সে কি, এ খবর তোমাকে কেউ এখনও দেয় নি! রাজধানীর এইটেই এখন সবচেয়ে বড় খবর।

মামার কথার ধরনে চাওলাও হেসে ফেলল।

মামা থামলেন না, বললেন : মেয়ে তার মাকে পরিষ্কার ভাবে জানিয়ে দিয়েছে যে আর চালাকি চলবে না, চাকরির জন্যে সে খানকতক দরখাস্ত করে দিয়েছে। পছন্দ মতো একটা কাজ পেলেই সে স্বাধীন ভাবে জীবন যাপন করবে। বুঝতেই পারছ, এই আমাদের বোধহয় শেষ বেড়ানো। যা কিছু শখ সাধ আছে, এই বেলা মিটিয়ে নিতে হবে।

চাওলা সবই জানত, বলল : খুবই ভাল আইডিয়া।

স্বাতি আমার দিকে তাকিয়ে একটা কৌতুকের হাসি হেসে বাড়ির ভিতরে চলে গেল। বলে গেল, আমরা আজ বেরতে পারব কি না মাকে জিজ্ঞাসা করে আসি।

স্বাতি বেরিয়ে যেতেই মামাকে আমি বললুম : আমাকে এবারে আর সঙ্গী হতে বলবেন না।

মামা সোজা হয়ে বসলেন, বললেন : তুমি কি সীরিয়সলি এ কথা বলছ?

বললুম : আমার ফিরে যাবার খুবই দরকার।

চাওলা বলে উঠল : বাজে কথা ব'লো না, তোমার ফেরার এখন কোন দরকার নেই।

এ আমার নিজের কথা নয়, স্বাতি কাল আমাকে এই পরামর্শ

দিয়েছে। কেন দিয়েছে, তা সেই জানে। বম্বেতে আমি একটা মনগড়া কারণ নির্ণয়ের চেষ্টা করেছিলুম। সেখানে জো রায় ছিলেন; কিন্তু এখানে কেউ নেই। এখানে কোন কারণ খুঁজে পাই নে। তাই আমি এখনও আমার কর্তব্য স্থির করে উঠতে পারি নি। বললুম ঃ আমার দরকারের কথা আমি সব চেয়ে বেশি জানি।

জানো না।

আমি কোন উত্তর দিলুম না দেখে চাওলা বলল ঃ তোমার দরকারের কথা তুমি যদি কিছুমাত্র জানতে, তাহলে তোমার জীবন আজ অন্য রকম হত।

আমি হেসে বললুম ঃ তুমিও দেখছি মেয়েদের মতো কথা বলছ!

স্বাতি এক সময় ঘরে ফিরে এসেছিল, বলল ঃ মেয়েদের কথা কি কথা নয়?

বললুম ঃ সে কথা মেয়েদের মুখেই ভাল লাগে।

চাওলা ব্যস্ত হয়েছিল, বলল ঃ তাহলে কী স্থির হল?

স্বাতি বলল ঃ দিন ভাল হলে মার অন্য আপত্তি নেই, দু ঘণ্টাতেই তৈরি হতে পারবেন।

মামা বললেন ঃ বিপদের কথা। পাঁজিখানা দেখি তো মা।

স্বাতি পঞ্জিকা নিয়ে এল। চশমাও আনল। মামা চশমা পরে পঞ্জিকা খুললেন। তারিখটা বার করে পড়লেন ঃ তিথি অষ্টমী, নক্ষত্র বিশাখা, বারবেলা অস্তাবধি কালরাত্রি ঘ ১১।৪২ গতে। যাত্রা—তিথ্যমৃতযোগ যাত্রা নাস্তি নক্ষত্র দোষ, দিবা ঘ ১০।১ গতে ত্র্যমৃতযোগ যাত্রা শুভ দক্ষিণে নাস্তি। সিমলা হল দিল্লীর—

স্বাতি বলল ঃ উত্তরে।

চাওলা কিছুই বুঝতে পারে নি। আমার মুখের দিকে তাকাল।

মামা বললেন ঃ আমরা তো সন্ধ্যা বেলায় যাত্রা করছি।

স্বাতি বলল ঃ তখন যাত্রা শুভ।

এবারে বুঝতে পেরে চাওলা লাফিয়ে উঠল। আমাকে বলল: তাহলে দোস্ত তৈরি হয়ে নাও। আমি এখুনি ঘুরে আসছি।

কোথায় যাচ্ছ?

আরে, সময় এখনও অনেক আছে, মিত্রাকে কলেজে পৌঁছে দিয়ে আসি। তারপর তোমার সঙ্গে বেরব।

বললুম: একটু আগে বললে না, আজ ছুটি নিয়ে এসেছ?

চাওলা বলল: তা এসেছি বটে, কিন্তু মিত্রাকে তাহলে কষ্ট পেতে হবে। পয়সা বাঁচাবার জন্যে ট্যাক্সি তো নেবে না, ফট-ফটিয়াতেও অন্য লোকের সঙ্গে চড়বে না।

তবে কি টাঙ্গায় যাবে?

উহুঁ, টাঙ্গার ভাড়াও এমন কিছু কম নয়।

স্বাতি বলল: মিত্রাদি নিশ্চয়ই বাসে যাবে।

চাওলা বলল: রাগ করে হেঁটেও যেতে পারে। আসি তাহলে। আপনারা দুজনেই রেডি থাকবেন।

বলে চাওলা বেরিয়ে পড়ল। আমরা দুজনে তাকে গাড়িতে তুলে দিতে গেলুম।

ফেরার পথে স্বাতি বলল: আমাদের সঙ্গে যেতে তোমার এত আপত্তি কেন?

আমার আপত্তি!

আমি বিস্মিত হলুম তার কথা শুনে।

স্বাতি বলল: আপত্তিই তো দেখতে পাচ্ছি। কাল রাতে বললে, আজও আবার বলছ।

স্বাতির এ কেমন খেলা আমি বুঝতে পারলুম না। বলতে পারলুম না যে আমি শুধু তাকেই সমর্থন করবার জন্যে এই আপত্তি জানিয়েছি।

স্বাতি জিজ্ঞাসা করল: তোমার সঙ্কোচ কিসের?

সঙ্কোচ !

একটি মুহূর্ত ইতস্তত করে বললুম : সঙ্কোচ আমার স্বাভাবিক। পকেটে পয়সা থাকলে আমি এই সঙ্কোচ করতুম না। ভ্রমণের বিলাস তো গরিবের জন্যে নয়।

স্বাতি বলল : আমিও তো নিজের পয়সায় যাচ্ছি না। তবু আমার সঙ্কোচ নেই কেন ?

বললুম : বিয়ের পরে এমনি করে বেরতে তোমারও সঙ্কোচ হবে, অবশ্য বর যদি গরিব হয়। দারিদ্র্য এই সঙ্কোচ আনে।

স্বাতি এ কথার প্রতিবাদ না করে বলল : বম্বে থেকেও তুমি জোর করে ফিরে গিয়েছিলে !

আমি ফিরে গিয়েছিলুম !

মনে নেই ?

মনে সবই আছে।

কেন এমন কর বলতে পার ?

অদ্ভুত অভিযোগ। বিস্ময়ের আমার সীমা রইল না। কী উত্তর দেব, তাও ভেবে পেলুম না।

স্বাতিও আমার উত্তরের অপেক্ষা করল না। ত্রস্ত পদে পালিয়ে গেল।

৭

পুরনো দিল্লীর বড় স্টেশন থেকে আমরা যাত্রা শুরু করলুম। কলকাতা থেকে কালকা মেল আসে। লোকে বলে দিল্লী মেল। সেই ট্রেনেই কিছু কামরা কেটে কিছু জুড়ে নতুন করে গড়তে ঘণ্টা দুয়েক সময় লাগে। যাত্রীরা রাতের খাওয়া সেরে গাড়িতে ওঠে। আমরাও বাড়িতে খেয়েদেয়ে এসেছিলুম। রামখেলাওন সঙ্গে ছিল। আর স্টেশনে পৌঁছে দিতে এসেছিল চাওলা ও মিত্রা। স্বাতির সঙ্গে তাদের ভাব দেখে আমি আশ্চর্য হচ্ছিলুম।

চাওলার সঙ্গে বেরিয়ে স্বাতি আজ নিজে টিকিট কেটেছে। আমাকে হস্তক্ষেপ করতে দেয় নি। বলেছিল ঃ বাবার কাছে কৃতিত্ব অনেক দেখিয়েছ, এবারে আমার ওপর ছেড়ে দাও।

বলে চার বার্থের একখানা কামরা রিজার্ভ করেছিল। চাওলারও সাহায্য দরকার হয় নি। জায়গা থাকতে পয়সা দেবার কথা ওঠে না।

আমি শুধু বলবার চেষ্টা করেছিলুম ঃ ও গাড়িতে আমাকে মানায় না। আমাকে নিজের মতো চলতে দাও।

তাহলে তো তোমার জন্যে কলকাতার টিকিট কাটতে হয়।

মিত্রার সঙ্গে এ ভদ্রলোককে খুব ভাল মানাত, কী বল স্বাতি?

চাওলা এই কথা কটি বাঙলায় বলবার চেষ্টা করেছিল। তার বলবার ধরন দেখেই স্বাতি হেসে উঠল। তারপরে বলল ঃ মিত্রাদি শুনলে আপনাকে মারবে।

খুশী হয়ে চাওলা বলল ঃ মিত্রা যদি বদলে থাকে তো তার জন্যে কার কৃতিত্ব বলুন তো?

সম্পূর্ণ আপনার।

চাওলা বলল ঃ তবে আপনার সঙ্গে আমার এই শর্ত রইল যে এই টুরেই গোপালবাবুর স্বভাবটা আপনি আগাগোড়া বদলে দেবেন।

স্বাতি হাসল।

চাওলা বলল : থুড়ি। আগাগোড়া নয়, যতটুকু আপনার দরকার, ততটুকুই বদলাবেন।

এবারে আমি হাসলুম।

মামা মামী গাড়িতে বসেছিলেন, আর আমি দাঁড়িয়েছিলুম প্ল্যাটফর্মে চাওলার কাছে। খানিকটা তফাতে স্বাতি মিত্রার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ভাবে কথা কইছিল।

চাওলা আমাকে আস্তে আস্তে বলল : বুঝলে দোস্ত, সিমলায় গিয়ে কামনাদেবীর মন্দিরে একটা মানত ক'রো। দিল্লীতে যেন লেগে যায়।

কী লেগে যাবার কথা বলছে, আমি তা বুঝতে পারি। আজ জোর করে সে আমাকে কয়েক জায়গায় নিয়ে গিয়েছিল। ট্রেনের টিকিট কাটবার পর স্বাতিকে বাড়ি পোঁছে দিয়েও সে আমাকে ছেড়ে দেয় নি। বলেছিল : তুমি স্নান করে খেয়ে নাও, আমি বাইরে বসে আছি।

স্বাতি বলেছিল : সে কি, আপনি আমাদের সঙ্গে খাবেন না ?

চাওলা বলেছিল : এত ঘনঘন তো খাওয়া যায় না, পেট বিদ্রোহ করবে।

স্বাতি আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞাসা করেছিল : আপনি এত সকালে খান ?

চাওলা বলল : উপায় কী! বাড়িতে তুটি মাত্র প্রাণী, খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপারে একটু মিল না থাকলে চলে কী করে! মিত্রা খেয়ে-দেয়ে কলেজে যায়, আমিও তার সঙ্গে খেয়ে নিই।

অতএব চাওলা বসবার ঘরে বসে রইল। মামী বোধহয় তার হাতে কিছু মিষ্টি দিয়েছিলেন। আমরা খেয়ে উঠবার পর বেশিক্ষণ আর সে বসল না। আমাকে টেনে নিয়ে বেরিয়ে পড়ল।

চাওলার সঙ্গে আমি তু তিনটে ফার্মের অফিসে গিয়েছিলুম। গল্প করেছিলুম কয়েকজন প্রবীণ লোকের সঙ্গে। নিতান্তই সাধারণ ধরনের গল্প। চাওলা এঁদের পরিচিত, কোন বাণিজ্যিক সম্বন্ধ আছে

কি না বুঝতে পারি নি। শুধু এইটুকু সন্দেহ করেছিলুম যে এঁদের সঙ্গে সে আমার পরিচয় করিয়ে দিল। এই পরিচয় হয়তো ভবিষ্যতে কাজে লাগতে পারে।

আমি কোন আপত্তি করি নি, আপত্তি করার আর আমার প্রয়োজন নেই। এখন আমি চাকরির উমেদার হয়েও লোকের সামনে দাঁড়াতে পারি। দরকার হলে হয়তো কোট পেণ্টালুনও পরতে পারি। এ কথা শুনলে চাওলা আশ্চর্য হত না, কিন্তু মামা হয়তো আকাশ থেকে পড়তেন। তাঁর ধারণা, আমি আমার খদ্দর কোন দিন ছাড়তে পারব না। সত্যিই তা কোন দিন ছাড়তে পারতুম না। যে মন নিয়ে খদ্দর ধরেছিলুম, সে মন আর এখন নেই। খদ্দরকে সেদিন যে সম্মানের চোখে দেখেছিলুম, সে চোখ আমার হারিয়ে গেছে। খদ্দর এখন একটা ছদ্মবেশ হয়ে দাঁড়িয়েছে। মুখোশ পরে ঘুরে বেড়াতে লজ্জা করে বলে এখন আমরা খদ্দর পরে ঘুরে বেড়াই। এ একটা লোক ঠকানোর ছদ্মবেশ হয়ে দাঁড়িয়েছে। যাঁরা এক দিন দেশকে ভালবেসে খদ্দর ধরেছিলেন, তাঁরা এখন লজ্জা পাচ্ছেন। সেই পুরনো দরদে এখনও খদ্দর পরছেন। এই বেশ ছেড়ে দেবার মতো কোন ছুতো পেলে হয়তো দুএকজন তাঁতের ধুতি ও গরদ-মটকার পাঞ্জাবি ধরবেন। যেমন মামা পরছেন। আমিও আর খদ্দর পরবার উৎসাহ পাচ্ছি না। ছেড়েও দিচ্ছি না। যদি কোন কলেজে একটা মাস্টারি পাই তো এই পোশাকই চালিয়ে যাব। আর তা না পেলে চাকরির উপযোগী পোশাক ধরব। গোঁড়ামি আমার ঘুচে গেছে, ভণ্ডামিতে লোভ নেই।

বাড়ি পৌঁছে দেবার পথে চাওলা আমাকে জিজ্ঞাসা করেছিল : দোস্ত, একটা কথা তোমাকে জিজ্ঞেস করা হয় নি।

বল।

চাওলা বলল : যাচ্ছ তো শীতের দেশে, সঙ্গে গরম জামা-কাপড় কিছু আছে তো?

বললুম : আছে।

গাড়ি চালাতে চালাতে চাওলা আমার মুখের দিকে তাকাল। একটু ভেবে বলল : তোমার সঙ্গে তো একটি মাত্র ঝোলা দেখেছি, ওর মধ্যে কত জিনিস আছে!

একখানা কম্বল দেখ নি?

দেখেছি।

স্টেশনে চাওলা আমাকে একটি ছোট প্যাকেট উপহার দিয়েছিল। বলেছিল : রাখো, তোমার কাজে লাগবে।

স্বাতি আমার হাত থেকে নিয়ে প্যাকেটটা খুলে একটা জওহরলালী জ্যাকেট বার করল। গরম পট্টুর জিনিস কিন্তু রঙ রেশমি কাপড়ের। সহসা স্বাতিকে খুব লজ্জিত দেখাল। কিন্তু বলল না যে এর প্রয়োজনের কথাটা তারও মনে আসা উচিত ছিল।

চাওলা বলল : কাশ্মীরে এখন দরকার হবে না, কিন্তু সিমলায় কিছু চাই।

নিজেকে সামলে নিয়ে স্বাতি বলল : কাশ্মীরে কি শীত নেই?

চাওলা বলল : শীতের সময় শীত, এখন গরম। গরম জামা-কাপড় নিয়ে গিয়ে লোকে কষ্ট পায়।

স্বাতি আর কিছু বলল না, খানিকটা তফাতে গিয়ে মিত্রার সঙ্গে গল্প শুরু করল। আমি রইলুম চাওলার সঙ্গে।

চাওলা বলল : কথাটা পছন্দ হল না বুঝি?

কোন্ কথা?

কামনাদেবীর মন্দিরে মানত করবার কথা?

বললুম : দিল্লীতে লাগার চেয়ে আর কোন বড় কথা কি নেই?

চাওলা হেসে বলল : সবই তো তারই জন্যে দোস্ত। মিত্রাও বোধহয় স্বাতিকে এই পরামর্শ দিচ্ছে।

ট্রেনের ঘণ্টা ঠিক এই সময় বাজল। পাঁচ মিনিট আগের ঘণ্টা। কিন্তু মামা বললেন : আর দেরি নয় গোপাল, এইবারে উঠে পড়।

আমি স্বাতির দিকে তাকালুম। মিত্রা এগিয়ে এসে স্বাতিকে তুলে দিল। আমিও এসে গাড়ির দরজার কাছে দাঁড়ালুম।

প্ল্যাটফর্মের উপর একটা ব্যস্ততা দেখা দিল। দু একজন যাত্রী যারা ধীরে সুস্থে আসছিল, তারা ছুটতে লাগল। রিফ্রেশমেণ্ট রুমের বেয়ারারা পয়সা ও বাসনপত্র সংগ্রহে তৎপর হয়ে উঠল। যাঁরা নিচে দাঁড়িয়ে ছিলেন, তাঁরা উঠে পড়তে লাগলেন। যাঁরা অনেকক্ষণ ধরে বই দেখছিলেন, তাঁরা টপ করে একটা তুলে নিয়ে দাম দিয়ে দিলেন। ফলওয়ালার সঙ্গে দরদস্তুর চট করে মিটে গেল। যাদের কেনবার তারা কিনে ফেলল, আর যারা শুধু দর জানবার জন্যেই দর করছিল তারাও সরে পড়ল। দু তিন মিনিটের মধ্যেই প্ল্যাটফর্মটা ফাঁকা হয়ে গেল। এই পাঁচ মিনিটের ঘণ্টার যে প্রয়োজন আছে, এর পরে তা স্বীকার না করে উপায় নেই। ট্রেনখানা এই প্ল্যাটফর্মে দু ঘণ্টারও উপর দাঁড়িয়ে ছিল। এই সমস্ত লোকও দু ঘণ্টা ধরে এইখানেই ছিল। কলকাতা থেকে ট্রেনের সঙ্গে ডাইনিং কার এসেছিল। তা কেটে গেছে। দিল্লীর যাত্রীরা বাড়ি থেকে খেয়ে এসেছে। তবু এখনও বেয়ারাদের কাজ ফুরোয় নি, বইওয়ালা ফলওয়ালা চা বিস্কুটওয়ালা পুরী-মিঠাই-ওয়ালা কারও কাজ ফুরোয় নি। শেষ ঘণ্টা পড়লেও যেন সব কাজ মিটবে না। চলতি গাড়ির সঙ্গে অনেকে ছুটবে। কারও পয়সা নিতে হবে, কারও জিনিস নামাতে হবে।

গাড়ি ছাড়বার আগে আমি চাওলার সঙ্গে সেকহ্যাণ্ড করলুম। আর মিত্রাকে নমস্কার করলুম দু হাত জুড়ে। অত্যন্ত প্রসন্ন মুখে তারা আমাদের বিদায় দিল। দরজার উপরে দাঁড়িয়ে আমি অনেকক্ষণ তাদের দেখলুম। তারপর দরজা বন্ধ করে বার্থের উপর এসে বসলুম।

আমি মামার পাশে বসেছিলুম, মামী ছিলেন সামনের বার্থে। আমার দিকে তাকিয়ে বললেন ঃ ছেলেটি বেশ।

হঠাৎ আমার চাওলার দেওয়া বইগুলোর কথা মনে পড়ল। স্বাতিকে জিজ্ঞাসা করলুম ঃ ওর দেওয়া বইগুলো আমাদের সঙ্গে আছে তো?

উত্তর মামা দিলেন, বললেন : এবারে আর তোমার কোন ভাবনা নেই।

কেন ?

জান না বুঝি ! পরীক্ষার পর থেকেই পড়াশুনো করে স্বাতি তৈরি হয়ে আছে। তোমার কাছে যে কোন সাহায্যের দরকার নেই, সে আমাদের অনেক আগেই জানিয়ে দিয়েছে।

তাই নাকি ! তাহলে এবারে প্রচুর আরাম করব। শুধু খাব আর ঘুমোব।

মামা হেসে উঠলেন, কিন্তু স্বাতি হাসল না। বলল : যদি শুধু খাবার আর ঘুমোবার ইচ্ছে, তাহলে বাড়িতে বসে থাকলেই হত।

বললুম : সেই জন্যেই তো আসতে চাই নি।

মামা তাঁর পাইপ ঝেড়েঝুড়ে নতুন করে আগুন ধরাচ্ছিলেন। বুঝতে পারছিলুম যে এবারে তিনি কোন বিশেষ প্রসঙ্গের অবতারণা করবেন। পাইপের আগুন শেষ না হওয়া পর্যন্ত আমাদের গল্প চলবে। আমার কথার উত্তরে স্বাতি কী বলবে ভেবে পাচ্ছিল না। শেষ পর্যন্ত মামাই জিজ্ঞাসা করলেন : প্রশ্নটা কাকে করব ?

তৎপর ভাবে আমি বললুম : স্বাতিকে।

স্বাতি কোন প্রতিবাদ করল না। নড়েচড়ে বেশ গুছিয়ে বসল। মামার প্রশ্নের অপেক্ষা করতে লাগল ভারিক্কী চালে।

মামা খানিকটা ধোঁয়া মুখে নিয়ে বললেন : গোপাল আমাদের কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের গল্প শোনালে, কিন্তু সে কত দিন আগের কথা সে সম্বন্ধে কিছু বললে না।

বললুল : এ কাজের ভারটা স্বাতি নিয়েছে জানলে সে গল্পও তাকেই বলতে বলতুম।

মামা স্বাতির মুখের দিকে তাকালেন।

খুব সপ্রতিভ ভাবে স্বাতি তার কাগজপত্র বার করে দেখল। একটা নোটবুকের পাতা উলটে বলল : কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের অনেকগুলো

তারিখ পাওয়া যায়। সেগুলির সবই খ্রীষ্টের জন্মের ৩১০১ থেকে ১১৯৩ বৎসর আগে। সাধারণ বিশ্বাসে আমরা প্রথম তারিখটাই মেনে নিয়েছি। কেননা সেই দিন থেকেই কলি যুগের আরম্ভ হয়েছে।

স্বাতির উত্তর শুনে মামা খুব খুশী হয়েছিলেন। কিন্তু আমি বললুম: এবারে প্রমাণ দাও।

স্বাতি বলল: অসম্ভব, প্রমাণ আমি দিতে পারব না। এ সব মেনে নেবার জিনিস, তর্ক করবার বিষয় নয়।

বললুম: প্রমাণ না দিলে কি এ যুগে কেউ কোন কথা মানে?

মামা এবারে আমার মুখের দিকে তাকালেন।

আমার অনেক দিন আগের কথা মনে পড়ল। দ্বারকা যাবার পথে একটা তৃতীয় শ্রেণীর কামরায় আমি দুজন যাত্রীর মহাভারতের কাল নিয়ে আলোচনা শুনেছিলুম। একজন বলেছিলেন যে শ্রীমদ্ভাগবত ও একাধিক পুরাণে আছে যে শ্রীকৃষ্ণের মৃত্যুর পর থেকেই কলি যুগের আরম্ভ। আর একজন একটি শ্লোক শুনিয়েছিলেন:

অথ ভাদ্রপদে মাসি কৃষ্ণাষ্টম্যাং কলৌ যুগে।
অষ্টাবিংশতিমে জাতঃ কৃষ্ণোঽসৌ দেবকীসুতঃ॥

এই শ্লোক ব্রহ্মপুরাণের। ভদ্রলোক পড়েছিলেন স্মার্ত রঘুনন্দনের তিথিতত্ত্বে। এই শ্লোক হিসাবে কৃষ্ণের জন্ম অষ্টাবিংশতিতম কলিযুগের কৃষ্ণাষ্টমী তিথিতে। এই শ্লোকের মানে করা সম্ভব হয় নি। শাস্ত্র বলে, লৌকিক চার যুগে এই দিব্যযুগ। এই হিসাবে সাতাশ দিব্যযুগের পর অষ্টাবিংশতিতম কলিযুগে আমাদের হিসাবে দ্বাপর হয় কি না ভেবে দেখা দরকার। তারপর নিমিত্তার্থে যদি কলৌ হয়ে থাকে তো তাহলে তার মানে হবে কলিপাপধ্বংসার্থং আবির্বভূত। কলিপাপ ধ্বংসের জন্য তাঁর আবির্ভাব হয়েছিল।

এ সব তর্কের কথা আমি স্বাতিকে বললুম না, বললুম সেই ভদ্রলোকের বিদেশী হিসাবের কথা: কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ হয়েছিল ১৪০০ পূর্ব-খ্রীষ্টাব্দে।

মামা আশ্চর্য হয়ে বললেন : বল কি হে, এত অল্প দিন আগের ঘটনা !

স্বাতি গম্ভীর ভাবে বলল : প্রমাণ ?

বললুম : বিদেশীরা যে ভারতবর্ষের ইতিহাস রচনা শুরু করেছিলেন, তা স্বীকার না করে উপায় নেই। ৩২৭ পূর্ব-খ্রীষ্টাব্দে আলেকজাণ্ডার ভারতে এসেছিলেন, এসেছিলেন মেগাস্থিনিস। বিদেশী ঐতিহাসিকেরা বললেন, চন্দ্রগুপ্ত মগধের সিংহাসনে বসেছিলেন ৩১৫ পূর্ব-খ্রীষ্টাব্দে। জর্মন পণ্ডিত ম্যাক্সমুলারের মতে এই ঘটনা হল দি শীট অ্যাঙ্কর অব ইণ্ডিয়ান ক্রনলজি।

ইতিহাসে নন্দ নামে অনেক মহারাজার উল্লেখ পাওয়া যায়। আমাদের কিন্তু একজনকে দরকার। তিনি বিষ্ণুপুরাণের নন্দ।

যাবৎ পরীক্ষিতো জন্ম যাবন্নন্দাভিষেচনম্।
এতদ্বর্ষসহস্রন্তু জ্ঞেয়ং পঞ্চদশোত্তরম্॥

স্বাতি বলল : সংস্কৃত ছেড়ে বাঙলায় বল, কষ্ট কম হবে।

বললুম : সংস্কৃত বাদ দিলে যুক্তি তত জোরালো হবে না।

মামা খুব মনোযোগ দিয়ে শুনছিলেন, বললেন : পরীক্ষিতের জন্ম থেকে—

বললুম : নন্দের অভিষেক পর্যন্ত মোট সময় হল এক হাজার পনের বছর। কিন্তু শ্রীমদ্ভাগবতে একটু তফাত লক্ষ্য করা যায়। শুকদেব পরীক্ষিৎকে বলছেন—

আরভ্য ভবতো জন্ম যাবন্নন্দাভিষেচনম্।
এতদ্বর্ষসহস্রন্তু শতং পঞ্চদশোত্তরম্॥

মানে, তোমার জন্ম থেকে নন্দের অভিষেকের সময় হবে এক হাজার একশো পনর বছর। শ্রীমদ্ভাগবত ও বিষ্ণুপুরাণ দুই-ই বললেন, এঁর বংশধররা একশো বছর পৃথিবী ভোগ করবেন।

গম্ভীর ভাবে মামা বললেন : হিসেবের একটু গোলমাল ঠেকছে না কি ?

বললুম : এ রকম গোলমাল দেখলে কোন উপসংহারে পৌঁছনো যাবে না।

তবে বল।

তাহলে হিসেব করুন। পরীক্ষিতের জন্ম থেকে খ্রীষ্টের জন্ম পর্যন্ত সময়ের পরিমাণ হল এক হাজার পনর যোগ এক শো যোগ তিন শো পনর। মোট চোদ্দ শো তিরিশ। পরীক্ষিতের জন্ম হয় কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের সময়। কাজেই কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের কাল হল ১৪৩০ পূর্ব-খ্রীষ্টাব্দ। আজ ১৯৫৮, অর্থাৎ কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ হয়েছিল তেত্রিশ শো অষ্টাশি বছর আগে।

মামা বললেন : সাবাস!

কিন্তু স্বাতি আপত্তি করল, বলল : এ জোর করে মেলানো হচ্ছে।

মামী তাঁর বিশ্বাসের কথা বললেন : আমি শুনেছিলাম, কলিযুগের পাঁচ হাজার বছর গত হয়েছে।

আমার মনে পড়ল, সেদিন গাড়িতেও এক ভদ্রলোক এই কথা বলেছিলেন। দ্বাপর যুগ ছিল বারো লক্ষ ছিয়ানব্বুই হাজার বছর। আর কলির কেটেছে মাত্র পাঁচ হাজার। এই অনুমানেরও তিনি প্রমাণ দিয়েছিলেন। বললুম : মহাকবি কালিদাসের জ্যোতির্বিদ্যা-ভরণে কিছু তথ্য পাওয়া যায়।

যুধিষ্ঠিরো বিক্রম-শালিবাহনৌ নরাধিনাথৌ বিজয়াভিনন্দনঃ।

ইমেহনু নাগার্জুন মেদিনী-বিভুর্বলিঃ ক্রমাৎ ষট্ শককারকা নৃপাঃ॥

মানে, যুধিষ্ঠির বিক্রমাদিত্য শালিবাহন বিজয়াভিনন্দন নাগার্জুন ও বলি, ভারতের এই ছজন রাজা শকাব্দ প্রবর্তন করেন। তারপরে দেখুন—

যুধিষ্ঠিরাব্দেদযুগাম্বরাগ্নয়ঃ ৩০৪৪ কলম্ববিশ্বে ১৩৫...

শালিবাহনের শকাব্দ আজ ১৮৮০। যোগ করে দেখুন, পাঁচ হাজার উনষাট বছর হচ্ছে।

মামা আমার দিকে তাকিয়ে তাঁর বিস্ময় প্রকাশ করলেন। বললেন : এত সব সন তারিখের হিসেব তুমি কোথায় পেলে?

সেদিন দ্বারকার ট্রেনে আমিও সেই ভদ্রলোককে এই কথাই জিজ্ঞাসা করেছিলুম। তিনি বলেছিলেন : সব তো মনে নেই। তবে দুর্গাদাসবাবুর পৃথিবীর ইতিহাসখানা পড়বেন। তাতে যা আছে, তাই হজম করা শক্ত।

এই পৃথিবীর ইতিহাসের আটখানা খণ্ড আমি দেখেছি। ফিরে এসে এ প্রসঙ্গটা পড়ে ফেলেছিলুম। আমার আরও একটি নিবন্ধের কথা কিছু মনে আছে। অনেক দিন আগে ভারতবর্ষ পত্রিকায় এক অধ্যাপক মহাশয় এই আলোচনা করেছিলেন। তিনি মহাভারতের উক্তি থেকেই প্রমাণ করেছিলেন যে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ হয়েছিল ১৯৪৬পূর্ব-খ্রীষ্টাব্দে। তাঁর যুক্তি আজ আমার মনে নেই।

বঙ্কিমচন্দ্র কিন্তু তাঁর কৃষ্ণচরিত্রে ১৪৩০ পূর্ব-খ্রীষ্টাব্দকেই কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের কাল বলে মেনে নিয়েছেন। নানা যুক্তি প্রমাণ দিয়ে বলেছিলেন যে এর পরে আর কেউ বোধহয় বলবেন না যে মহাভারতের যুদ্ধ দ্বাপরের শেষে পাঁচ হাজার বছর আগে হয়েছিল।

মামা আমার উত্তরের অপেক্ষা করছিলেন। বললুম : এ সব আমার কথা নয়। দুর্গাদাসবাবুর পৃথিবীর ইতিহাসে পড়েছি। প্রয়োজন মতো বিশ্বকোষেরও পাতা ওলটাই।

মামী বললেন : কুরুক্ষেত্রে কি তোমরা নামবে না ?

উত্তর মামা দিলেন, বললেন : কুরুক্ষেত্র পড়বে মাঝরাত্রে। ফেরার সময় ছাড়া আর কোন উপায় দেখছি না।

স্বাতি বলল : আর না হয় মোটরে করে ঘুরে আসা।

মামা পাইপে আর ধোঁয়া পাচ্ছিলেন না। খানিকক্ষণ ব্যর্থ চেষ্টা করবার পর বললেন : পানিপথটাও আমার দেখবার ইচ্ছা ছিল। এত বড় ধর্মক্ষেত্র কুরুক্ষেত্র কাছে থাকতে ইতিহাসের বড় যুদ্ধগুলো কেন পানিপথে হল, তাই জানবার ইচ্ছা।

বললুম : শুনেছি, পানিপথে নাকি একেবারে ফাঁকা ময়দান।

গাছপালাও নেই, ট্রেনে করে এই মাঠ পেরবার সময়েই যুদ্ধের কথা মনে হয়।

এই পানিপথে ভারতের তিনটি বিখ্যাত যুদ্ধ হয়েছিল। প্রথম যুদ্ধ হয়েছিল বাবরের সঙ্গে ইব্রাহিম লোদীর। পাঠান রাজা লোদীকে পরাজিত করে বাবর ভারতে মুঘল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন। ভারতবর্ষের এই যুদ্ধে তিনিই প্রথম কামান ও বন্দুক ব্যবহার করেন।

এইখানে দ্বিতীয় যুদ্ধ হয়েছিল বাবরের নাতি আকবরের সঙ্গে হিমুর। হুমায়ুনের পরে এই হিমু দিল্লী ও আগ্রা অধিকার করে বিক্রমাদিত্য নাম নিয়েছিলেন। আকবর তাঁকে পরাজিত করেন।

তৃতীয় যুদ্ধের গুরুত্ব আরও বেশি ছিল। মুঘল শক্তি তখন অত্যন্ত দুর্বল। মারাঠারা চেয়েছিল ভারতে সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করতে। কিন্তু নিজেদের চিরাচরিত যুদ্ধকৌশল ছেড়ে সম্মিলিত ভাবে আহমদ শাহ দুরানীকে আক্রমণ করে পরাজিত হল। পানিপথের এই তৃতীয় যুদ্ধ না হলে ইংরাজ এমন সহজে ভারতবর্ষ পেত কিনা সন্দেহ।

মামা তাঁর পাইপের ছাই ঝেড়ে ফেলেছিলেন। আমি জানি, এইবারে তাঁর ঘুম পাবে। কিন্তু তার আগেই মামী বললেন: তোমরা আর কত রাত গল্প করবে?

আমি উঠে দাঁড়ালুম। বললুম: বিছানা বিছিয়ে নিচ্ছি।

রামখেলাওনকে দিয়েই মামী হোল্ডল থেকে সবকিছু বার করে রেখেছিলেন। শুধু বিছিয়ে নেওয়া। স্বাতি আর আমি উপরে উঠব, মামা ও মামী শোবেন নিচে। চাদরের এক কোণা স্বাতি ধরল, আমি ধরলুম আর এক কোণা। বিছানা পেতে নিতে আমাদের একটুও সময় লাগল না।

সারা রাত্রি ঘুমিয়ে আমরা ভোর বেলায় কালকা স্টেশনে এসে নামলুম। বড় লাইনের শেষ স্টেশন। বাঙলা দেশ থেকে দূরত্বও কম নয়, কিন্তু এত দূর আসবার জন্য কারও কোন হাঙ্গামা করতে হয় না। একদিন সন্ধ্যা বেলায় হাওড়া স্টেশনে এসে কালকা মেলে উঠতে হয়। বাড়িতে খেয়ে না এলে গাড়িতে ডাইনিং কার আছে। রাত্রে ঘুম। সকালে মোগলসরাই, এলাহাবাদ। দুপুরে কানপুর, বিকেলে টুণ্ডলা, রাতে দিল্লী। তারপর নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে ভোর বেলায় কালকা।

এবারে খেলনা লাইনের গাড়িতে উঠতে হবে। ন্যারো গেজ। প্রথমে রেল কার ছাড়বে, তারপর দু তিনখানা ট্রেন পর পর। রেল কারে মাল যাবে না। ভাড়াও বেশি। কিন্তু গাড়ি:দেখে মামা ঐ গাড়িতেই উঠলেন। বিছানা বাক্স ট্রেনে যাবার জন্যে বুক করে রসিদ নিতে হল। রিফ্রেশমেণ্ট রুমের বেয়ারা চা দিয়ে গেল। রেল কার ছাড়বার আগে আমরা চা খেয়ে নিলুম।

রেল কার ট্রামের মতো একখানা গাড়ি। ধোঁয়া ধুলো কয়লা নেই। লোহার রেলের উপর দিয়ে গড় গড় করে গড়িয়ে চলে। ড্রাইভার সামনে বসে মোটর চালানোর মতো করে চালায়। চোখের সামনে কালকা সিমলা লাইনের মানচিত্র আঁকা। আমরা পিছনে বসে সব দেখতে পাচ্ছি। এই রকম গাড়ি আমরা কাজিপেট ওরঙ্গল লাইনে দেখেছিলুম। আর কোথায় দেখেছি মনে পড়ল না।

কালকা পাহাড়ের নিচে, আর সিমলা পাহাড়ের উপরে। এই ষাট মাইল পথ ঘুরে ঘুরে উপরে উঠেছে। সমুদ্র-সমতল থেকে সিমলা সাত হাজার ফুট উপরে অবস্থিত। শুনলুম, রেল লাইনের মতো পাকা সড়কও আছে। মাঝে মাঝে দেখা যায়, হারিয়ে যায় মাঝে মাঝে। সেই পথে মোটর যাচ্ছে, লরি যাচ্ছে, বাসও যাচ্ছে। ট্রেনের

চেয়ে এতে দু ঘণ্টা সময় কম লাগে, পাঁচ ঘণ্টার বদলে তিন ঘণ্টা। রেল কারে চার ঘণ্টা।

মামী যে বিমর্ষ ভাবে বসেছিলেন, তা বুঝলুম মামার প্রশ্ন শুনে। মামা জিজ্ঞাসা করলেন : কোন অসুবিধে হচ্ছে নাকি ?

মামী বললেন : না।

তবে অমন মুখ ভার কেন ?

মামী কোন উত্তর দিলেন না।

স্বাতি বলল : সত্যিই মার মুখখানা আজ থমথম করছে।

এইবারে মামী ফোঁস করে উঠলেন, বললেন : তোমাদের মতলব আমি বুঝতে পেরেছি।

মামা আশ্চর্য হয়ে বললেন : কী রকম ?

মামী বললেন : তীর্থদর্শন তোমাদের উদ্দেশ্য নয়, পাহাড়ে কিছু-দিন নাচানাচি করবে।

স্বাতি হেসে উঠল।

কিন্তু মামা বললেন : কেন, কুরুক্ষেত্রে আমরা বুঝি নামব না!

মামী বললেন : কুরুক্ষেত্র দর্শনে তো তোমরা বের হও নি, কেন নামবে সেখানে!

এ মামীর অভিমানের কথা। বললুম : ফেরার পথে যে আমাদের নামা স্থির হয়েছে।

স্বাতি বলল : তার জন্যে দুঃখ করছ কেন। আমি তোমাকে কুরুক্ষেত্রের বর্ণনা দিচ্ছি।

মামী বললেন : তবে আর কী! বর্ণনা শুনেই যদি তীর্থদর্শনের পুণ্য হয় তো ঘরের বাইরে বেরবার কী দরকার!

মামা বললেন : তা সত্যি।

আমি বললুম : রাতের ট্রেনে না চেপে দিনের ট্রেনে বেরলে ভাল হত। যাত্রাটাও শুভ হত তাহলে।

মামী কথা কইলেন না। কিন্তু স্বাতি বলল : পুকুরে স্নান করে

কি আর পুণ্য হয়! কোন পীঠস্থান হলেও কথা ছিল। যেমন জ্বালামুখী।

মামা স্বাতির দিকে ফিরে তাকালেন।

স্বাতি বলল: গোটা চারেক তো পুকুর আছে। তার মধ্যে কুরুক্ষেত্রেরটিই সব চেয়ে বড়। লম্বায় সাড়ে চার হাজার ফুট, আর চওড়ায় প্রায় অর্ধেক। বাঁধানো ঘাটের ছবি দেখ নি গোপালদা?

বললুম: দেখেছি।

কিন্তু তাতে পদ্মফুল নিশ্চয়ই দেখ নি। শুনেছি সেখানে ভোর বেলায় হাজার হাজার পদ্মফুল ফুটে যাত্রীদের মুগ্ধ করে।

মামা বললেন: সত্যি নাকি!

উৎসাহ পেয়ে স্বাতি বলল: আর দুটো পুকুরের নাম মনে নেই, তবে বাণগঙ্গা মাইল তিনেক দূরে। মহাভারতে ভীষ্মের মৃত্যুর কথা মনে আছে তো? পিতামহের তৃষ্ণা পেয়েছিল, অর্জুন মাটিতে একটা বাণ মেরে জল বার করলেন। সেইটেই বাণগঙ্গা। তবে এই সব পুকুরে স্নান করতে হয় সূর্যগ্রহণের সময়। সেই সময় স্নান করলে নাকি এক হাজার অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল পাওয়া যায়। কাজেই বুঝতে পারছ, সে সময় কুরুক্ষেত্র যায় কার সাধ্য। যত যাত্রী, তত বড় মেলা।

মামী জিজ্ঞাসা করলেন: কুরুক্ষেত্রে কোন মন্দির নেই?

স্বাতি বলল: তাহলে আমার বই বার করতে হল।

বলে পায়ের কাছ থেকে একটা ব্যাগ তুলে নিয়ে একখানা গাইড বই বার করে নিল। ব্যাগটা নামিয়ে রেখে খুলল বইএর পাতা। জায়গাটা খুঁজে পেয়ে বলল: ও বাবা, এ যে কয়েক গণ্ডা মন্দির দেখছি। লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির শরবননাথ মন্দির কালীকমলিওয়ালা মন্দির দুর্গা মন্দির কমলনাথ জ্যোতিসর সীতা মাইএর মন্দির। সীতা যেখানে পাতালপ্রবেশ করেছেন, সেইখানে এই মন্দির।

স্বাতি থামতেই মামা জিজ্ঞাসা করলেন: তারপর?

তারপর গীতাভবন চন্দ্রকূপ।

আর কিছু ?

মামার প্রশ্ন করার ধরন দেখে আমার হাসি পাচ্ছিল।

স্বাতি বলল: একটা সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয়ও আছে দেখছি।

গম্ভীর ভাবে মামা বললেন: তবে তো আমাদের কুরুক্ষেত্রে যেতেই হবে। তা না হলে ঘরেই কুরুক্ষেত্র বাধবে।

স্বাতি হেসে উঠেছিল। মামী আরও গম্ভীর হয়ে গেলেন।

রেল কারে এই ভ্রমণটি আমার ভাল লাগছিল। ভাল লাগছিল শুধু আরামের জন্য নয়, এই সুন্দর পরিবেশে আমার আরও একটি কথা মনে এসেছিল। এবারের ভ্রমণে আমি গাইড নই, সংবাদ আহরণের জন্য আমাকে পরিশ্রম করতে হবে না। এবারে স্বাতি আমার কাজ করবে, আর আমি এই ভ্রমণের আনন্দ অবলীলায় উপভোগ করব।

পাহাড়ে ওঠার আনন্দ আমার নূতন নয়। গত বছর আবু পাহাড়ে উঠেছি, আর মসুরি পাহাড়ে উঠেছি দিন কয়েক আগে। নূতন যা, তা এই রেল কার। পেট্রলের গন্ধে অনেকের বমির ভাব আসে, অনেকের আবার গন্ধটা ভাল লাগে। পাহাড়ের পাকদণ্ডীতে অনেকের মাথা ঘোরে, বমি করে অনেকে, কিন্তু রেল কারে এ সব ভাবনা নেই। পেট্রলের গন্ধ নেই, লোহার রেলের উপর ঘুরপাকও যেন কম। বেশ নিশ্চিন্ত মনে আমি পাহাড়ের সৌন্দর্য উপভোগে মন দিলুম।

মামা হঠাৎ প্রশ্ন করে বসলেন: চণ্ডীগড়ের কথা কিছু জান ?

আমি দেখলুম, মামা আমাকেই এই প্রশ্ন করলেন। বললুম: না।

মামা বিশ্বাস করলেন না, কিন্তু স্বাতি আমার উত্তর শুনে খুশী হল। বলল: তুমি আমাকে জিজ্ঞেস কর।

বলে চণ্ডীগড়ের পাতাটা খুলে ফেলল।

চণ্ডীগড়ের প্রতিষ্ঠার ইতিহাস আমি জানি। ১৯৪৭ সনে দেশ যখন স্বাধীন হল, তখন বাঙলা দেশের মতো পাঞ্জাবও বিভক্ত হয়েছিল

দুই ভাগে। পূর্ব বঙ্গ থেকে যে উদ্বাস্তুরা পশ্চিম বঙ্গে এল, তারা কোন নূতন শহর প্রতিষ্ঠা করল না। বরং কলকাতায় এসে কলকাতার সমস্যাকেই বাড়িয়ে তুলল। আজও সেই সব সমস্যার সমাধান করা সম্ভব হয় নি। পাঞ্জাবের বেলায় ঘটনা অন্য রকম হল। তাদের পুরনো রাজধানী লাহোর গেল হাতছাড়া হয়ে। কয়েক মাইল পূর্বে অমৃতসর বড় শহর। ইচ্ছা করলেই তারা সেইখানে এসে নূতন রাজধানী প্রতিষ্ঠা করতে পারত। কিন্তু তারা সেই জনাকীর্ণ শহর পছন্দ করল না। ১৯৪৮ সনের গোড়ার দিকেই তারা স্থির করল যে চণ্ডীগড়েই তারা নূতন রাজধানী প্রতিষ্ঠা করবে।

এই সিদ্ধান্তের মূলে কী প্রেরণা ছিল জানি না। কিন্তু রাজধানী স্থাপনের জন্যে স্থানটি যে মনোরম তাতে সন্দেহ নেই। হিমালয়ের সঙ্গে সমান্তরাল হল শিবালিক পর্বত। সেই পর্বতের পাদদেশে চণ্ডীগড়। এক ধারে একটি সুন্দর হ্রদ। দিল্লী-আম্বালা প্রধান সড়ক থেকে মাত্র চার মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত। সমগ্র পাঞ্জাবের সঙ্গে সড়কে ও রেলপথে যোগাযোগ আছে। রাজধানী যখন নূতন করেই গড়তে হবে, তখন এই রকম স্থানই নির্বাচন করা উচিত।

স্বাতি তার গাইড বইএর পাতায় খানিকটা চোখ বুলিয়ে নিয়ে বলল: ভারতবর্ষের অন্যান্য শহরের মতো চণ্ডীগড় গোঁজামিল দিয়ে তৈরি নয়।

মামা জিজ্ঞাসা করলেন: মানে?

স্বাতি বলল: দিল্লী দেখ। রাজধানীর প্রয়োজনে নতুন দিল্লী গড়তে হল। কলকাতা শহরে জোড়াতালি দিয়ে কাজ চালাতে হচ্ছে।

মামা বললেন: বুঝেছি। একটা ফাঁকা ময়দানের ভেতর চণ্ডীগড় শহরের পত্তন হয়েছে।

স্বাতি বলল: এর জন্যে বিখ্যাত ফরাসী স্থপতি লা করবুসিয়েরকে ডাকা হয়েছিল। তিনি একা আসেন নি, সঙ্গে এনেছিলেন তাঁর এক আত্মীয় ভাই পিয়েরি জিনার্ট, আর ইংরেজ দম্পতি ম্যাক্সওয়েল ফ্রাই

ও জেইন ড্রুকে। এঁদের সঙ্গে কয়েকজন ভারতীয় স্থপতিও কাজ করেছিলেন।

গম্ভীর ভাবে আমি বললুম: ইতিহাসে আমাদের রুচি নেই। চণ্ডীগড়ে দেখবার মতো যদি কিছু থাকে, তাই বল।

স্বাতি আমার কৌতুক বোধহয় বুঝতে পারল, বলল: দেখবার জিনিস গিয়েই দেখতে হয়। পরের মুখে ঝাল খাওয়া যায় না।

দেখবার কিছু আছে কি না, সে সম্বন্ধে একটা ধারণা তো হয়।

একটা প্রদেশের রাজধানীতে গেলে কী দেখবে আশা কর?

বললুম: প্রথমেই হাইকোর্ট দেখব।

পরম কৌতুকে স্বাতি বলল: ঐটে দেখেই ফিরে এস।

মামা হাসছিলেন। এবারে জিজ্ঞাসা করলেন: তোমার বইএ বুঝি কিছু লেখা নেই?

স্বাতি বলল: থাকবে না কেন, সেক্রেটারিয়েট বিল্ডিং থেকে আরম্ভ করে চাপরাশিদের কোয়ার্টার পর্যন্ত দেখবার মতো। এমন আধুনিক স্থাপত্যকর্ম ভারতবর্ষের আর কোথাও নেই। বাড়িতে রোদের তাপ লাগবে না, অথচ আলো হাওয়া অবারিত থাকবে, এই ব্যবস্থাটাই সর্বত্র অনুকরণের মতো।

কী রকম?

সে আমি বোঝাতে পারব না।

তাড়াতাড়ি করে কয়েকটা লাইন পড়ে নিয়ে বলল: দশ বর্গমাইল জুড়ে শহর, আর তিরিশটা কলোনি। নিজেদের প্রয়োজনের জন্যে কোন লোককে বাইরে যাবার প্রয়োজন নেই। তবে শহর দেখবার সময় হল বসন্ত কাল। তখন ক্যাসিয়া ফুলে সমস্ত শহর আলো হয়ে থাকে। তারপরেও ফোটে গোলমোহর ও অন্যান্য ফুল।

আমি জিজ্ঞাসা করলুম: শহরের নাম চণ্ডীগড় কেন হল, সে কথা নেই?

স্বাতি নির্বিকার ভাবে বলল: চণ্ডীদেবীর পীঠস্থান।

মামী এতক্ষণ চোখ বুজে ছিলেন। পীঠস্থানের নামেই জেগে উঠে বললেন : এ আবার কোন্ পীঠ ?

আমি বললুম : দ্রষ্টব্য স্থানের মধ্যে তো কোন মন্দিরের নাম বল নি ?

স্বাতি এবারে বিপদে পড়ল। পাতা উলটে সমস্ত বিবরণটা ভাল করে পড়ল। তারপর আরও কাগজপত্র বার করে দেখল। কিন্তু কোথাও কিছু না দেখে আমার মুখের দিকে তাকাল করুণ ভাবে।

মামা বললেন : গোপাল কী বল ?

বললুম : আমি আর কী বলব বলুন।

যা জান, তাই বলবে।

ঠিক এই মুহূর্তে আমার মনে হল যে এই বলার কাজটি না করতে পারলে আমাকে সঙ্গে আনবার কোন সার্থকতা নেই। দক্ষিণ-ভারত ভ্রমণের সময় তাঁদের সঙ্গে ভৃত্য ছিল না, আমি সেই অভাব পূর্ণ করেছি। তারপর রাজস্থান ও সৌরাষ্ট্রে আমি গাইডের কাজ করেছি নিষ্ঠার সঙ্গে। এবারে যদি কিছু না করি তাহলে আমার জন্য এই অর্থব্যয় তাঁদের কাছে অপব্যয় বলে মনে হবে। আমি তো রানা ব্যানার্জী নই, জো রায়ও নই যে আমার কাছে তাঁদের অন্য কোন প্রত্যাশা আছে। আমি সাবধান হয়ে গেলুম। বললুম : পীঠস্থানের নাম নিয়ে নানা মতান্তর আছে। কিন্তু চণ্ডীগড়ের নাম কোন তালিকাতেই নেই।

স্বাতি বলল : তবে চণ্ডীদেবীর পীঠস্থান কেন বলেছে ?

বললুম : হয়তো চণ্ডীদেবীর কোন অখ্যাত মন্দির আছে। অখ্যাত এই জন্যে বলছি যে চণ্ডীগড়ের যে মানচিত্র তোমার কাছে দেখেছিলুম, তাতে এই মন্দিরের উল্লেখ নেই। পূর্ব পশ্চিম উত্তর ও দক্ষিণ মার্গে ঘেরা রাজধানীর সমস্ত দ্রষ্টব্য স্থানেরই উল্লেখ আছে। এমন কি লোকপথ বিদ্যাপথ সরোবরপথ প্রভৃতি অনেক পথের সঙ্গে চণ্ডীপথও দেখানো আছে।

মামী জিজ্ঞাসা করলেন : এ রাজ্যে পীঠস্থান কোথায় ?

বললুম : যতদূর মনে আছে, এ অঞ্চলে পীঠস্থান তিনটি। কুরুক্ষেত্র জলন্ধর ও জ্বালামুখী। কাশ্মীরেও একটি পীঠস্থান আছে, কণ্ঠপীঠ। কিন্তু সে কোন্ জায়গায় তা জানি নে।

স্বাতি বলল : গোপালদাকে আমি একটা নতুন জায়গার কথা শোনাতে পারি।

বললুম : শোনাও।

পিঞ্জোরের নাম শুনেছ ?

শুনেছি।

কখনও শোন নি।

বললুম : পাখির খাঁচাকে পিঞ্জর বলে।

স্বাতি খিলখিল করে হেসে উঠল।

গাড়ির অন্যান্য আরোহীর দিকে এতক্ষণ আমাদের দৃষ্টি ছিল না। এবারে দেখলুম, একজন মাঝবয়সী ভদ্রলোক খানিকটা তফাত থেকে আমাদের লক্ষ্য করছেন। স্বাতিকে আমি জিজ্ঞাসা করলুম : হাসলে যে ?

স্বাতি আমার দিকে চেয়ে বলল : গোপালদাকে আজ খুব জব্দ করেছি।

তারপর আমাকে বলল : পিঞ্জর নয়, পিঞ্জোর। পঙ্কপুর। মহাভারতে পড় নি, পঞ্চপাণ্ডব বনবাসে বেরিয়ে এই পঙ্কপুরে কাটিয়েছিলেন বার বছর। এমন প্রাচীন বাগান ভারতবর্ষে আর নেই।

মামা বললেন : সত্যি নাকি !

স্বাতি বেশ গর্বিত ভাবে উত্তর দিল : কালকার তিন মাইল দক্ষিণে চমৎকার পিকনিকের জায়গা। ছুটির দিনে চণ্ডীগড় থেকে বাস আসে। মাত্র তের মাইল পথ, বহু লোক পিকনিক করতে আসে। ভাল কাফেটেরিয়া আছে, ডাকবাংলোও আছে।

মামা আশ্চর্য হয়ে বললেন : মহাভারতের যুগের বাগান এখনও আছে ?

স্বাতি বলল : সে বাগানের অনেক পরিবর্তন হয়েছে। পাণ্ডবদের ছত্রিশ বছরের রাজত্বকালে প্রায়ই তাঁরা এখানে আসতেন। শেষবার এসেছিলেন মহাপ্রস্থানে যাবার আগে। তারপর বনজঙ্গলে ঢেকে যায়। একাদশ শতাব্দীতে আল বেরুনি এর উল্লেখ করেন, আর তৈমুরলঙ্গ এই বাগান ধ্বংস করে যান।

তারপর ?

তারপর ঔরঙ্গজেবের আমলে পাঞ্জাবের শাসনকর্তা ফদয় খান মোগল কায়দায় এর আমূল সংস্কার করেন।

বলে স্বাতি হাসতে লাগল।

বললুম : হাসছ যে ?

স্বাতি বলল : একটা ভারি মজার গল্প মনে পড়ে গেল। এ অঞ্চলের পাহাড়ী রাজারা চাইছিল না যে মোগলরা এখানে বসবাস করে। তাই তারা এক ফন্দি করে সবাইকে তাড়িয়েছিল। রাজারা বেছে বেছে কয়েকজন পাহাড়ী স্ত্রীলোককে ফল বেচতে হারেমে পাঠিয়েছিল। তাদের সবার গলায় বড় বড় গলগণ্ড। বেগমরা ভয়ে ভয়ে বললেন, এ আবার কী! ফলওয়ালীরা বলল, এ দিকের জলহাওয়ায় এমনি হয়। বেগমরা ভাবলেন, সর্বনাশ! তারপর খান সাহেবকে টেনে নিয়ে তাঁরা পালিয়ে বাঁচলেন।

স্বাতির গল্প শুনে মামাও হাসলেন।

স্বাতি বলল : নতুন করে এই বাগান উদ্ধার করেছেন পাতিয়ালার রাজা।

আমি বললুম : শুনেছি, এ রকম বাগান কাশ্মীরে অনেক আছে।

ছোট ছোট স্টেশনে রেল কার বেশিক্ষণ দাঁড়াচ্ছে না। একটু থেমেই আবার চলছে। এই গাড়ির পিছনে ট্রেন আছে, কয়েকখানা ট্রেন। বিকেলের আগেই এই সব ট্রেন সিমলায় পৌঁছবে। সকলের আগে পৌঁছব আমরা।

ছোট ছোট অনেকগুলো স্টেশন পেরিয়ে এসে আমরা একটা ছোট স্টেশনেই নেমে পড়লুম। রেল লাইনের ধারেই একটা কাঠের বাংলোয় রিফ্রেশমেণ্ট রূম। যাত্রীরা এখানে ব্রেকফাস্ট খান। কালকায় আমরা ছোট হাজরি খেয়েছি। এখানে ব্রেকফাস্ট খাবার জন্যে অন্যান্য যাত্রীদের সঙ্গে সিঁড়ি বেয়ে আমরা উপরে উঠে গেলুম।

আমরা ঘরের ভিতরে বসলুম না, বসলুম বারান্দায়। খোলা-মেলায় পাহাড়ে পরিবেশের আনন্দটুকু উপভোগ করা যায়।

স্বাতি বলল : পাতার গাছ কেমন ঝুলছে দেখেছ ?

হ্যাঙ্গিং পট নয়, বাস্কেটও নয়। চারকোণা কাঠের আধারে ঝোলানো গাছ। ফাঁক ফাঁক কাঠের টুকরোর ভিতর দিয়ে মাটি গলে বেরিয়ে যায় নি, কাঁকরে ও শিকড়ে শক্ত হয়ে আছে। অর্কিড নয়, বিগোনিয়া নয়, কয়েক জাতের ফার্ন। অন্য জিনিসও হতে পারে, তার নাম আমার জানা নেই।

মামা বললেন : এ সব জিনিসের একটা পরিবেশের দরকার।

কথাটা খুবই সত্য। শুধু গাছপালা নয়, পরিবেশ সব জিনিসেরই দরকার। আপন পরিবেশে কুৎসিত মানুষকেও সুন্দর দেখায়।

স্বাতি বলল : আমাদের কলকাতার বাড়ির বারান্দায় এই রকম করে গাছ টাঙালে হাসি পাবে।

বললুম : বারান্দাটিও ভাল করে সাজালে হাসি পাবে না।

চায়ের অপেক্ষা করতে করতে মামা বললেন : বুঝলে গোপাল, আমার এক দূর-সম্পর্কের আত্মীয় অনেক দিন আগে এদিকে এসেছিলেন চাকরি করতে।

মামী জিজ্ঞাসা করলেন : কে ?

মামা বললেন : তুমি তাদের চিনবে না। সে আমাদের ছেলেবেলার ঘটনা। তবে জায়গার নামটা অদ্ভুত বলে এখনও মনে আছে।

একটু থেমে বললেন : কসৌলি।

স্বাতি বলে উঠল : কসৌলি এই পাহাড়েই তো। কসৌলি সনওয়ার সাবাথু দাগশাই।

আমি স্বাতির মুখের দিকে তাকালুম।

স্বাতি হেসে বলল : সোলন ধরমপুর চেইল।

আমি হেসে ফেলেছিলুম।

মামা আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন : এত সব জায়গা এই পাহাড়েই নাকি!

স্বাতি বলল : সব এই পাহাড়ে। ধরমপুর রেল স্টেশন থেকে কসৌলি মাত্র চার মাইল। উঁচু ছ হাজার ফুটেরও বেশি। একদা এই শহরটি ব্রিটিশ সেনার প্রয়োজনে গড়ে উঠেছিল। তারা স্বাস্থ্যোদ্ধারে আসত, আসত ছুটি কাটাতে। তারপর একে একে যখন আরও অনেক শহর গড়ে উঠল, তখন থেকে কসৌলির মান কিছু কমেছে। এখন শুধু কসৌলিতে নয়, সাবাথু সোলন এবং দাগশাইতেও মিলিটারি ছাউনি আছে।

মামা বললেন : কসৌলির নাম আমি অন্য কারণে শুনেছিলুম। আমাদের ছেলে বেলায় কাউকে কুকুরে কামড়ালে এই কসৌলিতে আসতে হত চিকিৎসার জন্য।

স্বাতি বলল : ঠিক বলেছ। ১৯০০ সালে এখানে জলাতঙ্ক রোগের চিকিৎসার জন্যে প্যাস্টর ইন্‌স্টিটিউটের প্রথম প্রতিষ্ঠা হয়। এখন এখানকার সেন্ট্রাল রিসার্চ ইন্‌স্টিটিউটে সব রকম অসুখের সেরাম তৈরি হচ্ছে।

বেয়ারা আমাদের চায়ের সরঞ্জাম টেবিলের উপর রেখে গিয়েছিল। মামী সে সব নিজের দিকে টেনে নিয়ে পরিবেশনের ব্যবস্থা করছিলেন।

মামা বললেন : বুঝলে গোপাল, তোমার দিন এবারে ফুরলো।

ব্যাপারটা আমি বুঝতে পেরেছিলুম, তবু বললুম : কেন বলুন তো!

বুঝতে পারলে না, আর তো আমাদের গাইডের দরকার হবে না।

আমি যেন বুঝতে পারি নি, এই ভাবে বললুম : এবারে আমাদের সঙ্গে অনেক গাইড বই আছে।

মামা বললেন : গাইড বই নয়, জ্যান্ত গাইড।

বলে পাইপটা দাঁত দিয়ে চেপে ধরলেন। এতক্ষণ তিনি সযত্নে তামাক সাজাচ্ছিলেন, এবারে দেশলাই বার করে পাইপ ধরালেন।

আমি স্বাতির দিকে তাকিয়ে বললুম : মামার কথাটা বুঝতে আমার এত দেরি হল কেন জান?

বুদ্ধি কম বলে।

বুদ্ধি যে কম তা অস্বীকার করি নে, কিন্তু তার জন্যে অসুবিধে হয় নি। গাইড আর গাইড বইএ তো তফাত সামান্যই। বইএ যা লেখা আছে, গাইড তা আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয়। যা লেখা নেই তা দেখায় না, বা যা দেখায় না তা লেখা নেই। আমরা সেই রকমের গাইড চাই যে নতুন কথা বলতে পারে, বা কোন জায়গা না দেখিয়েই তা চোখের সামনে ফুটিয়ে তুলতে পারে।

স্বাতি বলল : সে তো অসাধ্য সাধন।

মামী আমাদের খাবার ভাগ করে দিয়েছিলেন। তাই টেনে নিয়ে বললুম : কেন, যখন আমরা মেঘদূত পড়ি, তখন কি রামগিরি থেকে কৈলাস পর্যন্ত আমাদের সব কিছু দেখা হয়ে যায় না?

মামা বললেন : মিথ্যে বল নি, কালিদাসের মেঘদূত শুধু কাব্য নয়, একখানি অপরূপ ভ্রমণ-কাহিনী।

মামার সমর্থন পেয়ে আমি বললুম : স্বাতির বর্ণনা শুনে আমার মনে হল যে একটা মাঠের মধ্যে দুটো কারখানা দেখলুম। সেখানে নানা রকমের ওষুধপত্র তৈরি হয়ে গাড়ি বোঝাই হয়ে ভারতবর্ষের নানা স্থানে চালান যাচ্ছে। আর বিলাতি গোরার বদলে দেশী পল্টন এখন সেই সব জিনিস পাহারা দিচ্ছে।

আমার কথা শুনে মামা হেসে উঠলেন।

স্বাতি হার মানতে চাইল না। বলল : তা হলে নিজেকে একটি পাহাড়ের মাথায় কল্পনা কর। ঘোড়ার পিঠের মতো পাহাড়, শহর তার দু ধারে। এক ধারে তাকিয়ে বরফ দেখ, সিমলার পাহাড় পেরিয়ে ধবলাধারের তুষারশৃঙ্গ। অন্য ধারে দেখ পাঞ্জাবের ধূসর প্রান্তর। সূর্যাস্তের সময় মাঙ্কি পয়েণ্টে দাঁড়িয়ে পাহাড়ী নদী দেখবে রূপোর রেখার মতো, শতদ্রু যেন সোনার সাপের মতো এঁকেবেঁকে বয়ে চলেছে। অন্ধকারে চারি দিকের শহরগুলিও চিনতে পারবে। মানচিত্র মিলিয়ে আর বাতি দেখেই বলতে পারবে নাঙ্গাল রূপাড় চণ্ডীগড় আর কালকা। অনেকে বলেন, পরিষ্কার রাতে আম্বালার বাতিও দেখতে পাওয়া যায়। বাতি দেখে যদি বিস্মিত হতে হয় তো দীপালীর দিন কসৌলি যেও। সেদিন লক্ষ আলোর মেলায় সাজানো শহরগুলি দেখে মুগ্ধ হয়ে যাবে।

পাইপ নামিয়ে রেখে মামা ব্রেকফাস্ট খাচ্ছিলেন। বলে উঠলেন : সাবাস।

স্বাতি গর্বিত ভাবে আমার মুখের দিকে তাকাল।

আমি বললুম : যে কোন পাহাড়ী শহরের বর্ণনাই এই রকম। এই তো সেদিন মসুরি দেখে এলুম। সেখানেও এক দিকে চির-তুষারে আবৃত হিমালয়, আর এক দিকে দূন প্রান্তর। এ গল্প না বললেও আমরা অনুমান করতে পারি।

স্বাতি বলল : তবে কি কসৌলির বর্ণনা শুনতে চাও?

মামী বললেন : গল্পটা পরেও শোনাতে পারবে। এ দিকে চা ঠাণ্ডা হচ্ছে, ও দিকে গাড়িও ছেড়ে যাবে।

চারি দিকে চেয়ে দেখলুম, সবাই তাড়াতাড়ি চা খাচ্ছেন। সবারই তাড়া আছে। গাড়ি ছাড়ার সময় জানা না থাকলে সবারই এই রকম হয়। জানা থাকলেও অনেক সময় তাড়াহুড়ো করতে হয়। গাড়ি যখন লেট চলে তখন নিশ্চিন্ত থাকা যায় না। আমরাও তৎপর হয়ে উঠলুম।

স্বাতি একটু সামলে নিয়ে বলল : থাকবার ব্যবস্থা না করে যেন কসৌলিতে যেও না। হোটেল ক্লাব আর ধর্মশালা আছে। কিন্তু এক সঙ্গে বেশি লোক উপস্থিত হলেই বিপদ। দুটো প্রধান সড়ক অজগরের মতো পাহাড়টিকে উপরে ও নিচে বেষ্টন করে আছে। খোলামেলা পরিচ্ছন্ন জায়গা, আলো বাতাসের কোন অভাব নেই। অভাব শুধু হৈ হল্লা ও হুজুগের। তার বদলে শান্তিতে কয়েকটা দিন বিশ্রাম নিতে পারবে।

আমি কিছু বলতে যাচ্ছিলুম। তার আগেই স্বাতি বলল : এর বেশি কিছু জানবার বাসনা থাকলে তোমাকে নিজে সেখানে যেতে হবে।

মামা বললেন : তার আর দরকার নেই। মনে হচ্ছে আমাদের সবই জানা হয়ে গেছে।

আমি জিজ্ঞাসা করলুম : এর পরে কোন্ শহরের কথা বলবে ?

স্বাতি বলল : চেইল।

আমি স্বীকার করলুম : এ নাম আমি কোন দিন শুনি নি।

স্বাতি জিজ্ঞাসা করল : অন্য নামগুলোই কি কোন দিন শুনেছ ?

বললুম : তুমি যখন শোনাবার ভার নিয়েছ, তখন নতুন কথা নিশ্চয়ই অনেক শুনব।

খাওয়া শেষ করে আমরা বিলের জন্যে অপেক্ষা করছিলুম। এই সুযোগে স্বাতি বলল : সনওয়ার একটি পাবলিক হাই স্কুলের জন্য বিখ্যাত। কসৌলি থেকে তিন মাইল দূরে এই স্কুলে গোরা সৈন্যদের ছেলেমেয়েরা পড়ত। তারপর মিলিটারী ট্রেনিংও দেওয়া হত। সাবাথুও কসৌলির খুব কাছে। উনবিংশ শতাব্দীতে গুর্খারা এখানে একটা দুর্গ তৈরি করেছিল। ইংরেজরা প্রথমে এখানেই হেড কোয়ার্টার করে, পরে সিমলায় সরে যায়। এখন সাবাথু একটি পরিচ্ছন্ন ক্যান্টনমেন্ট।

মামা বিল মিটিয়ে দিলেন। আমরা উঠে পড়লুম।

স্বাতি বলল : ছটফট করে চ'লো না গোপালদা, গাড়িতে উঠবার আগেই তোমাকে দাগশাই ও সোলনের গল্পটা শুনিয়ে দিচ্ছি।

হেসে বললুম : বল।

ধরমপুর থেকে দাগশাই মাত্র তিন মাইল দূরে। একটি পাহাড়ের চূড়োয় ছোট একটি বাজার আর কয়েকটি মিলিটারি ব্যারাক।

তারপর আমার দিকে চেয়ে হেসে জিজ্ঞাসা করল : সোলনের নাম নিশ্চয়ই শুনেছ ?

শুনেছি। সোলনের বীয়ার দেশে বিখ্যাত।

স্বাতি বলল : ঠিক বলেছ। মোটরে এলে এ শহরটা ভাল দেখতে পেতে। চাই কি একটা হোটেলে নেমে একটু বীয়ারও চেখে নিতে পারতে।

শেষের কথাটি বলল আস্তে আস্তে।

আমিও আস্তে আস্তে বললুম : বীয়ার মদ নয়, ওতে দোষ নেই।

স্বাতি বলল : ক্রুয়ারিতে শুধু বীয়ার নয়, সব জিনিসই তৈরি হয়।

গাড়িতে ফিরে এসে আমরা নিজের নিজের জায়গায় বসলুম। কেউ আমাদের আগে এসেছিলেন, কেউ পরে এলেন। দু একজন বসেই ছিলেন। কালকায় চা খেয়েছিলেন, এখানে ব্রেকফাস্ট খেলেন না। একেবারে সিমলায় পৌঁছে লাঞ্চ খাবেন। সময় হলে গাড়ি ছাড়ল।

মামা খানিকক্ষণ পাইপ টানলেন। তারপর বললেন : এবারে তোমার চেইলের গল্প বল।

স্বাতি বলল : শেষে হয়তো তোমরা আমাকে ভয় পাবে।

কেন ?

গোপালদাকে তো আমি ভয় পাই।

বললুম : গোপালদাকে নয়, ভয় পাও ইতিহাসকে। তুমি তো ইতিহাস বলছ না। তোমার ভয় কী !

মামা বললেন : এ সব জায়গার কোন ইতিহাস নেই ?

আমি বললুম : আছে বইকি, ইতিহাস সবেরই আছে। সৃষ্টি-কর্তা ব্রহ্মার জন্মেরও ইতিহাস আছে। অতীতকে বাদ দিয়ে তো বর্তমান হয় না, অতীত মানেই ইতিহাস।

স্বাতির দিকে চেয়ে মামা বললেন : এ অঞ্চলের ইতিহাস তো কিছু বললে না ?

বললুম : এ অঞ্চলের ইতিহাস বড় সংক্ষিপ্ত। সোলন একটি দেশীয় রাজ্যের রাজধানী ছিল। এখন হিমাচল প্রদেশের অন্তর্গত হয়েছে। দেশ যখন ইংরেজের অধীন ছিল, তখন তারা গরমের সময় আত্মরক্ষার জন্যে পাহাড়ে আসত। যেখানে তারা পাহাড়ীদের বস্তি দেখেছে, সেখানেই তারা ছাউনি ফেলেছে, শহর গড়েছে। প্রথমে পায়ে চলা রাস্তা, পরে ঘোড়ার রাস্তা, তারপরে হয়েছে যানবাহন চলাচলের পথ। শুনে আশ্চর্য হবেন, পাহাড়ী পথে কালকা থেকে কসৌলির দূরত্ব মাত্র ন মাইল, আর মোটরে তেইশ মাইল। এখনও অনেকে কসৌলি থেকে কালকা হেঁটে নামেন।

স্বাতি বলল : চেইলের গল্পটা তাহলে তুমিই বল।

হেসে বললুম : বলেছি তো, চেইল নাম আমি আগে শুনি নি।

স্বাতি বলল : তোমার কিছু অজানা আছে, এ কথা বিশ্বাস করতে আমার কষ্ট হচ্ছে।

বললুম : এ যুগের মানুষের অহঙ্কার করবার আর কী আছে ! নিজে সব জানি, এ কথা ভেবেই যদি কেউ আনন্দ পায় তো পেতে দাও। যেদিন কিছু জানবে, সেদিনই বুঝবে যে সে কত কম জানে। সেই জানা নিয়ে অহঙ্কার করবার কিছু নেই।

স্বাতি আমার মুখের দিকে তাকাল। মনে হল, তার দৃষ্টিতে আমি বিষণ্ণতা দেখলুম, কিন্তু সে কিছুই বলল না।

মামা বললেন : গোপাল যে আজ আধ্যাত্মিক কথা বলছ !

স্বাতি আমাকে এ কথার উত্তর দিতে দিল না। বলল: তার চেয়ে চেইলের গল্প শোন।

বল।

স্বাতি বলল: চেইল হল পাতিয়ালার মহারাজার গ্রীষ্মাবাস। গত শতাব্দীর শেষ ভাগে মহারাজা তাঁর প্রাসাদ নির্মাণ করেন, আর তার পর থেকেই এই শহরটি গড়ে উঠতে থাকে।

জিজ্ঞাসা করলুম: এই শহরটি কোন্‌খানে তা বললে না।

স্বাতি তার বইগুলি সংগ্রহ করে বলল: দেখে বলছি।

কয়েকখানা পাতা উলটে খানিকটা পড়ে নিল। তারপর বলল: এ লাইনের বান্দাঘাট স্টেশন থেকে আঠারো মাইল, আর সিমলা থেকে মোটরে বাইশ মাইল। সিমলা থেকে চিনিবাঙলো হয়ে কুফরি রোড গেছে, কুফরি বাজারের কাছে মিলেছে হিন্দুস্থান টিবেট রোডের সঙ্গে। সাত হাজারের চেয়েও বেশি উঁচু এই শহরটি একেবারে বনের মধ্যে। শিকারের জন্য চমৎকার, ইচ্ছে করলে ক্রিকেটও খেলতে পার। এত উঁচুতে ক্রিকেটের মাঠ পৃথিবীতে আর কোথাও নেই।

একটু থেমে জিজ্ঞাসা করল: পাতিয়ালার মহারাজা এখানে আসবার আগে এ জায়গায় কী ছিল জান?

না।

একটি প্রাচীন শিবমন্দির।

শিবের মন্দির!

মামী আশ্চর্য হলেন।

মামা জিজ্ঞাসা করলেন: যাবে নাকি শিবের দর্শনে?

মামা তামাশা করছেন সন্দেহ করে মামী কোন উত্তর দিলেন না।

আমি বললুম: সিমলায় পৌঁছে আর তোমার গল্প শুনব না। সেখানে আমরা চোখ মেলে সব কিছু দেখব, আর নিঃশব্দে সৌন্দর্য উপভোগ করব।

স্বাতি হেসে বলল : এ যে আমার মতো কথা হল।

বললুম : কোলাহল উপভোগের জিনিস নয়, উপভোগ করা যায় শান্তি।

স্বাতি বলল : আমি কি কোলাহল করছি ?

কথা আর কোলাহলে তফাত খুবই কম। ঢাকের বাদ্যকে যেমন সঙ্গীত না বলে কোলাহল বলা উচিত, এও তেমনি।

রেল কার স্বচ্ছন্দে পাহাড়ে উঠছে। মোটরের মতো পাক খাচ্ছে না, ট্রেনের মতো শব্দ নেই। পাহাড়ে ওঠার কোন গ্লানি বোধ হচ্ছে না। সামনের ও দু পাশের সুন্দর পরিবেশের দিকে তাকিয়ে আমার কথা বলার প্রবৃত্তি সহসা ফুরিয়ে গেল। সৌন্দর্য সত্যিই নিঃশব্দে উপভোগের সামগ্রী।

১০

দুপুরের আহারের পূর্বেই আমরা সিমলা স্টেশনে এসে পৌঁছলুম। সুন্দর পরিচ্ছন্ন স্টেশন। বাতাসে শীতের আমেজ শিরশির করছে। গাড়িতেই মামা সবাইকে গরম জামা পরিয়েছিলেন। নিজেও একটা গরম কোটের উপর চাদর জড়িয়েছিলেন। আমি গায়ে দিয়েছিলুম চাওলার দেওয়া সেই জ্যাকেটটা। ইচ্ছে করে গায়ে দিই নি। মামা জোর করেছিলেন, বলেছিলেন: সিমলায় গিয়ে তোমার কিছু জামা-কাপড় তৈরি করাতে হবে।

আমি বলেছিলুম: তার দরকার নেই। শীত বোধটাই আমার কম।

মামা ধমক দিয়ে বলেছিলেন: তোমার কোন্ বোধটা বেশি?

মামী বলেছিলেন: বাক্সে গায়ের কাপড় আরও ছিল, কিন্তু সে সব তে পেছনে পড়ে রইল্।

আমার এই স্নেহের লাঞ্ছনা দেখে স্বাতি হেসেছিল।

সিমলার প্ল্যাটফর্মে নেমে মামার নূতন দুশ্চিন্তা এল। বললেন: এই জন্যেই বলেছিলুম যে কোন হোটেলে টেলিগ্রাম করে আসি।

মামী বললেন: তাতে সুবিধে কী হত?

সুবিধে হত না! ওদের লোক স্টেশন থেকে আমাদের নিয়ে যেত। কোন ভাবনা ভাবতে হত না।

মামী বললেন: পয়সাও নিত গলা কেটে।

ভাল ভাবে থাকতে হলে দু পয়সা খরচ করবে না!

মামী রুক্ষ স্বরে বললেন: জমিদারী তো অনেক কাল আগে গেছে, এবারে তোমার মেজাজটা বদলাও।

মামাও একটা কঠিন উত্তর দিতে যাচ্ছিলেন। কিন্তু তার আগেই দু তিনটে হোটেলের গাইড এসে ছেঁকে ধরল। মামী বললেন: দেখলে তো!

বলে আমার দিকে তাকালেন।

আমি তাদের একজনকে জিজ্ঞাসা করলুম: তোমার হোটেল কোথায়?

বিনীত ভাবে সে বলল: কার্ট রোডে।

মামা বললেন: সাবধান গোপাল, দার্জিলিঙের কার্ট রোডে গরুর গাড়ি চলে। সেখান থেকে কোন ভদ্রলোক বেড়াতে বেরতে পারে না।

মামী বললেন: তুমি বলছ কী! কার্ট রোডের ওপর তো রেলের স্টেশন। সেখান থেকে মল আর কতটুকু!

আমাদের বাঙলা কথা গাইডেরা কী বুঝল তারাই জানে। আর একজন বলল: তা আপনাদের একটু কষ্ট হবে বইকি, কার্ট রোড থেকে মল রোডে উঠতে আমাদেরই কষ্ট হয়।

আগের লোকটি ক্ষেপে গেল, বলল: বাজে কথা কেন বলছ! তোমার হোটেল তো পাহাড়ের উলটো ধারে। তোমাদের একটা ঘরেও আমাদের মতো আলো বাতাস আছে?

মামা বললেন: বুঝেছি। তোমাদের একজনকেও আমাদের চাই নে।

তৃতীয় ব্যক্তি এতক্ষণ পিছনে ছিল। এবারে সে এগিয়ে এসে বলল: আসুন স্যার।

তোমার হোটেল আবার কোন্ চুলোয়?

ভয়ে ভয়ে সে বলল: আজ্ঞে স্যার মল রোডের উপরেই।

যারা পিছিয়ে গিয়েছিল, তাদের মধ্যেই একজন বলে উঠল: তবে আর কী, সিমলার বদলে ছোট সিমলায় নিয়ে যাও।

কথাটা বুঝতে না পেরে মামা আমার দিকে তাকালেন।

আমি জিজ্ঞাসা করলুম: শহর থেকে কত দূরে?

শহরের বাইরে নয় স্যার, শহরের মধ্যেই। ক্লার্ক্স্ হোটেলের কাছেই আমাদের মেরিনা হোটেল। ভাল না লাগে, আপনি পাশের

হোটেলে চলে যাবেন। তার চেয়ে ভাল হোটেল তো এখন সিমলায় নেই।

মামা বললেন ঃ তবে আমরা সেখানেই কেন যাই না?

মেরিনার গাইড এবারে সাহস সঞ্চয় করে বলল ঃ পয়সা যদি জলে দিতে চান তো সেখানেই যান, কম পয়সায় আমরা আপনাকে কিছু খারাপ সার্ভিস দিতাম না।

বললুম ঃ একটু বুঝিয়ে বল।

লোকটি বলল ঃ ক্লার্কের ইউরোপীয়ান স্টাইল, মাথাপিছু কুড়ি পঁচিশ টাকার কম তারা বোর্ডার রাখে না। অথচ তারই পাশে আমরা দশ টাকা নিই, আপনার ইচ্ছে হলে দশ টাকাতেই একটা পুরো ফ্যামিলি স্যুইট নিয়ে নিজেদের পছন্দ মতো খাবার ব্যবস্থা করতে পারেন।

এই প্রস্তাব শুনেই মামীর রামখেলাওনের কথা মনে পড়ল। সে ট্রেনে আসছে। জিজ্ঞাসা করলেন ঃ রামখেলাওন কখন আসবে?

গাইড বলল ঃ মালপত্রের জন্যে আপনারা কোন চিন্তা করবেন না। রসিদ পেলে আমি সমস্ত জিনিস হোটেলে পৌঁছে দেব।

বুঝতে পারলুম যে সে মামীর প্রশ্ন বুঝতে পারে নি। কিন্তু মামী তার সমস্ত কথা বুঝতে পেরেছিলেন। বললেন ঃ চল।

মামা আশ্চর্য হয়ে বললেন ঃ চল মানে? তুমি কি এই হতভাগার হোটেলে উঠবে নাকি!

মামী বললেন ঃ তবে কি ঐ সাহেব মেমদের সঙ্গে বলনাচ নাচব?

স্বাতি হেসে উঠল।

আমি দেখলুম, মেরিনার গাইডটি তার প্রতিদ্বন্দ্বীদের দিকে পরম তাচ্ছিল্যের দৃষ্টি নিক্ষেপ করে এগিয়ে চলল। আমরা তাকে অনুসরণ করে স্টেশনের বাহিরে এলুম।

খানিকটা উপরে উঠে খানকয়েক রিক্‌শ পাওয়া গেল। গাইড বলল ঃ আপনারা দুজনে রিক্‌শয় উঠুন, আমরা হেঁটে উঠব।

বলে মামা মামীকে মানুষে টানা রিক্‌শয় তুলে দিল। তারপর স্বাতির দিকে তাকিয়ে বলল : হাঁটতে আপনাদের ভাল লাগবে। পাহাড়ে তো হাঁটতেই আসা।

জিজ্ঞাসা করলুম : তবে ওঁদের কেন রিক্‌শয় তুলে দিলে ?

ওঁদের কষ্ট হত। আর প্রথম দিনেই কষ্ট পেলে নতুন জায়গায় সব সুখই বিস্বাদ লাগে।

কথাটা আমি মেনে নিলুম। যাত্রার কষ্ট ভ্রমণের আনন্দকে অনেক পরিমাণে খর্ব করে। রুদ্ধ শ্বাসে পরিশ্রান্ত দেহে নিজের ভাগ্যকে ধিক্কার দিতে দিতে যাত্রীরা কেদারনাথের চড়াই ভাঙ্গে। তারপরে সহসা যখন কেদারনাথের মর্মর মন্দির দেখে চিরতুষারে আবৃত পর্বতের পাদদেশে, তখন এক নিমেষে তার সমস্ত কষ্ট ভুলে যায়। অন্ধকার মন্দিরের ভিতর বিরাট এক প্রস্তরখণ্ডের উপর হুমড়ি খেয়ে পড়ে ভাবে, জীবন তার ধন্য হয়ে গেল, সার্থক হল জন্ম। যাত্রার সমস্ত কষ্টের চেয়ে দেবতার দর্শন তার কাছে অনেক বড়। কিন্তু আমাদের এ যাত্রা সে পর্যায়ের নয়। দেবতার টানে আমরা আসি নি, আমরা এসেছি আনন্দ পেতে। কাজেই যাত্রার কষ্ট যে আমাদের আনন্দের অন্তরায় হবে তাতে সন্দেহ নেই।

গাইড এতক্ষণ আমার পাশে পাশে চলছিল। কখন এক সময় স্বাতির পাশে গিয়ে পৌঁছেছিল দেখতে পাই নি। তাদের কথা শুনে আমি ফিরে তাকালুম।

গাইড জিজ্ঞাসা করেছিল : আপনার বাবা মার সঙ্গে বেড়াতে এসেছেন ?

সংক্ষেপে স্বাতি বলল : হ্যাঁ।

আর এই বাবু ?

অদ্ভুত প্রশ্ন। আমি স্বাতির উত্তর শোনবার জন্য ব্যস্ত হয়ে পথের দিকে চোখ ফিরিয়ে নিলুম। তাদের কথোপকথনে যেন আমার মন নেই, এমনই ভাব। কিন্তু স্বাতি যে আমার দিকে ফিরে

তাকিয়েছিল, আমি তা অনুভব করেছি। বোধহয় আমাকে অন্যমনস্ক ভেবেছে। তাই কতকটা নিশ্চিন্তে বলল : বন্ধু।

তৎপর ভাবে গাইড বলল : খুব ভাল। একজন বন্ধু না থাকলে পাহাড় ভাল লাগে না।

কেন ?

এই ধরুন, আপনি প্রস্পেক্ট হিল যাবেন, কিংবা জাখু পাহাড়ে উঠবেন। আপনার বাবা মা কি আর লাফিয়ে লাফিয়ে উঠতে পারবেন ! অথচ আপনারা দুজনে—

স্বাতি বলল ।

গাইড বলল : আমরা তো হামেশাই দেখছি, এখানে :একা এসে কারও কোন দিন ভাল লাগে না। মল রোডে মনমরা হয়ে বেড়ায়, রীজের বেঞ্চিতে চুপচাপ বসে থাকে, তা না হলে বারে বসে একটু-আধটু—

এ কথার উত্তরেও স্বাতি বলল : বুঝেছি।

গাইড এবারে আমার দিকে চলে এল। এবারে তার আসার কায়দাটা দেখে ফেললুম। চলতে চলতে দু পা পিছিয়ে পড়ে চার পা এগিয়ে এল। বলল : বুঝলেন স্যার, সিমলা আপনাদের খুব ভাল লাগবে।

কেন ?

গাইড একগাল হেসে বলল : ভাল লাগবারই জায়গা।

রিক্শ দুখানি আমাদের চোখের আড়ালে চলে গিয়েছিল। গাইড বলল : আসুন, আমরা এই রাস্তায় উপরে উঠি।

বলে সে নিজে পিছিয়ে পড়তে লাগল, এবং খানিকক্ষণ পরে তাকে আর দেখতে পেলুম না।

স্বাতি আমার মুখের দিকে তাকিয়ে হাসল।

আমি জানি, এ তার কৌতুকের হাসি। তাই বললুম : সব কথা কি হাসি দিয়ে বোঝানো যায় !

যায় না বুঝি !

তা যদি যেত, তাহলে পৃথিবীতে এত ভাষার দরকার হত না। ঐ হাসি দিয়েই পৃথিবী জয় করা সম্ভব হত।

কটাক্ষে যদি রাজ্য জয় হয় তো হাসিতে পৃথিবী জয় হবে না !

কটাক্ষে রাজা ও রাজ্য জয়ের নজির হয়তো আছে, কিন্তু রাজ্যের প্রজাকে জয় করতে হলে অন্য কিছুর দরকার। আমরা গরিব প্রজা, কটাক্ষে ভয় পাই, হাসিতেও পেট ভরে না।

তার জন্যে জাবর দরকার।

হেসে বললুম : এবারে তোমার কথা দেখছি ভারি তীক্ষ্ণ হয়েছে।

স্বাতি বলল : একখানা কষ্টিপাথর কিনেছি, আর সেই পাথরে সারাক্ষণ বুদ্ধি শান দিচ্ছি—

সাধারণ পাথর হলে আমার বুদ্ধিও একটু শান দিয়ে নিতুম।

এতে নেবে না কেন ?

আমার বুদ্ধি তো সোনা নয়; লোহা ঘষলে তোমার কষ্টিপাথরটাই ক্ষয়ে যাবে।

স্বাতি বোধহয় একটু লজ্জা পেয়েছিল, তার পরেই সামলে নিয়ে বলল : কষ্টিপাথর না হলে আমার চলে না। মনে মনে নিজের বুদ্ধিকে সবাই সোনা ভাবে তো, তাই কষে দেখিয়ে দিতে হয়।

বললুম : তলোয়ারের খেলা ছেড়ে এইবারে বল তো কেন হেসেছিলে ?

স্বাতি বলল : আমাদের গাইডের বুদ্ধি দেখে।

আমি এই বুদ্ধি যে লক্ষ্য করি নি তা নয়, কিন্তু না বোঝার ভান করে বললুম : সে তো সরে পড়েছে দেখছি।

স্বাতি আমার মুখের দিকে একবার ভাল করে তাকাল। তারপর আমার সরলতায় সন্দেহ না করে বলল : হঠাৎ এমন করে সরে পড়ল কেন বোধহয় বুঝতে পার নি ?

না।

তবে বুঝে আর দরকার নেই।

বললুম ঃ নিশ্চয়ই কোন চায়ের দোকানে ঢুকেছে, চা খেয়ে কোন চোরা পথে উপরে উঠে আমাদের ধরে ফেলবে।

নির্মল কৌতুকে মুখ উদ্ভাসিত করে স্বাতি বলল ঃ তবে আর কী, সবই বুঝে ফেলেছ দেখছি।

আমিও হেসে বললুম ঃ কিন্তু হতভাগা বোঝে নি যে আমরা একা হলেই তলোয়ারের খেলা খেলি।

এবারে স্বাতির দৃষ্টিতে আমি ভর্ৎসনা দেখলুম। সে বুঝতে পেরেছে যে এতক্ষণ আমি তার সঙ্গে ছলনা করেছি।

পাহাড়ের পথ চলায় এক রকমের নূতন আনন্দ পাচ্ছি। মসুরিতে যে পথ দেখেছি, সে প্রায় সমতল। কোন পাহাড়ের উপরে উঠবার সময় পাই নি। গত বছর আবু শহরটাকেও পাহাড় বলে মনে হয় নি। হাজারিবাগ বা রাঁচীর মতো শহর বলে মনে হয়েছে। বরফের পাহাড় দেখি নি, দুপুরবেলার গরম হাওয়ায় পাহাড় বলেই মনে হয় নি। কিন্তু এখানে তা মনে হচ্ছে না। দক্ষিণের রোদে চারি দিক উদ্ভাসিত, কিন্তু শীতের আমেজ বাতাসে ছড়িয়ে আছে। মনে হচ্ছে, এই চড়াই ভেঙ্গে পাহাড়ের ওধারে পৌঁছতে পারলে উত্তরের বরফের পাহাড় চোখের সামনে ভেসে উঠবে।

আমি নিঃশব্দে পথ অতিক্রম করে চলেছিলুম। হঠাৎ স্বাতি জিজ্ঞাসা করল ঃ কিছু ভাবছ বলে মনে হচ্ছে?

আমি বলতে পারতুম যে মানুষের মন সারাক্ষণ ব্যস্ত থাকে, আর এই মন ঘুমিয়ে পড়লে কোন বোধই আর থাকে না। কেন জানি না, আমার তর্কে আর প্রবৃত্তি হল না। বললুম ঃ আজ এক রকমের নতুন আনন্দ পাচ্ছি।

স্বাতি আমার মুখের দিকে তাকাল সন্দেহের দৃষ্টি নিয়ে। তারপর প্রশ্ন করল ঃ সত্যি বলছ?

বললুম ঃ এবারে যখন ঘর ছাড়ি, তখন জানতুম যে পূজোর ছুটির আগেই আবার ফিরে আসব।

কেন, তোমার গণৎকার বন্ধু এবারে কোন ভবিষ্যৎ গণনা করেন নি?

সে নিজেই এবারে গণৎকারের সন্ধানে বেরিয়েছিল।

চলতে চলতেই স্বাতি আমার মুখের দিকে তাকাল।

আমরা বেশ ধীরে ধীরে উপরে উঠেছিলুম। তাড়াতাড়ি উঠবার চেষ্টা করলেই বুকে হাঁপ ধরবে। কথাও বলতে হচ্ছিল থেমে থেমে। বললুম ঃ এবারে আমরা ভৃগুর সন্ধানে বেরিয়েছিলুম।

ভৃগুর সম্বন্ধে স্বাতির কী ধারণা আছে জানি নে, জিজ্ঞাসা করল ঃ তারপর ?

বললুম ঃ কাশীতে শাস্ত্রীজীকে পাওয়া গেল না, হরিদ্বারেও না। খবর নিয়ে জানা গেল যে তিনি এখন দিল্লীতে। এই শাস্ত্রীজীর সঙ্গে সাক্ষাতের উদ্দেশ্যেই আমরা কলকাতা থেকে কাশী, কাশী থেকে হরিদ্বারে এসেছিলুম। কিন্তু দিল্লী আসবার পরামর্শ পেয়েও আমরা রাজী হই নি।

কেন ?

সাহসের অভাব।

স্বাতি খিলখিল করে হেসে উঠল।

আমি গম্ভীর হয়ে বললুম ঃ ভাবছ যে রাজধানীকে আমাদের ভয় ! মোটেই না। খবরের কাগজের কল্যাণে রাজধানীর হালচাল জানতে আমাদের কিছুই বাকি নেই।

তবে ?

মনোরঞ্জনের ভয় একটি মেয়েকে। সে নাকি দেশের ছেলেদের মাথা খাচ্ছে।

সে কি তোমাদেরও মাথা খাবে ভেবেছিলে !

সাবধানের মার নেই।

সাবধানের জীবনও নেই। ভয়ে ভয়েই সারা জীবন নষ্ট করে।

এ কথার কী উত্তর দেব, আমি ভেবে পাচ্ছিলুম না। স্বাতি বলল : বুদ্ধিমান হলে তোমরা ভয় পেতে না। রাজধানীর মেয়েরা তোমাদের মাথা খাবার উপযুক্ত বলে মনে করে না।

এ কথা আমার জানা বললে তুমি আমাকে বুদ্ধিমান ভেব না। মনোরঞ্জনই বুদ্ধিমান। রাজধানীর কোন্ মেয়ের কাছে কে কতবার লাথি খেল, সে তার সঠিক হিসেব রাখে।

নিজে গণনা করে জেনেছে, না শুনেছে কারও কাছে?

সে কথা তাকেই জিজ্ঞেস ক'রো।

কথা বলতে কষ্ট হচ্ছিল। আমরা খানিকক্ষণ নিঃশব্দে চলতে লাগলুম।

মনোরঞ্জনের কথা আমার মনে পড়ল। কাশীতে সে আমাকে জিজ্ঞাসা করেছিল : আমাদের দিল্লী যাওয়া কেন অসম্ভব বলতে পার?

আমি বলেছিলুম : পারি।

পার বলতে!

হেসে বলেছিলুম : শাস্ত্রীর বদলে যদি স্বাতির সঙ্গে দেখা হয়ে যায়, এই ভয়। কিন্তু দেখা হবেই। দিল্লী যাব, অথচ স্বাতির সঙ্গে দেখা হবে না, এ একটা কথা হল!

মনোরঞ্জন ঝাঁজিয়ে উঠেছিল : তোমার কি লজ্জা সরম নেই! এ পর্যন্ত কতবার লাথি খেলে বল তো?

বলেছিলুম : মাত্র বার কয়েক। কিন্তু তাতে পিছিয়ে এলে আমার পৌরুষটা রইল কোথায়! দিল্লীতে তোমার সঙ্গে চাওলার পরিচয় করিয়ে দেব। সে মিত্রার কাছে অন্তত হাজারবার লাথি খেয়েছে, অথচ এখনও তার আশা ছাড়ে নি। মনে হয়, আশা ছাড়বার আর দরকার নেই, অগ্নিপরীক্ষায় সে উত্তীর্ণ হয়ে গেছে।

চাওলার কথাও আমার মনে পড়ল। সেবার দিল্লীতে আমাকে

বলেছিল : মিত্রার মনের কথা জানতে পারি, এমন সাধ্য আমার নেই। তবে বিয়ে করতে রাজী হলে বুঝতুম, খাঁটি জিনিস পেয়েছি।

চাওলার দু চোখে যে শ্রদ্ধার আভাস দেখেছিলুম, তাও মনে পড়ল।

স্বাতির সম্বন্ধেও কি আমার এমনই শ্রদ্ধা আছে! আমিও কি তাকে খাঁটি জিনিস ভাবি নে! তবে সে কেন জো রায়ের মতো একটা অপদার্থকে বিয়ে করতে রাজী হল! এ কথা কি স্বাতিকে আমি জিজ্ঞাসা করব!

নিচে থেকে উপরের প্রশস্ত পথে পৌঁছে ভাবছিলুম, কোন্ দিকে যাব। পাশ থেকে গাইড বলল : আসুন ডান দিকে। আমাদের রিক্‌শ দেখছেন না, হোটেলে পৌঁছে গেছে।

১১

হোটেলের যে স্যুইটটা পাওয়া গেল, তার দক্ষিণের বারান্দায় রোদ ঝলমল করছে। তারপরেই পাহাড় স্তরে স্তরে নেমে গেছে। এই বারান্দায় দাঁড়িয়ে সিমলার শহরটিকে অর্ধচন্দ্রের মতো মনে হচ্ছে। বাম দিকে ছোট সিমলা, সূর্য ওঠে পাহাড়ের পিছন থেকে। ডান দিকে পাহাড়ের শেষ নেই। সব চেয়ে উঁচু বাড়িটির নাম গ্র্যাণ্ড হোটেল, এখন আই. এ. এস. ট্রেনিং কলেজে পরিণত হয়েছে। তারপর সামার হিলে রাষ্ট্রপতি ভবন, প্রস্পেক্ট হিল, তারাদেবী। ঐ ধার থেকেই আমরা এসেছি। তারাদেবী সামার হিল স্টেশনের পরে সিমলা স্টেশন। স্টেসনের নিচেও ঘন বস্তি আছে। ফাগ্‌লি, তুতিকান্দি। এই বারান্দায় দাঁড়িয়ে দিগন্ত পর্যন্ত দৃষ্টি প্রসারিত করে দেওয়া যায়। চোখ বাধা পায় না, মনও মুক্ত হয়।

এই বারান্দায় বসে রোদে চুল শুকতে পারবেন বলে মামীর স্যুইট পছন্দ হল; কিন্তু বাথরূম দেখে তাঁর ভক্তি উড়ে গেল। ম্যানেজার অনেক কষ্টে বোঝালেন যে সিমলার সর্বত্রই এই ব্যবস্থা। তার জন্যে অসুবিধে হবে না। জমাদার সারাক্ষণ আছে, গরম জল নিয়েবেয়ারারা ছুটোছুটি করছে। আধুনিক ব্যবস্থা না থাকার ত্রুটি যত্ন দিয়ে পূরণ করে দেবেন।

বেলা কম হলে মামী হয়তো অন্যত্র যেতে চাইতেন। কিন্তু তখন স্নান খাওয়ার সময় উত্তীর্ণ হয়ে যাচ্ছে। তাই নিতান্ত অনিচ্ছাতেই ব্যবস্থা মেনে নিলেন। নিশ্চিন্ত হয়ে ম্যানেজার বললেন: আমি গরম জল পাঠিয়ে দিচ্ছি, আপনারা একে একে স্নান সেরে নিন।

বেরিয়ে যেতে যেতেও আবার ফিরে এলেন। জিজ্ঞাসা করলেন: হোটেলের মেন্যু আপনাদের চলবে তো, না কোন স্পেশাল ডিশ চাই?

মামা বললেন: এত বেলায় আর স্পেশাল ডিশের দরকার নেই। বরং আর একটা বাথরূম পেলে স্নানটা তাড়াতাড়ি হত।

ও, নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই। আমি বেয়ারা পাঠিয়ে দিচ্ছি। দু নম্বর ঘর খালি আছে, সে বাথরুমটা আপনারা স্বচ্ছন্দে ব্যবহার করতে পারেন।

আহারের পর ড্রয়িংরূমে ফিরে আসতে আমাদের দুপুর গড়িয়ে গেল। প্রথমেই মামী বললেন: এই একখানা ঘরে শোবার কী ব্যবস্থা হবে বুঝতে পাচ্ছি নে।

মামা বললেন: ঘর আর কখানা দরকার! দুখানা বড় বড় ঘরে কি আমাদের চারজনের কুলোবে না?

শোবার ঘরে রামখেলাওন এসে বিছানা পেতে ফেলেছিল। স্বাতি দেখে এসে বলল: সবার ব্যবস্থাই তো হয়েছে দেখছি।

কী রকম?

ও ঘরে তিনখানা খাট পড়েছে।

দরজার সামনে দাঁড়িয়ে মামীও নিশ্চিন্ত হলেন। রামখেলাওনকে জিজ্ঞাসা করে জানলেন যে নেওয়ারের খাট হোটেলে অনেক আছে। ম্যানেজারের কাছে একখানা চেয়ে এনে শোবার ঘরে বিছিয়ে ফেলেছে। সন্ধ্যাবেলায় আর একখানা এনে ড্রয়িংরূমে পাতবে।

মামা বললেন: ওকে যেতে দাও, দুটো খেয়ে নিক।

রামখেলাওন সবিনয়ে জানাল যে সে সিমলায় পৌঁছবার আগেই এই প্রয়োজনীয় কাজটি সেরে নিয়েছে।

রামখেলাওনের বুদ্ধি দেখে স্বাতি বিস্মিত হয়েছিল। পরে জানা গেল যে এ সমস্তই সেই গাইডের কাজ। মামার কাছে লাগেজের রসিদ নিয়ে সে স্টেশনে নেমে গিয়েছিল। রামখেলাওনকে সে-ই খুঁজে বার করেছে। তারপর হোটেলে এনে এই সব ব্যবস্থা করে দিয়ে গেছে।

আমাদের স্যুইটে আরও একখানা ছোট ঘর আছে। সেখানা ড্রেসিংরূম। সিমেণ্টের মেঝে বলে রান্নাবান্নাও করা চলে। অন্য

ঘরে কাঠের মেঝে, তার উপর কার্পেট। প্রতি ঘরে প্রয়োজনের চেয়ে বেশি ফার্নিচার। ড্রেসিং টেবিল ওয়ার্ডরোব থেকে সোফাসেট পর্যন্ত। মামা একখানা সোফায় বসে পাইপে তামাক খাচ্ছিলেন। মামী বসলেন না, জিনিসপত্র গোছগাছ করবার জন্য তিনি শোবার ঘরে চলে গেলেন। স্বাতি ও আমি মামার কাছে বসলুম।

মামার অভ্যাস আমি জানি। যতক্ষণ এই পাইপে আগুন থাকবে, ততক্ষণ বসে বসে গল্প করবেন। আগুন ফুরোলেই পাইপ ঝেড়ে উঠে পড়বেন, আর খানিকক্ষণ বিছানায় গড়িয়ে নেবেন। আমরা দুজনেই মামার প্রশ্নের অপেক্ষা করতে লাগলুম।

মুখে খানিকটা ধোঁয়া যাবার পরে জিজ্ঞাসা করলেন: এখানে কদিন থাকবে?

প্রশ্নটা আমাকেই করেছিলেন, কিন্তু উত্তরটা স্বাতি দিল। বলল: এবারে এ সব আমার ওপরেই ছেড়ে দাও বাবা।

মামা বললেন: ছেড়ে তো দিয়েইছি।

স্বাতি বলল: তবে আর ভাবনা কী। অন্য অন্য বারে এ সব আগে থেকেই ঠিক করতে বলে মুড়ি মিছরির এক দর হত। জায়গা ভাল লাগলেও যা, খারাপ লাগলেও তাই। এবারে আমরা কোন জায়গা ভাল লাগলে দু দিন বেশি থেকে যাব।

মামা বললেন: আইডিয়া মন্দ নয়।

আমি বললুম: কিন্তু তাতে অলস হবার সম্ভাবনা থাকে।

কী রকম?

ফেরার দিন ঠিক না থাকলে সিমলা দেখাই আমাদের শেষ হবে না। আজ এসে পৌঁছেছি, আজকের বিকেলটা হোটেলেই গড়ানো যাক। কাল কালীবাড়ি, পরশু সামনের পাহাড়টা, তারপর দিন আর একটা জায়গা। পনের দিন পরেও দেখা যাবে যে আরও অনেক দেখবার জায়গা দেখা হয় নি।

মাথা নেড়ে মামা বললেন: সে কথা সত্যি।

স্বাতি বলল : এ সবই গোপালদার কথার কারসাজি। কোন একটা জায়গায় পৌঁছবার আগে কিছু স্থির না করে পৌঁছবার পরে করলে মহাভারত অশুদ্ধ হবে না। আজ বিকেলবেলায় বাড়ি থেকে বেরিয়ে এক নজর দেখে এসেও আমরা একটা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারি।

মামা বললেন : তা পারি বইকি।

আমি বললুম : আবেগের বশে কোন কাজ করতে গেলেই ভুল হবার সম্ভাবনা। বুদ্ধির রাশ টেনে মানুষকে নির্দিষ্ট পথে চলতে হয়।

স্বাতি বলল : তোমার সংহিতার উপদেশ ঘরের জন্যে তুলে রেখে এস। বেড়ানো তো মুক্তির জন্যে।

মুক্তি তো বুদ্ধির নয়, মুক্তি মনের। মন বেয়াড়া হলে বুদ্ধি দিয়ে তাকে সংযত রাখতে হবে।

মামা বললেন : এ যে বুদ্ধির লড়াই হচ্ছে দেখছি। আমার প্রশ্নটা কিন্তু সহজ ছিল। তার জন্যে এত বড় যুদ্ধের কোন কারণ নেই।

মামী ফিরে এসেছিলেন। বললেন : কিসের যুদ্ধ ?

মামা বললেন : তোমার মেয়ের সঙ্গে গোপালের যুদ্ধ হচ্ছে। পাত্রাধার তৈল, না তৈলাধার পাত্র। কিন্তু তুমি পারবে না গোপাল, সব কথা জান না বলেই স্বাতির সঙ্গে যুদ্ধ করতে সাহস পাচ্ছ।

আমি তখনি ভয় পাবার ভান করে মামার মুখের দিকে তাকালুম।

স্বাতি চেঁচিয়ে উঠল : ভাল হচ্ছে না বাবা।

মামী বললেন : মেয়ের সঙ্গে তামাশা করবারই বয়স বটে।

মামা বললেন : তাহলে কি তামাশাটা তোমার সঙ্গে করব ?

মামী বললেন : তোমার মুখের তো আগল নেই, তুমি তাও পার।

তবে তামাশাটা কার সঙ্গে করি ?

ইয়ার দোস্তের সঙ্গে।

মামা এ প্রশ্নের উত্তর পাবেন বলে আশা করেন নি, বলার মতো কিছু ভেবে না পেয়ে শুধু বললেন : হুঁ।

আমি স্বাতিকে বললুম : ব্যাপারটা কী বল না ?

গম্ভীর ভাবে স্বাতি বলল : ক্রমশ প্রকাশ্য।

আজ তাহলে কিছু তো প্রকাশ কর।

মামা বললেন : স্বাতি আজকাল ন্যাশনাল লাইব্রেরিতে যাতায়াত শুরু করেছে।

ঠোঁট উলটে আমি বললুম : এই কথা! এ তো আমি খবরের কাগজেই পড়েছি।

কী রকম ?

ন্যাশনাল লাইব্রেরির কর্তৃপক্ষ বলেছে যে স্বাতি যদি একটা থিসিস লেখে তো তারা তাকে একটা ভাল চাকরি দিতে রাজী আছে।

স্বাতি বলে উঠল : তোমাকে এ সব বাজে কথা কে বলল ?

বললুম তো, খবরের কাগজে পড়েছি।

তোমার খবরের কাগজের গল্প আমি জানি। তোমার বুদ্ধি তো মাথায় নয়, তোমার পেটে বুদ্ধি।

দুষ্টু বুদ্ধি বল।

মামার হাই উঠছিল, পাইপের আগুনও নিবে গিয়েছিল। এবারে ছাইদানিতে ছাই ঝেড়ে উঠে পড়লেন। জিজ্ঞাসা করলেন : তোমরা এখন কী করবে ?

মামীও উঠে শোবার ঘরে চলে গিয়েছিলেন।

আমি বললুম : স্বাতি বোধহয় অঙ্ক কষতে বসবে, আমি একটু বাইরে বেরব।

স্বাতি বলল : বাইরে, না কোন বোর্ডারের সঙ্গে ভাব করে সিমলার খবর সংগ্রহ করবে ?

তার জন্যে বোর্ডারের সঙ্গে ভাব করতে হবে না, ম্যানেজারকে জিজ্ঞেস করেই জানা যাবে।

হাসতে হাসতে মামাও শুতে গেলেন।

দরজা খুলে আমি বারান্দায় বেরলুম। একেবারে বাহিরে এসে

সামনের পাহাড়টার দিকে তাকালুম। এই পাহাড়ের কোল ঘেঁষে একটা জনবিরল পথ দক্ষিণে ছোট সিমলার দিকে গেছে। আর সেই পথই বামে শহরের নিবিড় লোকালয়ের দিকে চলে গেছে। এরই নাম মল রোড। এই পথেই বাজারহাট, অফিসদপ্তর, কালীবাড়িও ঐদিকে। হোটেলে আসবার সময় গাইড আমাদের এই সব বলেছিল। এর বেশি জানতে হলে নিজেদেরই বেরিয়ে দেখতে হবে।

অন্যমনস্ক ভাবে হাঁটতে হাঁটতে আমি হোটেলের প্রাইভেট পথ পেরিয়ে সরকারী রাস্তায় পৌঁছে গিয়েছিলুম। সামনেই একটুখানি ছায়াচ্ছন্ন স্থান। বড় বড় পাইন গাছে জায়গাটা অন্ধকার হয়ে আছে। আর পাহাড়ের ন্যাড়া গা বেয়ে ঝিরঝির করে জল পড়ছে। এ কোন ঝর্ণা নয়। পথের উপর দিয়ে জল নদীর মতো বয়ে যাচ্ছে না। রাস্তার ধারেই সেই জলের ধারা হারিয়ে যাচ্ছে। বর্ষার সময় এ স্থানটা কী রকম দেখায় কল্পনা করতে পারলুম না।

ঝর্ণার নামে আমার শিলঙের কথা মনে পড়ে। মনে পড়ে, রবীন্দ্রনাথের 'শেষের কবিতা'র কথা।—

ঝর্ণা তোমার স্ফটিক জলের স্বচ্ছ ধারা,
তাহারই মাঝারে দেখে আপনারে সূর্য তারা।

লাবণ্যর সঙ্গে অমিত রায় এসে এই সব ঝর্ণার ধারে বসত। আর—

পিছনে একটা হাসির শব্দ শুনে আমি ফিরে তাকালুম। কাকে দেখতে পাব সে কথা আমার জানা ছিল। তাই আমি বিস্মিত হলুম না। মনের খুশী যাতে প্রকাশ না পায় তারই জন্যে বললুম : তুমি এখানে!

স্বাতি বলল : কেন, আসতে নেই নাকি!

বললুম : এখানে সংহিতার কথা থাক। মনকে একটু মুক্তি দিলে ভাল লাগবে।

স্বাতি হেসে বলল : ভূতের মুখে আজ রামনাম শুনছি যে!

রামনাম সত্য হ্যয়।

স্বাতি চমকে উঠেছিল। বলল: আরও অনেক সত্য কথা আছে। সে সব আজ থাক। এস, আজ আমরা কিছু হালকা কথা বলি।

স্বাতি লোকালয়ের দিকে না গিয়ে নির্জন পথের দিকে পা বাড়াল।

দুপুরের রৌদ্রেও এ পথ উত্তপ্ত হয়ে ওঠে নি। পাইন ও দেবদারু গাছের ফাঁকে ফাঁকে আলোছায়ার খেলা দেখছি। আর মন্দ বাতাসে সেই ছায়া অল্প অল্প দুলছে। আমরা নিঃশব্দে চলেছিলুম।

সহসা স্বাতি জিজ্ঞাসা করল: আচ্ছা গোপালদা, বড়দিনের সময় তুমি কলকাতা থেকে পালিয়ে গিয়েছিলে কেন?

বললুম: ধাক্কাটা সামলাতে পারি নি।

কিসের ধাক্কা?

তোমরা আমাকে উপহাস করেছিলে।

কেন এ কথা মনে করেছিলে?

বিয়ে করে তুমিও যে সব মেয়ের মতো সুখী হতে চাও, তা আমি জানি। তোমার বাবা মাও তাই চান; এবং বিশ্বাস করতে পার, আমিও অন্য কিছু চাই না।

তবে?

জো রায়কে বিয়ে করে তুমি সুখী হবে ভেবেছিলে, এ আমি বিশ্বাস করতে পারি নি।

কেন?

আমার মানুষ চেনার অহঙ্কার তাহলে মিথ্যা হয়ে যেত।

তাতে অপমান কিসের?

অপমান! আমার কাছে তোমরা সাহায্য চেয়েছিলে। জো রায়ের গলায় তুমি মালা দেবে, আর আমি তোমাদের সাহায্য করব!

স্বাতি মুখ টিপে টিপে হাসছিল।

আমি বললুম: হাসি দিয়ে কোন অপমান ভোলানো যায় না।

হঠাৎ আমার শীলার কথা মনে পড়ল। ডি. ভি. সি.র ইঞ্জিনিয়ার অনিমেষের স্ত্রী শীলা। সেও আমাকে অপমান করেছিল, কিন্তু সে অপমান আমি গায়ে মাখি নি। বললুম : কিছুদিন আগে তোমারই মতো একটি মেয়ে আমাকে তার বাড়ি থেকে বার করে দিয়েছিল। গলা ধাক্কা দেবার মতো করে। কিন্তু তাতে আমার একটুও অপমান হয় নি।

পরম বিস্ময়ে স্বাতি আমার মুখের দিকে তাকাল।

বললুম : আমার কাছে বোধহয় কখনও মেয়ের গল্প শোন নি। এও কোন কুমারী মেয়ের গল্প নয়, আমার এক ইঞ্জিনিয়ার বন্ধু অনিমেষের স্ত্রী শীলার গল্প। তারা মাইথনে থাকে। হঠাৎ একদিন চৌরঙ্গীতে দেখা হয়ে গিয়েছিল, তারপর তাদের সনির্বন্ধ অনুরোধেই তাদের কাছে বেড়াতে গিয়েছিলুম। তারা আমার যত্নের কোন ত্রুটি করে নি, মোটরে করে সমস্ত দামোদর পরিকল্পনা আমাকে দেখিয়েছিল—বোকারো কোনার তিলাইয়া, দেখিয়েছিল পরেশনাথ পাহাড় তোপচাঁচির লেক হাজারীবাগ ও রাঁচী। মাইথন ড্যামের উপর শীলা আমাকে গান শুনিয়েছিল, ফেরার পথে বাড়ি পৌঁছে নাচ দেখাতেও রাজী হয়েছিল। তারপর—

আমি থামতেই স্বাতি জিজ্ঞাসা করল : তারপর ?

তারপর সেই সত্য কথা, যা শুনে দিল্লীর মিত্রা তার নাক সিঁটকেছিল, আর স্বাতিরা আজও গোপালকে মানুষ ভাবল না।

স্বাতি কোন প্রশ্ন না করে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে পথ চলতে লাগল।

বললুম : সমস্ত দেখা শেষ করে আমরা মাইথনে ফিরছিলুম। সন্ধ্যা হতে দেরি ছিল না। ঠিক হয়েছিল যে রাতে ওদের বাড়িতে থেকে ভোরবেলায় কলকাতা ফিরব। অনিমেষ আমাকে আসানসোলে ট্রেন ধরিয়ে দেবে। এমনি সময় অনিমেষ জানতে চাইল আমি আজকাল কী করি। দিল্লীতে মিত্রাকে যা বলেছিলুম, তাকেও তাই

বললুম।—উত্তরপাড়ায় একখানা ভাড়াটে ঘর আছে, আছে নটা কুড়ির লোকাল। আর ডালহৌসী স্কোয়ারে সারি সারি টেবিলের মাঝখানে আছে একখানা কাঠের চেয়ার। অনিমেষের কথা মনে নেই, কিন্তু শীলার দু চোখে আমি ঘৃণা দেখেছিলুম। মুখে শুধু একটি কথা বলেছিল, কেরানী!

একটু দম নিয়ে বললুম: বাড়ি এসে অনিমেষকে সে বকেছিল, যাকে-তাকে বাড়ি এনে তুলবার জন্যে যা-তা বলেছিল। অনিমেষ শুধু বলেছিল, গোপাল আমাদের ক্লাসে সব চেয়ে ভাল ছেলে ছিল। পাশের ঘর থেকে আমি সব কথা শুনতে পেয়েছিলুম। আর এক মুহূর্ত তাদের বাড়িতে থাকি নি। আসানসোলে একটা জরুরী কাজ আছে বলে তখনি বেরিয়ে আসানসোলের বাস ধরেছিলুম।

একটু থেমে বললুম: এই ঘটনায় আমি একটুও অপমান বোধ করি নি। শুধু একটু দুঃখ পেয়েছিলুম। মানুষের আজ দাম নেই, দাম তার প্রতিষ্ঠার। জীবনে প্রতিষ্ঠা না থাকলে ধনী কোলা ব্যাঙও গরিব মানুষকে লাথি মেরে যাবে।

স্বাতির মুখের দিকে তাকিয়ে আমি অভিভূত হয়ে গেলুম। বেদনায় তার দু চোখ ছলছল করছে।

বিলম্ব হবে বলে আমরা আর এগোলুম না।

ফেরার পথে স্বাতি আমাকে জিজ্ঞাসা করল: তোমার এই কেরানীর চাকরি কবে ছাড়বে গোপালদা?

বললুম: যেদিন একটা সত্যি কথা বলবে।

কী কথা?

জো রায়কে বিয়ে করতে কেন রাজী হয়েছিলে?

স্বাতি বলল: সময় হলেই বলব।

আমিও এ চাকরি সময় হলেই ছাড়ব।

স্বাতি আমার দিকে তাকাল, আমি স্বাতির দিকে। তারপরে আমরা জোরে জোরে পা ফেলে ফিরতে লাগলুম।

১২

১৮২৩ খ্রীষ্টাব্দ। জনকয়েক বাঙালী ভদ্রলোক চাকরি নিয়ে সিমলায় এসেছেন। ভুবনমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, রামগতি সান্যাল, বৃন্দাবন হালদার, হরিশ্চন্দ্র রায়, গোবিন্দচন্দ্র হালদার ও আরও কয়েকজন। এঁরা কেউ নকশাবিদ, কেউ কেরানী। ইংরেজ সৈন্য বিভাগের তত্ত্বাবধানে এঁরা জরিপের কাজ করছেন।

সিমলা পাহাড়ে তখনও সিমলা শহর হয় নি। কিছু দিন আগেও নেপাল রাজার অধীনে এই অঞ্চল নিতান্ত অনাদৃত ছিল। তারপর ১৮১৪ খ্রীষ্টাব্দে হল গুর্খা যুদ্ধ। নেপালের রাজার সঙ্গে ইংরেজের লড়াই। নেপাল পরাজিত হল। ইংরেজকে সহায়তা করে পাতিয়ালার মহারাজা সিমলা পাহাড় উপহার পেলেন।

পাহাড় ইউরোপীয়দের বড় প্রিয়। গ্রীষ্মকালে তারা পাহাড়ে আশ্রয় খোঁজে। যে ইংরেজরা ভারতে বাস করত, তারা একে একে এ দেশের সমস্ত পাহাড়ী জনপদগুলি আবিষ্কার করেছিল। দু-একজন করে সিমলা পাহাড়েও এল, আবহাওয়া দেখে মুগ্ধ হল। এবং শেষ পর্যন্ত ইংরেজ সরকার এই সিমলাকে নিজের অধীনে নিয়ে নিল।

এখন যে বাড়িটা রেলওয়ে বোর্ডের পুরনো অফিস বলে পরিচিত, সেদিন বাঙালীদের আস্তানা ছিল সেইখানে। তাঁরা তাঁবুর ভিতর থাকতেন, আর কিছু উপরে একটা গুহার মধ্যে একজন সাধুকে দেখতে পেতেন। তান্ত্রিক সাধু, পূজা করতেন চণ্ডীর বিগ্রহ। সাধুর ব্যবহার ছিল অমায়িক, সকলের সঙ্গে সমান ভাবে মেলামেশা করতেন। লোকে তাঁর অলৌকিক কাজ দেখেছে, তন্ত্রশাস্ত্রে গভীর জ্ঞানেরও পরিচয় পেয়েছে। ভুবনবাবুরাও অবসর সময়ে তাঁর কাছে গিয়ে বসতেন। অনেকে তাঁকে বাঙালী বলেও মনে করতেন।

একদিন সাধু দেহরক্ষা করলেন। তাঁর বিগ্রহের পূজা বন্ধ হয়ে

গেল। নিজেদের মধ্যে পরামর্শ করে ভুবনবাবুরা বিগ্রহ সেবার ভার নিলেন, এবং সাধুর সেই গুহার পাশে একটি কাঠের মন্দির নির্মাণ করলেন।

কিন্তু চণ্ডী বাঙালীর প্রাণের দেবতা নয়, বাঙালী চণ্ডীপাঠ করে, কিন্তু চণ্ডীপূজা বাঙলায় জনপ্রিয় নয়। বাঙালীর প্রাণের দেবতা হলেন কালী। দুর্গাপূজা বৎসরে তিন দিন হয়, কিন্তু কালী প্রতিষ্ঠা করে বাঙালী সারা বৎসর শক্তির সাধনা করে। চণ্ডীর পাশে ভুবনবাবুরা কালীমূর্তি প্রতিষ্ঠা করলেন। কালো পাথরের কালীমূর্তি তাঁরা জয়পুর থেকে গড়িয়ে এনেছিলেন।

তারপর এই মন্দিরেই শ্যামলা দেবীর প্রতিষ্ঠা হল। সে এক অলৌকিক কাহিনী। জাখু পাহাড়ে একটি কুঁড়েঘরে এক সাধু বাস করতেন। তিনি পথিককে জল দান করতেন, আর পূজা করতেন শ্যামলা দেবীর। সেই জমি এক ইংরেজ ভদ্রলোক কিনে নিয়ে বাড়ি তৈরী করে ফেললেন। মূর্তিপূজার মর্ম তিনি বোঝেন না, তাই শ্যামলা দেবীর মূর্তিটি তিনি পাশের খাদে ফেলে দিলেন। বাগান ও বাড়ি তৈরি সম্পূর্ণ হয়ে গেলে তিনি তাঁর রথ্‌নে কাস্‌লে বাস করতে এলেন। বাড়ি তাঁর পছন্দ হল, কিন্তু রাতে ঘুমতে পারলেন না। স্বপ্ন দেখলেন যে রক্তবস্ত্র পরিহিত একদল অশ্বারোহী তাঁকে আক্রমণ করবার জন্য ছুটে আসছে। এক রাত দু রাত নয়, পর পর কয়েক রাত এই একই স্বপ্ন দেখবার পর আতঙ্কে সাহেব অস্থির হয়ে পড়লেন। শেষ পর্যন্ত সাহেব তাঁর এই স্বপ্নের কথা দু-একজনকে বললেন। তারা তখনই এই ঘটনা দেবীর কোপ বলে মনে করল। বলল, খাদের ভিতর থেকে দেবীকে উদ্ধার করে তাঁর পূজার ব্যবস্থা করা দরকার। সাহেব এক মুহূর্ত দ্বিধা না করে এই কাজের জন্য সমস্ত ব্যয় বহনে স্বীকৃত হলেন। রামচন্দ্র ব্রহ্মচারী নামে এক সাধু ও ভুবনমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় শ্যামলা দেবীকে অক্ষত অবস্থায় উদ্ধার করে কালীবাড়িতে প্রতিষ্ঠা করেন। এই ঘটনা ঘটেছিল ১৮৩৫

খ্রীষ্টাব্দে। খরচপত্র দিয়ে সাহেব তাঁর পাপের প্রায়শ্চিত্ত করবার পর শান্তিতে ঘুমতে পেরেছিলেন।

এই ঘটনার আট বৎসর পরে সিমলায় ভারত সরকারের গ্রীষ্মকালীন রাজধানী স্থাপিত হল। আরও অনেক বাঙালী এলেন এবং সবাই মিলে সেদিনের সেই কাঠের কালীমন্দিরটি ধীরে ধীরে আজকের এই বিরাট কালীবাড়িতে পরিণত করলেন। এই কাজে যাঁরা অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন, তাঁদের সম্বন্ধে কিছু জানা যাবে একটি সংক্ষিপ্ত পুস্তিকায়।

কালীবাড়ির দপ্তরে এক ভদ্রলোক সেই পুস্তিকাখানি মামার হাতে দিয়ে বলেছিলেন : মূল্য আট আনা মাত্র।

সিমলা কালীবাড়ির পরিচালক সমিতি কর্তৃক প্রকাশিত সিমলা কালীবাড়ি-পরিচয়। পরে আমি পড়ে দেখেছিলুম যে আমাদের সংগৃহীত সমস্ত সংবাদ সেই পুস্তিকাতেই আছে।

শহরের পূর্বপ্রান্তে আমাদের হোটেল। সামনের পথ ধরে আরও এগিয়ে গেলে ছোট সিমলা। সেখানেই পথের শেষ নয়। পথ গোটা জাখু পাহাড়টা বেষ্টন করে আছে। ছোট সিমলা থেকে সঞ্জৌলি, সেখান থেকে লক্কর বাজারের ভিতর দিয়ে রিজ। রিজ মানেই সিমলার হৃৎপিণ্ড। আমরা এই রিজে আসতে ডান দিকের পথ না ধরে বাম দিকে চলতে শুরু করেছিলুম।

আমাদের হোটেল মল রোডের উপর বললে একটু ভুল হবে। অল্প নিচে। মল রোড থেকে একটা রাস্তা বেরিয়ে নিচের দিকে গেছে। সেই রাস্তার উপর একটা গেট, আর একটা গেট মল রোডের উপরেই। হোটেলের বারান্দা থেকে কয়েক গজ উপরে উঠতে হয়। তারপর সামান্য উঁচু নিচু পথে রিজ পৌঁছতে হয়। বাম হাতে ক্লার্ক্স হোটেল, বিলিতি কায়দা। সৌখিন বড়লোকেরা থাকেন সেখানে। তারপর দুধারে দোকানপাট।

রিজ একটা উঁচু জায়গা। মল রোড থেকে আর একটি পথ

সেখানে উঠেছে, নেমেও গেছে পশ্চিম প্রান্তে। মল রোডের সঙ্গে আবার যেখানে মিলেছে সে জায়গায় নাম স্ক্যাণ্ডাল পয়েন্ট। সাহেবদের আমলে কী কেলেঙ্কারির জন্য এই নাম হয়েছিল জানি নে, স্বাধীন ভারতে তার নাম হয়েছে লালা লাজপৎ স্কোয়ার। এই রিজেরই পূর্ব দিক থেকে একটা রাস্তা জাখু পাহাড়ে উঠেছে, আর একটা রাস্তা লক্কর বাজারের ভিতর দিয়ে চলে গেছে সঞ্জৌলির দিকে। এই রাস্তাই ছোট সিমলার ভিতর দিয়ে জাখু পাহাড় বেষ্টন করে রিজে ফিরে এসেছে। রিজ থেকে উত্তরের বরফের পাহাড় দেখা যায়, দেখা যায় সঞ্জৌলি থেকেও। সিমলার এটি উত্তর দিক।

স্ক্যাণ্ডাল পয়েন্ট থেকে মল রোড একটু নেমে সোজা পশ্চিম দিকে চলে গেছে। আর একটা পথ উপরে কালীবাড়ির দিকে গেছে। এই পথের শেষেই কালীবাড়ি। তার পাশ দিয়ে সরু রাস্তা নেমে মল রোডের সঙ্গে মিশেছে। কালীবাড়ির বিরাট বাস-ভবনের ভিত্তিটা মল রোডে, সেখান থেকেই ধাপে ধাপে সিঁড়ি ভেঙ্গে মন্দিরে আসা যায়।

বিকেলবেলায় চা খেয়েই আমরা বেরিয়ে পড়েছিলুম। হোটেলের একটি লোক বাজারে যাবে। ম্যানেজার তাকে আমাদের সঙ্গে দিয়েছিলেন। বলেছিলেন, রিজে পৌঁছে দিয়ে কালীবাড়ির পথ বাতলে দেবে।

রিজে পৌঁছবার আগেই একটা রাস্তা বামদিকে নেমে গেছে। সেইটেই বাজারের রাস্তা। শাকসব্জী মাছমাংসের বাজার। অন্য সব জিনিসও আছে। মল রোডে যে বাজার, তা সৌখিন জিনিসের। বাহিরের যাত্রীরা সেখানে কেনাকাটা করে।

আমি লোকটাকে জিজ্ঞাসা করেছিলুম: তবে তো তোমাকে আবার এই পথেই ফিরতে হবে?

সে বলেছিল: না রিজের নিচে যে মল রোড, সেখান থেকে বাজারে নামবার সিঁড়ি আছে।

আরও বলেছিল : সিমলায় রাস্তার অভাব নেই। বাজারে যাবার যত পথ, স্টেশনে যাবারও পথ তত। আপনারা আমাদের হোটেলের পাশ দিয়ে উঠেছেন। ইচ্ছে করলে কালীবাড়ির নিচেও পৌঁছতে পারতেন। চাই কি, সরাসরি ছোট সিমলায় চলে যান না।

লোকটা রিজের উপরে এসে আমাদের সব কিছু চিনিয়ে দিল। যা দেখা গেল তা তো চিনিয়ে দিলই, যা দেখা গেল না তাও বলে দিল : এই গির্জা, পাশ দিয়ে এই রাস্তা উঠেছে জাখু পাহাড়। কাল ভোরবেলায় উঠবেন। ঐ রাস্তা গেছে লক্কর বাজার। ভাল লাঠি আর কাঠের জিনিস পাবেন লক্কর বাজারে। তিব্বতীদেরও একটা দোকান আছে। সিনেমা আছে। তারপর সঞ্জৌলি। আপনারা কালীবাড়ি যাবেন তো? সোজা এই রাস্তা ধরে চলে যান। পথের শেষ যেখানে, সেইখানেই কালীবাড়ি। রাস্তা থেকেই ডান দিকে অ্যানানডেল দেখে নেবেন।

অ্যানানডেল আবার কী?

ঘোড়দৌড়ের মাঠ। সিমলার যত খেলাধুলো সেইখানেই হয়।

হিন্দীতে কথাবার্তা বলতে মামার কষ্ট হয়। কোন রকমে জিজ্ঞাসা করলেন : পাহাড়ে গড়িয়ে পড়ে না?

ঘোড়া, মানুষ, না বলের কথা জিজ্ঞাসা করলেন, বোঝা গেল না। লোকটা সহজ ভাবে উত্তর দিল : গড়িয়ে পড়বে কেন! একেবারে সমতল জায়গা। রাস্তা থেকেই দেখতে পাবেন, অনেক নিচে একটা গোল মাঠের মতো, তার কোন দিকে খাদ দেখতে পাবেন না। কিন্তু তার নিচেও একটা সুন্দর জায়গা আছে। তার নাম গ্লেন। সেখানে আপনারা পিকনিক করতে যাবেন।

হঠাৎ লোকটির বাজার করার কথা মনে পড়ল। বলল : যাই এবারে, আমার দেরি হয়ে যাচ্ছে।

হোটেলের লোকটি চলে যাবার পর আমরা চারিধার ভাল করে দেখলুম। বিরাট প্রশস্ত জায়গাটিতে বহু লোক যাতায়াত করছে।

সমতল শান বাঁধানো জায়গা। উত্তর দিকে রেলিঙের ধারে সারি সারি বেঞ্চ। অনেকগুলি উঁচু বেঞ্চও আছে। অনেক মেয়ে পুরুষ এই বেঞ্চে বসে গল্প করছেন। বরফের পাহাড় এখন দেখা যাচ্ছে না, আকাশ নির্মেঘ হলে দেখা যাবে।

এখানে দাঁড়িয়ে সময় নষ্ট করতে মামীর ভাল লাগছিল না। কথা না বলে তিনি সামনের দিকে হাঁটতে লাগলেন। আমরাও তাঁকে অনুসরণ করলুম।

ব্যাণ্ড স্ট্যাণ্ডকে বাম হাতে রেখে বন্ধ টুরিস্ট অফিস ডান হাতে ফেলে আমরা স্ক্যাণ্ডাল পয়েন্ট ছাড়িয়ে গেলুম। পোস্ট অফিসে আমরা দাঁড়ালুম না। গ্র্যাণ্ড হোটেলের নিচে দিয়ে এগিয়ে আমরা কালী-বাড়ির দরজাতেই পৌঁছে গেলুম।

সিমলার কালীবাড়ি বর্তমানে একটি বিরাট প্রতিষ্ঠান। বাঙালী সমাজের গৌরবের জিনিস। মন্দিরে শুধু বাঙালী নয়, সকল প্রদেশের যাত্রী নিয়মিত যাতায়াত করছে। কালী মুখ্যত বাঙালীর দেবতা, কিন্তু শ্যামলা দেবী জাগ্রত পার্বত্য দেবতা। তাঁর আকর্ষণ সর্বজনীন। শ্যামলা দেবীর নামেই সিমলা নাম। সিমলার কালীবাড়ি তাই সকল মানুষের তীর্থস্থান হয়েছে।

মন্দির দর্শনের পর আমাদের এই বিরাট প্রতিষ্ঠানের সম্বন্ধে কিছু ধারণা হল। বিরাট এক নূতন অট্টালিকায় অসংখ্য ঘর যাত্রীদের জন্য নির্ধারিত হয়েছে। সামান্য ভাড়ায় থাকবার অনুমতি পাওয়া যায়। নিরামিষ আহারের ব্যবস্থাও আছে। একটি বিরাট হলে সভা হয়, উৎসবে নাটক ও বিচিত্রানুষ্ঠান। বাঙালীদের একটি ক্লাব ও গ্রন্থাগার আছে। আসন্ন দুর্গাপূজার জন্য এখন ব্যাপক ব্যবস্থা হচ্ছে।

সম্পাদকের দপ্তরে কিছু অনুসন্ধানের পর সিমলার পরিচয় পুস্তিকা হাতে আমরা বেরিয়ে এলুম। সিমলার পথ তখন অন্ধকার। চারি দিকে বাতি জ্বলছে।

মামী বললেন : কাল সকালে আমরা পূজো দিতে আসব।

সম্পাদকের দপ্তরে বসে মামা পাইপ ধরিয়েছিলেন। মুখ থেকে সেই পাইপ সরিয়ে বললেন : আচ্ছা।

আচ্ছা নয়, আমি আজই তোমাকে কাজের কথাটা জানিয়ে রাখলাম।

মামা বললেন : আচ্ছা নয় তো কি না বলব ?

মামী বললেন : তোমার এই আচ্ছা কথাটি আমার মোটেই পছন্দ নয়। এটি তোমার এড়িয়ে যাবার কথা। কোন কাজ মনঃপূত না হলেই তুমি আচ্ছা বল দেখেছি।

বিপদের কথা !

বলে মামা আমার মুখের দিকে তাকালেন।

মামী বললেন : বিপদের কথাই তো। রাতে হয়তো ব্যবস্থা করবে, ভোরবেলায় তোমরা বরফ দেখতে জাখু পাহাড়ের চূড়োয় উঠবে।

মামা বললেন : তুমি নিশ্চিন্ত থাকতে পার, ভোরবেলায় আমরা লেপের তলা থেকে বেরব না।

এই কথা বলেই মামা আমার দিকে তাকালেন। বললেন : দেখেছ, বয়স যে বেড়েছে তাতে সন্দেহ নেই।

কেন ?

গোপালকে এই ঠাণ্ডার দেশে ধরে আনলুম, অথচ ওর জন্যে কোন ব্যবস্থা এখনও করা হল না।

ব্যস্ত ভাবে আমি বললুম : ব্যবস্থা আবার কী করবেন ?

মামা বললেন : সে তুমি কী বুঝবে !

তারপর স্বাতির দিকে চেয়ে বললেন : একটু নজর রাখিস তো মা, একটা ভাল দোকান দেখে ঢুকে পড়তে হবে।

মামী বললেন : শাল আমার সঙ্গে আরও একখানা আছে।

না না, শুধু শালে শানাবে না। দিনে দিনে শীত তো বাড়বে, একটা গরম কোট থাকা দরকার। তার ওপরে শাল।

আমি ভয় পেলুম। বললুম: রক্ষে করুন, গরম জামা আমি গায়ে দিতে পারি নে। এইটেই যথেষ্ট।

চাওলার দেওয়া জ্যাকেট আমার গায়ে ছিল। সেটার দিকে নজর দিয়েই মামা ক্ষেপে উঠলেন, বললেন: আমি কিছু দিতে চাইলে তুমি নেবে কেন! তুমি নেবে বন্ধুর উপহার।

কাতর ভাবে আমি বললুম: না না, আমি তা বলছি না।

বলছি না মানে, আমি কিছু বুঝি না ভাব! আমার কাছে কিছু নিতে তোমার মান যায়, এই তো!

স্বাতি আমার অবস্থা দেখে হাসছিল। আমার রাগ হল তারই উপর। বললুম: তুমি কেন গরম কোট গায়ে দাও নি?

স্বাতি স্বচ্ছন্দে বলল: আমার ইচ্ছে।

কিন্তু মামাকে আমি এ রকম উত্তর দিতে পারি নে। বললুম: তার চেয়ে সত্যি কথাটাই বল না যে তোমার শীত করে না।

স্বাতি বলল: শীত না করলে কী, ইচ্ছে হলেই গায়ে দেব।

মামা বললেন: ঠিক কথা।

বললুম: ঠিক কথা তো নয়, বিপদের কথা।

শেষ পর্যন্ত মামী একটা রফা করলেন, বললেন: ও যখন কোট গায়ে দিতে চায় না, তখন কোট থাক। ভাল একখানা গায়ের কাপড় কিনে দাও।

খানিকটা আশ্বাস পেয়ে আমি বললুম: সেই ভাল। আমরা তো কাশ্মীরে যাচ্ছি, সেখানেই একখানা তুস কিনব।

বলেই একটা গল্প শুরু করলুম: আমার এক বন্ধু রেলে কাজ করে। গত বছর রেলের খরচে তারা কাশ্মীরে গিয়েছিল। বিশ ত্রিশ টাকা জমা দিয়ে নাকি পনর কুড়ি দিন বেড়ানো যায়।

মামা সন্দেহের চোখে আমার মুখের দিকে তাকালেন।

আমি বললুম: তার শখ ছিল একখানা কাশ্মীরী তুস কিনবার। টাকা তিরিশে যা পাওয়া যায়, তাই কিনবে। একটা বড় দোকানে

ঢুকে জিজ্ঞেস করল, তুস আছে? দোকানদার জিজ্ঞেস করল, শাহ তুস? কিছু না বুঝেই সে বলল, হুঁ। দোকানদার একখানা তুস সামনে ফেলে দিল। বন্ধুটি নেড়েচেড়ে দেখে ভারি খুশী। যেমন মোলায়েম তেমনি গরম। রঙটি ধূসর, ঠিক পছন্দ মতো। ভাবল, দু পাঁচ টাকা বেশি লাগলেও এটি নেবে। জিজ্ঞেস করল, দাম কত? দাম সস্তা, মাত্র বারো শো। দামের ধাক্কাতেই সে পড়ে যেত, কোন রকমে সামলে নিল। তাকে বিক্রি করলেও বারো শো টাকা হবে না। দোকানদার জিজ্ঞেস করল, কেন পছন্দ হল না? গম্ভীর ভাবে বন্ধুটি বলল, এর চেয়ে ভাল জিনিস নেই? থাকবে না কেন! বন্ধুটির তখন হার্টফেল করার ব্যবস্থা। রক্ষা পেল পরের কথাটি শুনে।—তবে এখানে নেই। আমাদের হেড অফিসে পাবেন, টুরিস্ট অফিসের কাছে। টুরিস্ট অফিস দেখেছেন তো? দেখেছি বৈকি। বলে বেচারা পালিয়ে আত্মরক্ষা করেছিল।

গল্প শুনে মামা অট্টহাস্য করে উঠলেন।

আর স্বাতি বলল: এই যে বাবা, এই একটা কাশ্মীরী দোকান।

স্বাতির কথা শুনে আমার গা জ্বলে গেল; কিন্তু আমি তাদের বাধা দিতে পারলুম না। নিজের অজ্ঞাতসারেই আমার পকেটের ভিতর হাত গিয়েছিল। স্বাতি তা লক্ষ্য করে হাসল। এমন কৌতুকে ভরা দৃষ্টি তার আগে দেখি নি। একটা বছরেই সে অনেক বদলে গেছে। আমি তাকে ভর্ৎসনা করলুম। সে কথায় নয়, সে আমার দৃষ্টি দিয়ে। কিন্তু বুকের ভিতর আমি একটা বেদনা অনুভব করলুম। অর্থসামর্থ্য থাকলে আমি আজ নিশ্চয়ই বিদ্রোহ করতুম।

১৩

হোটেলে ফিরে মামা কফির অর্ডার দিলেন। আমি আমার নতুন তুস গায়ে জড়িয়ে স্তব্ধ হয়ে বসে রইলুম। ভেবেছিলুম, এই তুস আমি গায়ে দিতে পারব না, গা আমার জ্বালা করবে। কিন্তু তা করল না। যে উত্তাপ পাচ্ছি, তাতে জ্বালা নেই, আছে একটা স্নেহের স্পর্শ। স্বাতিও একখানা নতুন জামেওয়ার শাল গায়ে জড়িয়ে বসেছে। মামা তাকেও একখানা কিনে দিয়েছেন।

দোকানে আমার শাল পছন্দ হয় নি। আমার মুখের দিকে চেয়ে মামা বলেছিলেন : তুস দেখাও। আর এই মেয়েটার জন্যেও একখানা।

বাধা দেবার চেষ্টা করে মামী বলেছিলেন : স্বাতির জন্যে কী দরকার। ও তো এ সব পছন্দই করে না।

মামা এ কথার উত্তর দেন নি। কিন্তু কিনে দিলেন দুজনকেই। স্বাতিকে বললেন : দেখি, কেমন মানিয়েছে তোমাকে।

আমার তুসখানা দোকানদার প্যাকেট করে বেঁধে দিতে যাচ্ছিল। মামা বললেন : না না, বাঁধতে হবে না। ওখানা তুমি গায়ে জড়িয়ে নাও।

বলে নিজেই আমার গায়ে জড়িয়ে দিলেন।

হোটেলের ড্রয়িংরুমে বসে আমার আর এক দিনের কথা মনে পড়ল। বছর দুই আগে আমি এই পরিবারের সঙ্গে প্রথম বেড়াতে বেরিয়েছিলুম। সেদিন আমি তাঁদের চাকরের অভাব পূর্ণ করতে সঙ্গে যাচ্ছিলুম। মামী আমাকে একটা চাদর ও বালিশ এগিয়ে দিয়েছিলেন। প্রয়োজন হবে না বলে আমি তা নিই নি। একখানা তৃতীয় শ্রেণীর কামরায় উঠবার সময় মনে পড়েছিল যে হাতের খবরের কাগজখানা তাঁদের গাড়িতে ফেলে এসেছি। সেখানা আনবার জন্যে ফিরে গিয়ে থমকে দাঁড়িয়েছিলুম। মামা গম্ভীর

স্বরে মামীকে উপদেশ দিচ্ছিলেন : বেশি লাই দিয়ো না এদের। খরচা করে নিয়ে যাচ্ছি, সেই যথেষ্ট।

এই মন্তব্য শুনে আমি একটুও বিস্মিত হই নি, দুঃখিত হই নি এতটুকু। এই উপেক্ষাই তো আমাদের প্রাপ্য। একদা উচ্চ বর্ণের মানুষ ঘৃণা করেছে নিম্ন বর্ণের মানুষকে, তারপর রাজার জাত ঘৃণা করেছে প্রজার জাতকে। স্বাধীন ভারতে ধনী দরিদ্রকে ঘৃণা করবে, এতে আশ্চর্য হবার আর কী আছে!

আমি আশ্চর্য হয়েছি আজ। আজ মামা আমার সঙ্গে যে ব্যবহার করলেন, এ যেন আশাতীত। বাহিরের গাম্ভীর্য দিয়ে ঢেকেছেন অন্তরের গভীর স্নেহ। তবু সবটুকু ঢাকতে পারেন নি। আমার কাছে ধরা পড়ে গেছেন।

আমি অন্য কথা ভাবছিলুম। মামার এই পরিবর্তন কেন এল, সেইটেই ভাববার কথা। দীর্ঘ দিন এক সঙ্গে ভ্রমণ করে কি তিনি তাঁর মত বদলে ফেলেছেন! কিন্তু দেশে তো কোন পরিবর্তন আসে নি! ধনী তো দরিদ্রকে আজও ভালবাসে না, দরিদ্রের দুঃখে তো ধনীর প্রাণ আজও কাঁদে না! দেশের জন্যেই বা কার প্রাণ কাঁদে!

স্বাতির দিকে সহসা আমার দৃষ্টি পড়ল। দেওয়ালের দিকে তাকিয়ে সে হাসছে। এ হাসি যে আমাকে লক্ষ্য করে, তা বুঝতে পারি। কিন্তু উত্তর দেবার উপায় নেই। কিছু বলতে গেলেই মামার কাছে ধরা পড়ে যাব, মামী অসন্তুষ্ট হবেন। স্বাতির সঙ্গে দূরত্ব রক্ষা করে চলতে পারলেই তিনি খুশী থাকেন। আমি নীরব থেকে স্বাতির হাসিকে উপেক্ষা করলুম।

মামা বললেন : গোপাল বুঝি এবারে কোন কাজ খুঁজে পাচ্ছ না?

মেনে নিয়ে বললুম : এবারে তো কাজের ভার স্বাতির ওপর।

মামা পাইপ ধরিয়েছিলেন, মুখে বেশ খানিকটা ধোঁয়া নিয়ে বললেন : তোমার এই বেকার অবস্থা দেখে দুঃখ হচ্ছে।

এর পরে তো সত্যিকার বেকার হতে হবে।

মানে ?

এবারে ফিরে গিয়ে আর অফিসে ঢুকতে পাব না, দরজাতেই দরোয়ান গলা ধাক্কা দেবে।

স্বাতি হেসে উঠল, বলল : আমরা ছবি তুলতে যাব বাবা।

মামা এই হাসিতে যোগ দিলেন না। গম্ভীর মুখে বললেন : তোমাকে নিয়ে কি যে করি, বুঝতে পারি না।

হাসতে হাসতেই স্বাতি বলল : ফ্রেমে বাঁধিয়ে দেওয়ালে টাঙাবে।

তারপর গুনগুন করে যে সুর ধরল, তার কথাগুলি আমার জানা।—তুমি কি কেবলই ছবি, শুধু পটে লিখা।

এবারেও মামা হাসলেন না, চিন্তায় নিমগ্ন হয়ে রইলেন।

মামী ঘরে নেই, হাত-পা ধুয়ে তিনি আহ্নিকে বসবেন বলে গেছেন। মামাও বসবেন, তবে এক পেয়ালা কফি খাবার পর। তাঁকে অন্যমনস্ক দেখে আমি বললুম : যা ফেলে দেবার জিনিস, তা অকারণে কেন বাঁধিয়ে রাখবে ?

স্বাতি বলল : ছবি যে অনেকে ভালবাসে।

মামা যে অন্যমনস্ক, স্বাতি নিজেও তা লক্ষ্য করেছে। সে কথা বুঝতে পারলুম তার দৃষ্টিতে কৌতুক দেখে। বললুম : সে ভাল শিল্পীর আঁকা ছবি, কষ্ট করে তাকে বাঁধাতে হয় না, বাঁধানোই পাওয়া যায়।

ইতিমধ্যে বেয়ারা এসে টেবিলের উপর কফির সরঞ্জাম রেখেছিল। পেয়ালার শব্দে মামা জেগে উঠে জিজ্ঞাসা করলেন : কী পাওয়া যায় ?

স্বাতি এগিয়ে এসে কফি ঢালতে বসেছিল। কোন উত্তর দিল না।

আমি বললুম : স্বাতি ঘরে ছবি টাঙাবার কথা বলছিল। আমি বললুম, বাজে ছবি কিনে কাচে বাঁধিয়ে রাখবার তো কোন মানে হয় না, একজিবিশন থেকে ভাল আর্টিস্টের ছবি কিনতে পাওয়া যায়।

মামা বললেন : ভাল আর্টিস্টের ছবি সব সময় ভাল হয় না।

অন্তত আমি তো অনেক আর্টিস্টের ছবির মানেই বুঝি না। তার চেয়ে যা বোঝা যায়, তাই ভাল। হোক সে বাজে আর্টিস্টের আঁকা সাধারণ ছবি।

স্বাতি সকৌতুকে বলল : দেখলে তো, আমার কথা ঠিক কিনা।

তারপরেই এক পেয়ালা কফি মামার দিকে এগিয়ে দিল।

আমি বললুম : ছবির কথা ছেড়ে এখন সিমলার কথা বল। এখানে কত দিন থাকবে ?

এক পেয়ালা কফি আমার দিকে এগিয়ে দিয়ে স্বাতি বলল : যত দিন ভাল লাগে ঠিক তত দিন। ভাল না লাগলে আর একটা দিনও আমরা থাকব না।

মামা বললেন : সর্বনেশে কথা !

কেন ?

এ জায়গা খারাপ লাগার তো কারণ এখনও দেখছি নে। তাহলে কি চিরকাল আমাদের এখানেই থাকতে হবে !

আমি বললুম : আশেপাশের দ্রষ্টব্য স্থানগুলো দেখাতে বোধহয় আপত্তি হবে না।

গম্ভীর ভাবে স্বাতি বলল : সেই কথাই ভাবছি।

স্বাতিকে কোন কথা না বলে আমি মামাকে বললুম : ইচ্ছা করলে আমরা এইখান থেকেই কুলু যেতে পারি।

মামা আশ্চর্য হয়ে বললেন : কী করে ?

বললুম : এখান থেকে মণ্ডি পর্যন্ত হিমাচল প্রদেশের বাস যাতায়াত করে। আর মণ্ডি হল কাঙ্গড়া থেকে কুলু যাবার পথে। যারা হাঁটতে পারে, তারা জালোরি পাস কিংবা বাশলেও পাস হয়ে কুলু যাবে। ইচ্ছে থাকলে হেঁটে মসুরিও যাওয়া যায়।

স্বাতি বলল : যাওয়া যাবে না কেন ? লোকে হেঁটে কৈলাস যাচ্ছে, মাউণ্ট এভারেস্টে উঠছে, আর সিমলা থেকে মসুরি যেতে পারবে না !

বললুম : ঠিকই বলেছ। সিমলা থেকে তিব্বতের সীমান্ত পর্যন্ত যাওয়া যায়।

স্বাতি বলল : আমিও তো তাই বলছি। রামচন্দ্রের বাহিনী সমুদ্র বন্ধন করে লঙ্কায় গিয়েছিল। আর তুমি পাহাড় ডিঙিয়ে তিব্বতে যাবে, এতে আশ্চর্য হবার কী আছে!

স্বাতির মন্তব্য শুনে মামা হাসলেন।

আমি বললুম : তোমার গাইড বইগুলি কোথায়?

কফির পেয়ালা নামিয়ে রেখে স্বাতি একগোছা বই আমার দিকে এগিয়ে দিল। আমি একখানা বই খুলে শেষের দিকের পাতা থেকে পড়ে শোনালুম : জালোরি পাস হয়ে সিমলা থেকে কুলু এক শো একুশ মাইল। সিমলা থেকে নারকাণ্ডা উনচল্লিশ মাইল, আর জালোরি পাস দশ হাজার ফুট উঁচু। পথে আটটা ডাকবাংলো ও রেস্টহাউস আছে।

মামা বললেন : তবে তো অনেক লোক যাতায়াত করে!

আমি এ কথার উত্তর দিলুম না। বললুম : বাশলেও পাস হয়ে কুলু এক শো উনচল্লিশ মাইল। নারকাণ্ডা থেকে এ পথ একটু ঘুরে গেছে। তবে কুলু পৌঁছবার বিয়াল্লিশ মাইল আগে বাঁজার বলে একটা জায়গায় আগের রাস্তার সঙ্গে মিলেছে। বাশলেও পাস জালোরির চেয়ে সাড়ে সাত শো ফুট বেশি উঁচু। আর এ পথেও রেস্টহাউস আছে গোটা দশেক।

পরের পাতায় হিন্দুস্থান-টিবেট রোড। বললুম : সিমলা থেকে তিব্বত সীমান্তের শিপ্‌কি দু শো তিন মাইল। পথ গেছে কুফ্‌রির উপর দিয়ে। অসংখ্য রেস্টহাউস আর ডাকবাংলো।

স্বাতি বলল : কুফ্‌রি নামটা শোনা মনে হচ্ছে!

বললুম : কুফ্‌রি আর চিনিবাংলোর ছবি নিশ্চয়ই দেখেছ। পিকনিকের দুটো চমৎকার জায়গা।

বাধা দিয়ে মামা বললেন : পিকনিকের ব্যবস্থা স্বাতি করবে। তুমি আর একটা কোন্ রাস্তার কথা বলছিলে?

আমি স্বাতির দিকে তাকিয়ে একটু হাসলুম। তারপর বললুম : সিমলা থেকে মসুরির রাস্তা এক শো একান্ন মাইল। তবে চক্রাতা থেকে মসুরি একুশ মাইল রাস্তা হাঁটতে হবে না। হিন্দুস্থান-টিবেট রোড ধরে খানিকটা যাবার পরে উত্তরে কুলু বা তিব্বতের দিকে নয়, প্রথমে পশ্চিমে ও পরে দক্ষিণে চলতে হবে। এই রাস্তার ওপরেও থাকবার জায়গার অভাব নেই।

স্বাতি জিজ্ঞাসা করল : এ সব পথে কারা যাতায়াত করে ?

যাদের প্রয়োজন তারাই করে। আর—

আর কে ?

দু একজন পাগল, যাদের পথ চলাতেই আনন্দ।

মামা গম্ভীর ভাবে বললেন : কথাটা মিথ্যে নয়। আমরাও যখন গঙ্গাযমুনার উৎস দেখতে বেরিয়েছিলুম, তখন পথ চলে কম আনন্দ পাই নি। প্রাকৃতিক সৌন্দর্য দেখে পথশ্রম লাঘব হত।

ঠিক এই সময় বাহিরের দরজায় কে টোকা দিল।

স্বাতি বলল : বোধহয় বেয়ারা এসেছে পেয়ালা নিতে।

মামা হাঁক দিলেন : কাম ইন।

কিন্তু দরজা খুলে কেউ ভিতরে এল না।

আবার যখন টোকা পড়ল, আমি উঠে গেলুম। দরজা খুলে বারান্দায় এক অপরিচিত ভদ্রলোককে দেখতে পেলুম। সাহেবী পোশাক পরা মাঝবয়সী ভদ্রলোক, মাথায় কাঁচাপাকা চুল, মুখে উদ্বেগ। বললেন : আমি গোপালবাবুর সঙ্গে দেখা করতে এসেছি।

আমি বিস্ময়ে অভিভূত হলুম। সিমলায় কেউ আমার খোঁজ করবে, এ কথা বিশ্বাস করতে কষ্ট হচ্ছিল। তবু বললুম : গোপাল আমার নাম।

ভদ্রলোক যেন আকাশের চাঁদ হাতে পেলেন, এমনই ভাবে বলে উঠলেন : বুঝতেই পারছেন আমার কী সৌভাগ্য !

বলতে বলতেই ঘরের ভিতর ঢুকে পড়লেন। তারপর মামা ও স্বাতিকে দেখে খানিকটা ইতস্তত করলেন।

আমি পরিচয় করিয়ে দিলুম : আমার মামা, আর—

ভদ্রলোক নমস্কার করে বললেন : পরিচয় আমার জানা আছে, বুঝতেই পারছেন। বরং আমার পরিচয়টাই আপনাকে দিই।

আমি হাত বাড়িয়ে তাঁকে বসবার জন্য অনুরোধ করেছিলুম। ভদ্রলোক একখানা চেয়ারে বসে বললেন : আমাকে আপনারা চিনবেন না, তবে বুঝতেই পারছেন, আমি আপনার একজন অন্ধ ভক্ত।

বলে আমার দিকে তাকালেন। স্বাতিও আমার দিকে সকৌতুকে তাকাল।

ভদ্রলোক বললেন : অফিসে আমার একটা নাম আছে বটে, কিন্তু সিমলার বাঙালীরা আমাকে রায়বাহাদুর বলেই চেনে। বুঝতেই পারছেন, কলকাতায় আমার বাবা রায়বাহাদুর ছিলেন। সেই কথা লোকে আজও ভোলে নি।

বলে হাসতে লাগলেন।

আমি জিজ্ঞাসা করলুম : আমার খবর আপনি কোথায় পেলেন ?

খবর আর কে দেবে ! বুঝতেই পারছেন, খুঁজে বার করলুম। কাল দুপুরের ট্রেনে আপনার প্রকাশক আসছেন, তাঁকেও একটা সারপ্রাইজ দেব ভাবছি।

ভদ্রলোক ক্রমাগতই রহস্যময় হচ্ছেন।

কফির সরঞ্জাম নিতে বেয়ারা এসেছিল। মামা বললেন : আর এক পেয়ালা।

এই হুকুম শুনে ভদ্রলোক এলিয়ে বসলেন। বললেন : আমার এক বন্ধু আপনাকে দেখেই সন্দেহ করেছিল। নামটাও বোধহয় শুনেছিল। একটু আগে আপনারা কালাবাড়ি গিয়েছিলেন তো ?

হ্যাঁ।

আমি ছিলুম না। এসেই গল্পটা শুনলুম। বললুম, কুছ পরোয়া নেই। কোন হোটেলে নিশ্চয়ই উঠেছেন, খুঁজে আমি বার করবই।

মামা আশ্চর্য হয়ে বললেন: সিমলার সব হোটেলে আপনি খুঁজলেন?

তাতে কী হয়েছে! খুঁজে পেয়েছি তো।

স্বাতি অস্ফুট স্বরে বলল: আশ্চর্য!

রায়বাহাদুর এই মন্তব্য শুনে সগর্বে হাসলেন।

আমি জিজ্ঞাসা করলুম: প্রকাশকের কী কথা আপনি বললেন?

তিনিও সপরিবারে আসছেন। পুরনো বন্ধু। লিখেছেন একটা ব্যবস্থা করে রাখতে। ভাবছি—

এই হোটেলেই কি তুলবেন ভাবছেন?

আমার বাড়িতে জায়গা থাকলে হোটেলের কথা ভাবতুম না।

আমি বললুম: দেশী হোটেল তাঁর বোধহয় পছন্দ হবে না, তাঁকে কোন বিলেতি হোটেলে তুলবেন।

সে কোন ভাবনার কথা নয়, ভাবছি আপনার কথা। বুঝতেই পারছেন, সিমলার সব বাঙালী আপনার সঙ্গে পরিচিত হতে চাইবে। তার কী ব্যবস্থা করি।

মামা জিজ্ঞাসা করলেন: গোপালকে সবাই জানে নাকি?

জানে না! আলবত জানে। আমি ফিরে গেলেই আমাকে সবাই চেপে ধরবে। কোথায় দেখা হবে, কবে দেখা হবে—

হঠাৎ খুশী হয়ে বললেন: আইডিয়া। আপনি আমাকে একটা দিন সময় দিন, আমাদের ক্লাবে আপনার সম্বর্ধনার আয়োজন করি।

ভয়ে ভয়ে আমি বললুম: সর্বনাশ!

সর্বনাশ কিসের! আপনার সুবিধা মতোই আমরা আয়োজন করব।

কফি এল। ভদ্রলোক কফি খেয়ে উঠলেন। বলে গেলেন: এই কথাই রইল। কাল আপনার প্রকাশককে নিয়ে আসব।

বুঝতেই পারছেন, তাঁকেও একটা সারপ্রাইজ দেওয়া হবে। সারপ্রাইজই তো জীবন!

ভদ্রলোককে আমি হোটেলের দরজা পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে এলুম।

ফিরে এসে মামীর প্রশ্ন শুনলুম : কে এসেছিল?

গম্ভীর ভাবে মামা বললেন : গোপালের এক ভক্ত।

এখানে আবার ভক্ত জুটল কী করে?

তুমি একখানা ভাল বই লেখ, দেশের সর্বত্র তোমার ভক্ত জুটবে।

স্বাতি বলল : আমি হলপ করে বলতে পারি, ও ভদ্রলোক গোপালদার কোন বই পড়েন নি।

তবে?

ঐ যে তাঁর এক বন্ধুর কথা বললেন, তিনি পড়েছেন।

মামা বললেন : না পড়েই এই!

আমি বললুম : পড়লে এ রকম উৎসাহ থাকত না।

স্বাতি বলল : তার প্রমাণ সেই ভদ্রলোক। তিনি সন্দেহ করেছেন, কিন্তু কোন কৌতূহল প্রকাশ করেন নি।

আমি বললুম : ঠিক কথা।

কিন্তু মামা এ কথা সমর্থন করলেন না।

১৪

মামীর কথাই ঠিক। রাতে ডিনার খেতে খেতে স্বাতি বলল : কাল কখন কালীবাড়ি যাবে ?

উত্তর মামী দিলেন, বললেন : স্নান আহ্নিক সেরে যাব।

সে তো দশটার আগে নয়।

হলই বা দশটা।

স্বাতি বলল : অত বেলা পর্যন্ত হোটেলে বসে আমরা করব কী! আবার হয়তো গোপালদার ভক্ত এসে জুটবেন।

মামা জিজ্ঞাসা করলেন : মতলবটা কী ?

স্বাতি বলল : চল না, জাখু পাহাড়টা দেখে আসা যাক। সিমলার একটা দিন তাহলে সংক্ষেপ হবে।

মামী বললেন : দেখলে তো, আমি এই ভয়ই পেয়েছিলাম।

এ কথার উত্তর না দিয়ে মামা বললেন : পাহাড়ের মাথায় কী আছে দেখবার ?

মামী ক্ষেপে উঠলেন : তুমিও মেয়ের কথায় সায় দিচ্ছ নাকি!

কিন্তু স্বাতি তার আগেই বলল : রামের মন্দির, আর কিছু বাঁদর।

মামা দুজনকেই উত্তর দিলেন : সায় আর দিচ্ছি কোথায়! আমরা কি আর ঐ পাহাড়ে উঠতে পারব!

স্বাতি বলল : হেঁটে উঠবে কেন, রিক্‌শ তো অনেক দূর পর্যন্ত ওঠে।

বাকি পথ ?

মামা হাসবার চেষ্টা করলেন।

আমি বললুম : কাল থাক, আমরা বরং পরশু চেষ্টা করব।

মামা বললেন : আমাদের আশা ছেড়ে তোমরা দুজনে ওঠ।

মামী আশ্চর্য হয়ে তাকালেন মামার মুখের দিকে।

মামা ভয় পেলেন না, বললেন: ঠিকই বলছি। ঐ পাহাড়ের মাথায় ওঠা আমাদের কর্ম নয়। তোমরা দেখে এসে গল্প ক'রো।

শেষ পর্যন্ত তাই ঠিক হল। আমরা ভোর রাতে উঠে বেরব। হোটেলের বেয়ারা চা দিতে পারবে না। বলল, রাতেই আমাদের ফ্লাস্কে ভরে দেবে। ফিরে এলে ব্রেকফাস্ট।

মামী বললেন: ব্যবস্থা কি ভাল হল! বিদেশে বিভুঁয়ে শেষ রাতে বেরনো! কোন বিপদ আপদ না হলে বাঁচি!

স্বাতি বলল: তারপরেই তো কালীবাড়ি যাচ্ছি। বিপদ কেন হবে!

স্বাতির আশ্বাসে মামী ভরসা পেলেন না।

শেষ রাতে আমার ঘুম ভাঙে নি। স্বাতি এসে আমাকে ডেকে তুলল। বলল: বেরবার কথা ভুলে গেলে নাকি?

অন্ধকারে আমি চমকে উঠেছিলুম। তারপর পরিস্থিতিটা বুঝে নিয়ে বললুম: তোমার অপেক্ষা করছি।

ঘুমে অচেতন হয়ে?

না, স্বপ্নে।

কম্বলখানা ফেলে দিয়ে আমি উঠে বসলুম। অন্ধকারেই জামা কাপড় সংগ্রহ করে পরতে লাগলুম।

স্বাতি প্রশ্ন করল: আজকাল কি স্বপ্ন দেখছ?

আগেও দেখতুম। তবে আজকের স্বপ্নটা একেবারে নতুন রকমের।

কী স্বপ্ন, সে কথা স্বাতি জানতে চাইল না। বলল: পথে শুনব।

বলে নিজের ঘরে গিয়ে জামা কাপড় পরে তৈরি হয়ে এল।

ততক্ষণে আমিও তৈরি হয়ে নিয়েছিলুম। স্বাতি চায়ের ফ্লাস্ক কাঁধে ঝুলিয়ে বলল: চল।

আমি তাকে অনুসরণ করতে গিয়ে থমকে দাঁড়ালুম। শোবার

ঘরের বাতি হঠাৎ জ্বলে উঠল। সেই আলোয় আমি মামীকে দেখতে পেলুম।

ফিরে দাঁড়িয়ে স্বাতি বলল : আসি মা। দরজাটা বন্ধ করে দিও।

অস্ফুটস্বরে মামী দুর্গানাম করলেন।

পথে নেমে স্বাতি বলল : কী ভাবছ?

বললুম : মামীমার কথা।

মানে?

তাঁকে বড় অসহায় দেখাল।

স্বাতি খিলখিল করে হেসে উঠল। বলল : ঠিক দেখেছ।

পথে অন্ধকার ঘন নয়, আলোও আসছে না কোন দিক থেকে। রাত কত, তাও আমি দেখি নি। কখন সূর্যোদয় হবে, আকাশের দিকে তাকিয়ে তা বোঝা যাচ্ছে না। ডান দিকে অন্ধকার পাহাড় দৃষ্টিকে অবরোধ করে আছে, আর বামে নক্ষত্রের মতো মিটমিট করে অনেক আলো জ্বলছে নিকটে ও দূরে। ঘন কুয়াশায় আবছা ও অস্পষ্ট দেখাচ্ছে সব কিছু, দিনের আলো না জাগলে এই অস্পষ্টতা দূর হবে না। স্বাতির কথাতেও এই অস্পষ্টতা দেখে জিজ্ঞাসা করলুম : মামীমার কোন কথাই বুঝি আজকাল শোন না?

স্বাতি হাসতে হাসতেই প্রশ্ন করল : তুমি বুঝি তাই ভেবেছ?

তবে কী?

মার ভাবনা তোমার জন্যে। তোমাকে যে একটুও ভরসা পান না।

বললুম : এইবারে বুঝেছি।

কী বুঝেছ?

আমি এলে তোমাকে আর ঘরে আটকানো যায় না।

স্বাতি গম্ভীর ভাবে বলল : তুমি কলির কৃষ্ণ তো!

আমরা রিজের দিকে এগিয়ে যাচ্ছিলুম। পথে জনমানব নেই। কুয়াশায় আচ্ছন্ন অস্পষ্ট পরিবেশের ভিতর অগ্রসর হতে আমাদের

ভয় করছিল না। স্বাতির কথার উত্তরে হেসে বললুম : সকল পুরুষই একটি রাধিকার কাছে কৃষ্ণ। যে তা নয়, সে দুর্ভাগা।

তুমি কি আমাকে তোমার রাধিকা ভাবছ ?

না।

তবে ?

নিজেকে আমি তোমার কৃষ্ণ ভাবছি।

হঠাৎ এই পরিবর্তন এল কেন ?

খুব সঙ্গত কারণে।

শুনি।

শুনলুম আমার রাধিকা স্বাধীন জীবন যাপনের চেষ্টা করছে।

স্বাতি বোধহয় আশ্চর্য হয়েছিল, কিন্তু সে ভাব প্রকাশ করল না। জিজ্ঞাসা করল : তাতে কী সুবিধে হবে ?

এক আয়ান ঘোষ সংগ্রহের চেষ্টা থেকে মুক্তি পাওয়া যাবে। বেচারা !

বেচারা কাকে বলছ ?

সেই হতভাগ্য আয়ান ঘোষকে। একে ক্লীব, তার উপর কৃষ্ণের মতো ভাগ্নে। নিজের মা তাকে ছদ্মবেশী কৃষ্ণ ভেবে তার মাথা ভাঙল। সে গল্প মনে নেই ?

জানি নে।

বললুম : কৃষ্ণ আয়ান ঘোষের রূপে রাধিকার কাছে যাচ্ছে। আয়ান ঘোষের মাকে বলল, দেখ, আজ কৃষ্ণ হয়তো আমার রূপ ধরে বাড়ি ঢোকবার চেষ্টা করবে। তার মাথাটা ভেঙে দিও। মা বলল, বহুৎ আচ্ছা। তারপর এল সত্যি আয়ান ঘোষ। মা বলল, তবে রে ! দেখাচ্ছি মজা। বলে নিজের ছেলেরই মাথা ভাঙল।

স্বাতি খিলখিল করে হেসে উঠল।

আমি বললুম : তাইতেই মামা বলছিলেন, স্বাতির বিয়ে এখন থাক।

গম্ভীর ভাবে স্বাতি বলল : কেন ?

আমিও গম্ভীর ভাবে বললুম : বললেন, আয়ান ঘোষের বদলে ও কৃষ্ণকেই বিয়ে করুক।

কিন্তু কলির কৃষ্ণের যে দুরবস্থার শেষ নেই।

দ্বাপরের কৃষ্ণেরও দুরবস্থা কিছু কম ছিল না। কারাগারে জন্ম, ননী চুরি করে আর গরু চরিয়ে শৈশব কাটল, যৌবনে গোপীদের হাতে নাকানিচোবানি, তারপর জরাসন্ধের ভয়ে মথুরা থেকে একেবারে ভারতের শেষ প্রান্ত দ্বারকায়।

তবু তিনি দ্বারকার রাজা।

রিজের উপরে অন্ধকার আর জমে নেই। প্রত্যূষের প্রথম আলোয় চারি দিক পরিচ্ছন্ন দেখাচ্ছে। উত্তরের উদার আকাশ দেখে নীল সমুদ্র বলে মনে হচ্ছে। দুধারের বেঞ্চগুলো সব খালি, উঁচু বেঞ্চগুলো প্রহরীর মতো মনে হচ্ছে। স্বাতি বলে উঠল : আশ্চর্য !

এই নির্জনতা দেখে সে এই মন্তব্য করল কিনা, আমি তাই জানতে চাইলুম।

স্বাতি বলল : মনে হচ্ছে একটা পরিত্যক্ত শহর। শত্রুর বোমার ভয়ে রাতারাতি সবাই পালিয়ে গেছে।

বললুম : রাত পোহালে সবাই এসে জুটবে।

বলতে বলতেই দু তিনজন মানুষকে এদিকে আসতে দেখলুম। ওভারকোটের উপর ব্যালাক্লাভা টুপি একজনের মাথায়। অন্যরাও মাফলার দিয়ে কান ঢেকেছেন। স্বাতি বলল : এঁরা নিশ্চয়ই সিমলার বাসিন্দা নন।

কেন ?

এখানকার লোক হলে শীতে এমন কাতর হতেন না, লেপের বাইরেও বেরতেন না এই অসময়ে।

কোনখানে দাঁড়িয়ে আমরা সময় নষ্ট করলুম না। এগিয়ে গিয়ে জাখু পাহাড়ের পথ ধরলুম।

যক্ষ পাহাড় লোকের মুখে মুখে জাখু পাহাড় হয়েছে। এই পাহাড়ে মানুষের বসবাস আছে বলে নিচে থেকে মনে হয় না। কিন্তু উপরে উঠলে দেখা যায় যে একটার পর আর একটা বাড়ি। ধূসর পাহাড়ের গায়ে শ্যামল ঝাউ গাছ দিয়ে ঢাকা আছে।

ডান দিকের একটি দোকানের দরজা বন্ধ। কিন্তু ভিতর থেকে জলের শব্দ শোনা যাচ্ছিল। দোকানদার বোধহয় স্নান করছে। পরম কৌতূহলে আমি উঁকি দিয়ে ব্যাপারটা দেখে নিলুম। একজন বুড়ো মানুষ বিড়বিড় করে মন্ত্রপাঠ করে বালতির জল মাথায় ঢালছে। মেঝে থেকে ধোঁয়া উঠছে অল্প অল্প। দেশের কথা আমার মনে পড়ল। আমাদের গ্রামে একখানা চালার নিচে হোটেল ছিল ঘোষাল কাকার। স্নান না করে কোন দিন তিনি উনুন ছুঁতেন না। বলতেন, খদ্দের হল দেবতা। দেবতার ভোগ কি বাসী কাপড়ে রাঁধা যায়! তখন আমরা এই কথাই বিশ্বাস করেছিলুম। এখন বুঝি যে এই ধর্মবিশ্বাস ঘোষাল কাকার জীবনকালেই লোপ পাবে। মন পবিত্র থাকলেই দেহটাকে পবিত্র রাখার ইচ্ছা জাগে। আজ আমাদের মনের পবিত্রতা কোথায়!

উপরে উঠতে উঠতে স্বাতি জিজ্ঞাসা করল: কী দেখলে?

যা দেখেছিলুম সে কথা এড়িয়ে গিয়ে বললুম: ফেরার পথে চা পাওয়া যাবে।

আর কিছু?

ফুচকা কিংবা হিঙের কচুরি।

চমৎকার আইডিয়া। এই বুদ্ধির জন্যেই তোমার একটা ভাল বিয়ে হওয়া উচিত।

স্বাতি প্রচুর গাম্ভীর্য নিয়ে এই মন্তব্য করল। আর আমি ততোধিক গম্ভীর হয়ে বললুম: সে ব্যবস্থা প্রায় পাকা করে ফেলেছি।

সত্যি নাকি!

নিমন্ত্রণ পত্র পেলেই সব জানতে পারবে।

ছদ্ম গাম্ভীর্য নিয়ে স্বাতি বলল : তোমার উত্তরপাড়ার ঐ এঁদো ঘর থেকে বউ পালিয়ে যাবে না তো !

বউ যে সেধে সেখানে যাচ্ছে !

বল কি, ঐ এঁদো ঘরে !

আমার বউ গাছতলার চেয়ে ঘর পাচ্ছে, সেই আনন্দেই মশগুল।

তুমি নিজেও যে মশগুল দেখছি।

আমি এ কথার উত্তর দিতে পারলুম না। সামনের পথ দু ভাগে বিভক্ত হয়ে গেছে। ভুল পথ ধরলে হয়রানির আর অন্ত থাকবে না। আমি দাঁড়িয়ে এক মুহূর্ত ভাবলুম, তারপর বললুম : এস।

স্বাতি জিজ্ঞাসা করল : কী দেখলে ?

বললুম : এই পথটা সোজা উপরে উঠেছে, আর ঐটে উঠেছে ঘুরে। যাঁরা রিক্শায় চেপে আসবেন, তাঁদের জন্য ঐ পথ।

পথের উপর রিক্শার চাকার দাগ দেখে স্বাতি আর কোন প্রশ্ন করল না।

পায়ে চলা মাটির পথ, ক্লান্তিকর চড়াই। সামনের দিকে একটু ঝুঁকে উঠতে হচ্ছে। অনেকক্ষণ থেকেই আর শীত করছিল না। স্বাতি এবারে তার গরম চাদর খুলে হাতে ঝুলিয়ে নিল।

আরও খানিকটা উঠে একটু সমতল জায়গা পাওয়া গেল। পাহাড়ের শেষ ওখানে নয়, কিন্তু কষ্টের শেষ হল। ডান হাতে একটা জলের কল, ঝিরঝির করে জল পড়ছে। আর বাম হাতে পথ গেছে উত্তরে মন্দিরের দিকে। মাঝখানে একটা বেঞ্চ ছিল। পথ ছেড়ে খানিকটা উপরে। তারই উপর দাঁড়িয়ে আমরা সিমলার শহর দেখলুম। রৌদ্রে এখন চারি দিক ঝলমল করছে। পরিচিত জায়গা-গুলোকেও রহস্যময় মনে হচ্ছে। দুজনে আমরা মুগ্ধ হয়ে অনেক ক্ষণ চেয়ে দেখলুম।

আরও খানিকটা এগিয়ে জাখু পাহাড়ের মন্দির। দরজা বন্ধ। দেবতা নাকি প্রাচীন। কিন্তু মন্দিরের গায়ে প্রাচীনতার কোন চিহ্ন

নেই। ছোট সামান্য ব্যাপার। এক জায়গায় মন্দির-নির্মাতার নাম-ধামও লেখা আছে। লক্ষ্ণৌএর লালা হরকিষণ দাস তাঁর ভাইএর স্মৃতিতে এই মন্দির নির্মাণ করেছেন উনিশ শো সাতচল্লিশ খ্রীষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে।

আমরা ডান দিকে একটা খোলা জায়গার দিকে এগিয়ে গেলুম। একটা ঝাউ গাছের নিচে এক ফালি রৌদ্র ছড়িয়ে পড়েছে। এক দল বাঁদর নিঃশব্দে রোদ পোয়াচ্ছে।

আমরা উত্তরে দিগন্তের দিকে তাকিয়ে বিস্ময়ে ও আনন্দে অভিভূত হয়ে গেলুম। সামনে তুষারমৌলি হিমালয়ের অপরূপ বিস্তার। কোথাও বরফ, কোথাও মেঘ, কোথাও বা দুয়ে মিলে এক মায়াময় রূপ। আমরা মাটিতেই বসে পড়লুম।

এ জায়গায় বসবার কোন ব্যবস্থা নেই। অথচ ব্যবস্থা করা কঠিন কাজ নয়। রাস্তা যখন আছে, তখন সব কিছুই আনা সম্ভব। রাস্তার শেষ দিকটা মেরামত হচ্ছে, বোধহয় পাকা হবে। পথের ধারে ও এইখানে কিছু বেঞ্চ পাতলে যাত্রীদের সুবিধা হবে। আমাদের মতো শিশিরে ভেজা ঘাসের উপরে বসতে হবে না। খানিকক্ষণ নিঃশব্দে এই সৌন্দর্য উপভোগ করবার পর স্বাতি ফ্লাস্ক খুলল।

চা খাবার পর স্বাতি আমাকে সেই মর্মান্তিক কথা বলল। তার জন্য সে কোন ইতস্তত করল না, কোন ভূমিকাও না। অত্যন্ত সহজ ভাবে স্পষ্ট ভাষায় তার বক্তব্য আমাকে জানিয়ে দিল। বলল: তুমি ঠিকই শুনেছ যে আমি স্বাধীন ভাবে জীবন যাপনের চেষ্টা করছি। কেন করছি, তাও বোধ হয় বুঝেছ। সে বাবা মার সম্মানের জন্য। লেখাপড়া শেষ করে বাড়িতে বসে থাকলে বাবা মা বিয়ের জন্য ব্যস্ত হবেন। অথচ বিনা দ্বিধায় বিয়ে করতে পারি এমন মানুষের দেখা কি আজও পেয়েছি!

আমি স্বাতির দিকে তাকিয়ে দেখলুম, জলভরা মেঘের মতো তার মুখ থমথম করছে। খানিকক্ষণ থেমে বলল: আমি তোমাকে

ভালবাসি গোপালদা, কিন্তু তোমাকে বিয়ে করার কথা ভাবতে পারি না।

কেন, সে কথা আমি জিজ্ঞাসা করলুম না। স্বাতি নিজেই সে কথা বলল : আদর্শের জন্যে নিজের সুখ দুঃখ স্বার্থত্যাগ করা চলে। কিন্তু দেবতার মতো পিতামাতা আদর্শের উর্ধ্বে। তাঁদের অসম্মান করে তো কল্যাণ হবে না।

এক রকমের অদ্ভুত অনুভূতি আমার দেহকে অসাড় করে এনেছিল। আমি স্বাতিকে সমর্থন করতে পারলুম না, প্রতিবাদ করার মতো কোন যুক্তিও খুঁজে পেলুম না। নির্বাক নির্বিকার হয়ে তার পরবর্তী কথার অপেক্ষা করতে লাগলুম।

স্বাতি বলল : কিছু দিন আগে আমি তোমাকে একখানা চিঠি লিখেছিলুম। সে চিঠি তুমি ফিরে গিয়ে পাবে।

কী লিখেছিলে ?

তোমাকে দিল্লী আসবার জন্যে অনুরোধ করেছিলাম। লিখেছিলাম যে তুমি সঙ্গে না থাকলে এবারে আমরা বেড়াতে বেরব না।

কেন ?

এ কথাও কি আমাকে বলতে হবে গোপালদা !

বলে স্বাতি তার একখানা হাত আমার দিকে বাড়িয়ে দিল। বলল : এস, ক্ষিধে পেয়েছে খুব। এতক্ষণে বোধহয় ফুচকা আর হিঙের কচুরি দুইই তৈরি হয়ে গেছে।

আমি বিহ্বল ভাবে খানিকক্ষণ তার দিকে তাকালুম। তারপর উঠে পড়লুম।

স্বাতির দৃষ্টি আজ বড় প্রসন্ন দেখাচ্ছে। পায়ে তার পাহাড়ী ঝর্ণার ছন্দ, আবেগ সমুদ্রের মতো। আমি তার কোন কূল দেখতে পাচ্ছি না।

চায়ের দোকান থেকে আমরা যখন বার হচ্ছিলুম, তখন দেখা হল গত রাত্রের সেই রায়বাহাদুরের সঙ্গে। আমাদের দেখতে পেয়েই ভদ্রলোক চেঁচিয়ে উঠলেন : আরে মশাই, আপনারা এইখেনে! আর বুঝতেই পারছেন, আমি আপনাদের জন্যে দুর্ভাবনায় অস্থির।

আমি নমস্কার করে বললুম : দুর্ভাবনা কিসের ?

ভদ্রলোক শুধু আমাকে নয়, স্বাতিকেও একটা নমস্কার করে বললেন : দুর্ভাবনা নয়! আমার অনেক ভাগ্যি যে আপনারা জাখু পাহাড় থেকে সঞ্জৌলির দিকে নামেন নি। আমি তো ঐ পথেই উঠব ভেবেছিলুম, শেষ পর্যন্ত একটা রিক্স নিলুম। আসুন, আসুন।

বলে ভদ্রলোক আমাদের সঙ্গে নামতে লাগলেন।

খানিকটা অগ্রসর হয়ে আমি জিজ্ঞাসা করলুম : এখন কোথায় যেতে হবে ?

স্বাতি জিজ্ঞাসা করল : গোপালদা কি এখন বক্তৃতা দেবে ?

না না, এখন আমি আপনাদের কাছেই এসেছিলুম। হোটেলে গিয়ে মিস্টার গোস্বামীর কাছে শুনলুম যে আপনারা জাখু পাহাড়ে উঠবেন বলে বেরিয়েছেন। কাল আমাকে বললে আমি আপনাদের সঙ্গে যেতে পারতুম। আজকাল দেশের যা অবস্থা, বুঝতেই পারছেন, শেষ রাতে ঠিক এ রকম করে বেরনো খুব নিরাপদ নয়। নেই নেই করেও আপনাদের হাতে ও গলায়, বুঝতেই পারছেন—

বললুম : তা পারছি বৈকি।

স্বাতি আমার উত্তর শুনে হাসল।

রায়বাহাদুর এই হাসি দেখে লজ্জিত হলেন না। বললেন : কোন বিপদ আপদ হয় নি বলেই আমার কথা আপনি সিরিয়াস্‌লি নিতে পারলেন না। তা না পারলে ক্ষতি নেই, বিপদ আপদ হলে অনেক ক্ষতি ছিল। বুঝতেই পারছেন—

স্বাতি আবার হাসল।

আমি তার হাসির কারণ বুঝি, কিন্তু ভদ্রলোক বুঝলেন না। তাই বললুম : আপনি ঠিকই বলছেন। দিনকাল খুব দ্রুত বদলাচ্ছে। সততার অভাব সর্বত্র। পাহাড়েও চুরি ডাকাতি শুরু হয়েছে।

রায়বাহাদুর খুশী হলেন আমার কথা শুনে। বললেন : পাহাড়ীদের মতো সৎ জাতি মশাই এ দেশে ছিল না। বুঝতেই পারছেন, আমাদের সংস্পর্শে এসে এরাও খারাপ হয়ে গেল। দোষ এদের নয়, দোষ আমাদেরই। আমরাই এদের ঠকিয়ে ঠকিয়ে ঠকানো শিখিয়েছি।

আমরা রিজ থেকে মল রোডে নেমে এসেছিলুম। বড় বড় দোকানপাট তখনও খোলে নি, কিন্তু পথে লোক চলাচল শুরু হয়ে গেছে। আমি স্বাতির দিকে তাকিয়ে দেখলুম, সে এবারে মুখ ফিরিয়ে হাসছে।

রায়বাহাদুর দেখতে পান নি। বললেন : এ সব কথার বদলে কেমন লাগল তাই বলুন।

বললুম : মন্দ কী।

রায়বাহাদুর এবারে স্বাতিকে জিজ্ঞাসা করলেন : আপনার কেমন লাগল ?

স্বাতি সংক্ষেপে বলল : ভাল।

ভাল কী লাগল ? হাঁপাতে হাঁপাতে উপরে উঠে তো এক দঙ্গল বাঁদর দেখেছিলেন। ভাল লাগবার মতো কী দেখলেন ?

স্বাতি বলল : কেন, বরফের পাহাড় !

এইখান থেকে দেখেই বরফের পাহাড় আপনার ভাল লাগল ! আশ্চর্য ! কাছে পৌঁছতে পারলে কী করতেন ?

কাছে পৌঁছনো যায় নাকি ?

যাবে না কেন ! কত লোকেই তো আজকাল বরফের উপর উঠছে। মাউন্ট এভারেস্টেও তো উঠেছে, বুঝতেই পারছেন—

স্বাতি আবার হাসল। আমি বললুম : বুঝেছি বৈকি। আপনি বলছেন যে ঐ বরফের পাহাড় রিজ থেকেই দেখা যায়, তার জন্যে জাখু পাহাড়ে উঠবার দরকার ছিল না।

ঠিক বলেছেন। আমি সব সময় বলি যে নগদ মূল্যে কাজ কর। ধারে কারবার চলবে না। অর্থাৎ ন্যায্য মূল্য পাব জেনেই পরিশ্রম করব।

আমাদের জন্যে এই পরিশ্রম করে কী লাভ হবে, সে কথা জিজ্ঞাসা করবার ইচ্ছা হয়েছিল। কিন্তু অসৌজন্য প্রকাশ হয়ে পড়বে বলে চুপ করে গেলুম। ভদ্রলোক নিজেই বললেন : বুঝতেই পারছেন, আমি কেন আপনার জন্যে ছুটোছুটি করছি। মশাই, আপনি গুণী লোক। বয়সে আমার চেয়ে ছোট হলে কী হবে, অন্য বিষয়ে অনেক এগিয়ে গেছেন। ধরে বেঁধে আপনাকে সভায় দাঁড় করাতে পারলে সিমলার বাঙালী সবাই বুঝবে যে, হ্যাঁ, রায়বাহাদুর গুণীর আদর করতে জানে।

কথায় কথায় আমরা আমাদের হোটেলের কাছে পৌঁছে গিয়েছিলুম। ভদ্রলোক একটু ধীরে হাঁটা শুরু করতেই স্বাতি এগিয়ে গেল। আমি রইলুম ভদ্রলোকের সঙ্গে। তারপর গেটের কাছে পৌঁছতেই ভদ্রলোক আমার হাত টেনে ধরলেন, বললেন : আপনাকে একটা কথা জিজ্ঞেস করব।

বলুন।

উনি তো আপনার মামাতো বোন ?

হ্যাঁ।

তবে ?

তবে আবার কী ?

মামাতো বোনের সঙ্গে কি বিয়ে হয় !

আমি হেসে ফেললুম।

ভদ্রলোক চটে উঠে বললেন : হাসি নয় মশাই, শাস্ত্রবিরুদ্ধ কাজ

কখনও করবেন না, মহাপাতক হবে। মনুসংহিতাটাই না হয় পুড়েছে, ভগবান তো মরে নি!

আমি আশ্চর্য হয়ে বললুম: এ সব কথা আপনাকে কে বলল?

বুঝতেই পারছেন গোপালবাবু, লেখকের জীবনের কোন কথাই গোপন থাকে না। আপনারা অশাস্ত্রীয় কাজ করলে দেশের সর্বনাশ হবে।

বুঝেছি।

রাস্তা থেকে আমরা হোটেলের বারান্দায় নেমে এলুম। স্বাতি ভিতরে পৌঁছে গিয়েছিল, আমরাও ঘরে এসে উপস্থিত হলুম।

মামা বললেন: আসুন মিস্টার রায়, আপনি শুধু শুধুই কষ্ট করলেন।

না, কষ্ট কিসের! বুঝতেই পারছেন, আপনাদের জন্যে কোন কষ্টই কষ্ট নয়।

মামী আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন: স্বাতি কোথায়?

এবারে আমি চারি দিকে চেয়ে দেখলুম, স্বাতি ঘরে নেই। কিন্তু সে আমাদের আগেই হোটেলে ঢুকেছিল। রায়বাহাদুর ব্যস্ত হয়ে উঠলেন, বললেন: সে কি, তিনি তো আমাদের আগেই পৌঁছেছেন!

বলে লাফিয়ে উঠে দরজার দিকে ছুটলেন। তারপর দরজার সঙ্গে ধাক্কা খেয়ে ফিরে এলেন। স্বাতি দরজা খুলে ভিতরে ঢুকছিল।

আমি জিজ্ঞাসা করলুম: দেরী হল কেন?

স্বাতি বলল: কিছু খেতে হবে না! ব্রেকফাস্টের অর্ডার দিয়ে এলাম।

আমি তার হিঙের কচুরি খাবার কথা বললুম না। সে লজ্জা পাবে। বললুম: সত্যিই তো, ক্ষিধেয় যে পেট জ্বলে যাচ্ছে।

রায়বাহাদুর কপালে হাত বুলিয়ে বসে পড়েছিলেন, এবারে মুখ

তুলে বললেন : আমার জন্যে কিছু বলেন নি তো? আমি এখানে খেয়েই বেরিয়েছিলুম।

তাই নাকি।

বুঝতেই পারছেন, আবার খেতে বললে কী অবস্থা হবে!

স্বাতি হেসে ফেলেছিল।

মামী বললেন : কী আর হবে, পাহাড়ে জলহাওয়ায় সব হজম হয়ে যাবে।

মামীর এই মন্তব্য শুনে স্বাতি বিস্মিত হল। অনুসন্ধানীর দৃষ্টিতে তাকাল মায়ের মুখের দিকে। মামী বললেন : সত্যিই তো, এই বয়সে ভাবনা করে খেতে হবে নাকি!

আমি রায়বাহাদুরের মুখের দিকে তাকালুম। তাঁর কাঁচাপাকা চুলের দিকে তাকিয়ে বয়সটা অনুমান করতে চেষ্টা করলুম। চল্লিশের উপরে কত হবে জানি না, কিন্তু কম কোন মতেই নয়। অথচ মামী তাঁকে ছেলেমানুষ বলেই ধরে নিতে চাইছেন। স্বাতি এর একটা কারণ অনুমান করে নিয়েছে বলে মনে হল। কিন্তু কোন মন্তব্য করল না।

রায়বাহাদুর কৃতার্থ ভাবে হাসতে লাগলেন।

মামী জিজ্ঞাসা করলেন : আজ আপনার ছুটি বুঝি?

ছুটি! সে গুড়ে বালি। ছুটি কমাতে কমাতে আমাদের সরকার এখন এমন অবস্থায় এসেছেন যে বুঝতেই পারছেন, অফিস না পালিয়ে আর উপায় নেই। সকালবেলায় টেলিফোন করে জানিয়ে দিয়েছি যে এখন দু একদিন অফিসে যেতে পারব না। দিল্লীর বড় দপ্তর থেকে কেউ এলে যেন খবর দেওয়া হয়।

স্বাতি বলল : ভারী সুবিধে তো আপনাদের!

এইটুকুই সুবিধে। তা না হলে অসুবিধার শেষ নেই। গভর্ণমেণ্টের চাকরি না নিয়ে যদি কোন ফার্মে ঢুকতুম, তা হলে বুঝতেই পারছেন—

আমি বললুম : তা পাচ্ছি বৈকি।

স্বাতি মুখ লুকিয়ে হাসল।

রায়বাহাদুর বললেন : হেঁটে তো সিমলা দেখা সম্ভব নয়। আপনাদের জন্যে একখানা জীপ ঠিক করে ফেলেছি।

এ খবরটি যে তিনি আগেই দিয়েছিলেন, তা বুঝতে পারলুম মামীর মন্তব্য শুনে। বললেন : এত সব হাঙ্গামার কী দরকার ছিল বুঝতে পারি নে।

হাঙ্গামা আবার কোথায়! ভোরবেলায় এক কন্ট্রাক্টরকে ডেকে বললুম যে দু একদিনের জন্যে একখানা জীপ চাই। সে তো উদ্ধার হয়ে গেল। ড্রাইভার থাকলে তখুনি পাঠাত। এখন ফিরে গিয়ে দেখব যে বাড়ির সামনে গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে।

দু চোখ বিস্ফারিত করে স্বাতি বলল : আশ্চর্য!

রায়বাহাদুর বললেন : আশ্চর্য হবার কিছু নেই। সারা বছর সুবিধা সুযোগ নিচ্ছে। সরকারকে ঠকাচ্ছে ডানে বাঁয়ে, আর আমরা মুখ বুজে সহ্য করে যাচ্ছি। আমরা কড়া হলে কি ওরা ব্যবসা করে খেতে পারবে!

মামী বললেন : সত্যিই তো!

রায়বাহাদুর বললেন : বুঝতেই পারছেন—

বাধা দিয়ে মামা বললেন : তা আর পারছি নে!

স্বাতি আমার দিকে তাকিয়ে হাসল। মামার কথা শুনে যে সে খুশী হয়েছে, তা বুঝতে আমার দেরি হল না। কেন হয়েছে, তাও অনুমান করতে পারি। স্বাতির দিকে তাকিয়ে তাই আমিও হাসলুম। বললুম : সিমলায় বুঝি অনেক কিছু দেখবার আছে?

নেই! এদিকে প্রস্পেক্ট হিল সামার হিল তারা দেবী, ওদিকে মাশোব্রা কুফরি চিনিবাংলো, নালদেরা তত্তাপানি।

আমি ব্যস্ত ভাবে বললুম : দাঁড়ান দাঁড়ান, সব গুলিয়ে যাচ্ছে একসঙ্গে। একটা একটা করে বলুন।

রায়বাহাদুর বললেন : মাশোব্রা হল ঘন পাইন আর ওক গাছের জঙ্গলের ভিতর চমৎকার একটি পিকনিকের জায়গা। কটেজ আছে, কাছে একটা রেস্টহাউসও আছে, আর আছে অগণিত পিকনিকার। ছেলেরা নালদেরায় পালিয়ে যায়। দেবদারু বনের ভিতর গল্‌ফের সুন্দর মাঠ। আরও যদি এগোতে চান তো চলে যান তত্তাপানি। শতদ্রু নদী দেখুন, আর দেখুন গন্ধকের প্রস্রবণ। খেলাধুলোর শখ আছে ?

রায়বাহাদুর স্বাতির দিকে চেয়ে এই প্রশ্ন করেছিলেন। সে বলল : গোপালদার আছে।

তবে কিছু দিন থাকুন। চিনিবাংলোর কাছে স্কি করে আর রিঙ্কে স্কেটিং করে খেলার শখ মিটবে।

জিজ্ঞাসা করলুম : আপনার আজকের প্রোগ্রাম কী ?

এখান থেকে ক্লাবের সেক্রেটারির কাছে যাব। আপনার সম্বর্ধনার ব্যবস্থা করে বাড়ি। তারপর খেয়েদেয়ে স্টেশনে। আপনার প্রকাশকের একটা ভাল ব্যবস্থা করে দিয়ে বিকেলে আপনাদের কাছে আসব।

বেয়ারা আমাদের ব্রেকফাস্ট ঘরে এনেছিল। আমাদের সঙ্গে রায়বাহাদুরও খেলেন। স্নানের জন্যে মামী গরম জলের ফরমায়েশ করেছিলেন। সেই গরম জল এলে মামী উঠে পড়লেন। মামার দিকে চেয়ে বললেন : তুমিও স্নান করে বেরবে তো ?

মামা গম্ভীর ভাবে বললেন : সেই তো ভাল।

রায়বাহাদুর বললেন : কালীবাড়ি যাবেন বুঝি ?

মামা সংক্ষেপে বললেন : হুঁ।

বেশ তো, আমি এখুনি গিয়ে কালীবাড়িতে খবর দিচ্ছি। আপনাদের যাতে কোন অসুবিধে না হয়, সে ব্যবস্থা হয়ে যাবে। আপনারাও আসছেন তো ?

বলে আমাদের দিকে তাকালেন।

আমি বললুম : আসব বৈকি।

তবে তো ভালই হল। আমি না হয় আপনাদের জন্যে অপেক্ষা করব।

ইচ্ছে হল জিজ্ঞাসা করি, আমরা না গেলে কি তিনি অপেক্ষা করবেন না? মামা মামীর চেয়ে আমাদের জন্যে তাঁর দরদ বেশি? কিন্তু সে কথা জিজ্ঞাসা করতে পারলুম না।

মামা বললেন: আমাদের ব্যবস্থা আমরা নিজেরাই করে নিতে পারব। আপনি শুধু শুধু কেন কষ্ট করবেন।

কষ্ট আর কী! আপনারা নতুন এসেছেন, আপনাদের সাহায্য করতে পারলে আমারই আনন্দ হবে।

ভদ্রলোক বেরিয়ে যাচ্ছিলেন, আমি তাঁকে এগিয়ে দিয়ে এলুম।

ফিরে এসে স্বাতিকে দেখলুম মামার সঙ্গে গল্প জুড়েছে। জিজ্ঞাসা করছে: ভদ্রলোক কখন এসেছিলেন?

কাকপক্ষী ডাকবার আগে।

বল কি!

বেয়ারা মর্নিং টি দিতে এসে খবর দিয়েছিল যে এক ভদ্রলোক বাইরে অপেক্ষা করছে। লেপের তলা থেকে বেরিয়ে ড্রেসিং গাউনটা শুধু জড়িয়ে বসেছি।

স্বাতি বলল: আশ্চর্য!

মামা আমার দিকে তাকিয়ে বললেন: আশ্চর্য হবে পরের কথা শুনে।

কী রকম?

যা শুনলুম তাতে ঐ ভদ্রলোক একটা ভাল চাকরি করে বলে মনে হচ্ছে। অন্তত তোমার মামীর তো বেশ ভক্তি হয়েছে দেখলুম। কিন্তু কথাবার্তায় তাকে একটি—কী বলব—

স্বাতি হাসছিল।

আমি বললুম: বুঝেছি।

বুঝবেই। না বোঝার তো কিছু আর সে বাকি রাখে নি। আমাদের সব জোটেও বেশ।

স্বাতি বলল : এরা সব গোপালদার ভক্ত। প্রকাশক ভদ্রলোক এই রকম হলেই গেছি!

বললুম : সিমলা সম্বন্ধে তো মোটামুটি একটা ধারণা হয়েছে। বেশি বিপদ দেখলে পালানো যাবে।

মামা বললেন : পালাবে কোথায়! তোমার ঐ রায়বাহাদুর ভক্ত কী বলছিল জান? বলছিল, দরকার হলে আমাদের সঙ্গেই বেরতে পারে। সিমলা থেকেই আমাদের কুলু নিয়ে যাবে। দশেরা দেখাবে, তোমরা যা যা বলেছিলে সব দেখিয়ে দেবে।

জো রায়ের কথা আমার মনে পড়ল। তিনিও তাঁর কাজকর্ম ফেলে আমাদের সঙ্গে বেটদ্বারকা গিয়েছিলেন, তারপর সোমনাথেও যেতেন। স্বাতি তাঁকে অপমান না করলে সহজে তিনি আমাদের পরিত্যাগ করতেন না। এই ভদ্রলোকও দেখছি সেই রকম। তবে জো রায়ের চেয়ে বয়সে অনেক বড়। জো রায় স্বাতিকে পছন্দ করে পিছু নিয়েছিলেন, ইনি কেন সঙ্গ চাইছেন তা জানা যায় নি। কেন জানি না, ভদ্রলোককে আমার বিপত্নীক বলে মনে হল। সুবিধা পেলেই এই কথাটি আমি জেনে নেব।

মামী স্নান করে বেরিয়েই মামাকে তাড়া দিলেন। মামা বললেন : তোমরাও তৈরি হয়ে নাও।

তৈরি হবার উৎসাহ আমি অনেক আগেই হারিয়ে ফেলেছি। কিন্তু কাউকে সে কথা বললুম না।

মামা মামী কালীবাড়িতে পূজো দিলেন। স্বাতির সঙ্গে আমি চারি দিকটা ঘুরে ঘুরে দেখলুম। সামনের রাস্তায় দাঁড়িয়ে অনেক নিচে দেখা যায় অ্যানানডেল, সবুজ গাছে ঘেরা ঘোড়দৌড়ের প্রশস্ত ময়দান। সিমলার সমস্ত খেলা হয় এইখানে। খেলোয়াড়দের কথা ভেবে স্বাতি উদ্বিগ্ন হল। বলল: এত পরিশ্রম করে নিচে নামবার পরেও কি খেলার উৎসাহ থাকে!

বললুম: যারা খেলা দেখতে নামে, তাদের কথা একবার ভাব।

স্বাতি বলল: গ্লেন নামে পিকনিকের জায়গাটা শুনেছি আরও নিচে। চল না এক দিন দেখে আসি।

হেসে বললুম: তোমার সঙ্গে আমি ওপরে উঠতে চাই, রায়-বাহাদুরের সঙ্গে তুমি নিচে নামো।

সকৌতুকে স্বাতি বলল: রায়বাহাদুরকে হিংসে করছ নাকি?

হিংসে রায়বাহাদুরকে কেন করব। হিংসে করছি তোমাকে।

কেন?

ভদ্রলোক আমার খোঁজে এসে মুগ্ধ হলেন তোমাকে দেখে। কী ভাগ্য বল তোমার।

শুধু তুমিই আমার মর্ম বুঝলে না।

এ কথার উত্তর আমি দিতে পারলুম না। রায়বাহাদুর এসে উপস্থিত হলেন। বললেন: আপনারা এখানে! আর আমি আপনাদের কোথায় না খুঁজে বেড়াচ্ছি। বুঝতেই পারছেন, সবার কী ভাবনা হচ্ছিল!

স্বাতি জিজ্ঞাসা করল: বাবা মার কি পূজো হয়ে গেল?

কবে! আপনাদের খুঁজে পেলে এতক্ষণ—

মন্দির থেকে মামা মামীকে বেরিয়ে আসতে দেখে ভদ্রলোক থেমে গেলেন। তাঁদের দিকে এগিয়ে গিয়ে বললেন: এই দেখুন, এঁরা দুজনে এখানে, আর বুঝতেই পারছেন—

বিরক্ত ভাবে মামা বললেন : তা পারছি বৈকি।

স্বাতি আমার দিকে চেয়ে হাসল, আর রায়বাহাদুর বললেন : তা পারবেন না কেন! আপনাদের উদ্বেগ যখন আমি বুঝতে পারছি, তখন—

মামা কোন কঠিন কথা বলে ফেলবেন ভয়ে আমি তাঁকে বাধা দিলুম, বললুম : আপনার বাড়ি এখান থেকে কত দূরে?

এমন আর দূর কি! আসুন না, গরিবের বাড়িতে একবার পায়ের ধুলো দিয়ে যাবেন।

বলে স্বাতির দিকে তাকালেন।

তাড়াতাড়ি আমি বললুম : বেশ তো, সে আর এক দিন হবে। আজ আমাদের ছুটি দিন।

স্বাতির চোখের দিকে তাকিয়ে আমার মনে হল, আমি ভুল করেছি। মামাকে খুশী করবার জন্য যা বলেছি, মামী তাতে অসন্তুষ্ট হবেন। তাই আমি আর কোন কথা বললুম না।

তবু রায়বাহাদুর আমাদের সঙ্গে এগোচ্ছেন দেখে মামা নিজেই বললেন : এবারে আসুন তাহলে।

এর চেয়ে পরিষ্কার কথা হয় না, এ কথা না বুঝে আর উপায় নেই। ভদ্রলোক নিতান্ত অনিচ্ছাতেই নমস্কার করে বিদায় নিলেন। মামী কিছু বলতে চেয়েছিলেন, কিন্তু মামার মুখের দিকে তাকিয়ে নীরব রয়ে গেলেন।

বিকেলবেলায় রায়বাহাদুর এলেন হন্তদন্ত হয়ে। বললেন : আসুন আসুন, এখুনি আমাদের বেরিয়ে পড়তে হবে।

আমি আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞাসা করলুম : কোথায়?

বেড়াতে বেরবেন না? প্রস্পেক্ট হিলে যাবার জন্যে গাড়ি নিয়ে এসেছি। শিগগির তৈরি হয়ে নিন, সূর্যাস্তের আগেই পৌঁছতে হবে।

ভদ্রলোক উত্তর দিলেন আমার কথার, কিন্তু বললেন স্বাতির

দিকে চেয়ে। মামী এগিয়ে এসেছিলেন, বললেন : আপনি আবার এত হাঙ্গামা কেন করলেন !

হাঙ্গামা কিসের ! এ তো আনন্দের কথা। আপনারা দু দিনের জন্যে বেড়াতে এসেছেন, আমরা থাকতে বুঝতেই পারছেন—

চা খেয়ে মামা পাইপ ধরিয়েছিলেন। বললেন : তা পারছি বৈকি।

স্বাতি হাসি চেপে বলল : গোপালদার প্রকাশকের কী হল ?

সে কথা আর জিজ্ঞেস করবেন না। ব্যবসাদার সবাই এক রকম। কথার কোন ঠিক নেই।

কী রকম !

না না, ঘরের ভেতর আর দেরি করবেন না। গাড়িতে বসে সে গল্প শোনাব। বুঝতেই পারছেন, আজ দুপুরে কী নাস্তানাবাবুদ হয়েছি!

মামার শালখানা এনে মামী বললেন : গায়ের চাদরটা বদলে নাও।

নিজেও একখানা শাল জড়িয়ে এসেছিলেন। আমরাও তৈরি হয়ে বেরিয়ে পড়লুম।

খানিকটা হেঁটে নেমে আমরা জীপে উঠলুম। স্বাতিকে নিয়ে মামী পিছনে বসেছিলেন, কাজেই মামাকেও অনেক পরিশ্রম করে পিছনে বসতে হল। আমি রায়বাহাদুরের সঙ্গে ড্রাইভারের পাশে বসলুম। গাড়ি চলতেই স্বাতি বলল : গোপালদার প্রকাশক সঙ্গে থাকলে সকলের জায়গা হত না।

রায়বাহাদুর বললেন : কি যে বলেন, আমি তাঁর জন্যে আর একখানা জীপের ব্যবস্থা করে ফেলতাম। বুঝতেই পারছেন, সিমলায় এ সব ব্যবস্থা করতে—

মামা বললেন : বুঝতে সবই পারছি।

মামার মন্তব্যকে রায়বাহাদুর সহজ ভাবেই গ্রহণ করেছিলেন।

তাই গদগদ ভাবে বললেন : আপনাদের আশীর্বাদে একখানা কেন সিমলার সমস্ত গাড়ি এক জায়গায় করতে পারি।

বলে পিছনে তাকিয়ে দেখলেন।

স্বাতি আবার জিজ্ঞাসা করল : গোপালদার প্রকাশকের কী হল ?

তাঁর কথা আর জিজ্ঞেস করবেন না। খেয়েদেয়ে স্টেশনে এসে ঠায় দাঁড়িয়ে রইলুম। রেল কার এল, একখানা দুখানা করে সমস্ত ট্রেনগুলো এল, কিন্তু ভদ্রলোক এলেন না। শেষ পর্যন্ত বুঝতেই পারছেন, স্টেশনে চা খেয়ে আপনাদের কাছেই চলে এলুম।

আমি বললুম : ভদ্রলোক মোটরে আসেন নি তো!

অ্যাঁ, মোটরে এসেছেন!

না না, আমি তাই জানতে চাইছি।

আমার কাছে জানতে চাইছেন ?

ভদ্রলোক এমন ব্যস্ত হয়ে উঠলেন যে মনে হল গাড়ি থেকে এখুনি নেমে সমস্ত হোটেলগুলোয় খুঁজতে বেরবেন। তাড়াতাড়ি আমি বললুম : আপনাকে যখন মোটরে আসবার কথা লেখেন নি, তখন হয়তো—

ভদ্রলোক নিজের পকেট হাতড়াতে লাগলেন। বললেন : দেখেছেন, চিঠিখানাই বাড়িতে ফেলে রেখে এসেছি।

তাতে আর কী হয়েছে! হয়তো কাল আসবেন, কিংবা পরশু।

পিছন থেকে স্বাতি বলল : কিংবা আসবেনই না।

অ্যাঁ, আসবেন না! বলেন কি!

তারপরেই বললেন : কিছু বিচিত্র নয়, ব্যবসাদারের ব্যাপার, কথার কোন ঠিক নেই। বুঝতেই পারছেন, দেখে দেখে আমরা হদ্দ হয়ে গেছি।

ছোট একটুখানি বাজারের ভিতর দিয়ে গাড়ি এসেএকটা জায়গায় দাঁড়িয়েছিল। ড্রাইভার স্টার্ট বন্ধ করে দিয়েছিল। রায়বাহাদুর

বসেছিলেন সকলের ধারে। তিনি নামলেন না দেখে জিজ্ঞাসা করলুম: আমরা কি এখানে নামব না?

তাইতো, আমরা দাঁড়িয়ে আছি কেন! কি যে কর ড্রাইভার—

ড্রাইভার হিন্দীতে বলল: গাড়ি আর ওপরে উঠবে না।

রায়বাহাদুর মুখ বার করে জায়গাটা দেখেই চেঁচিয়ে উঠলেন: আরে, কী কেলেঙ্কারি দেখুন! নামুন নামুন।

বলতে বলতেই নিজে নেমে পড়লেন। আমিও নামলুম। তারপর অনেক কষ্ট করে মামা নামলেন। স্বাতি নেমে মামীকে সাহায্য করল।

প্রস্পেক্ট হিলে উঠবার পথ এইখান থেকেই শুরু হয়েছে। একটুখানি এগিয়েই মামা জিজ্ঞাসা করলেন: কতটা উঠতে হবে?

রায়বাহাদুর বললেন: বেশি নয়, জাখু পাহাড়ের চেয়ে অনেক কম।

এ রকম উত্তরে মামার ভয় গেল না। বললেন: পাহাড়ে এলে নানা রকমের বিপদ।

রায়বাহাদুর সকলের সঙ্গে লাফিয়ে লাফিয়ে উঠতে লাগলেন। তাঁর পায়ের এমন স্বচ্ছন্দ সঞ্চালন দেখে বয়সের অনুমান করা কঠিন। আমরা তাঁকে অনুসরণ করে ধীরে ধীরে উঠতে লাগলুম। এ জাখু পাহাড়ের মতো গা বেয়ে উপরে ওঠা নয়, উঁচু নিচু পাহাড়ের উপর দিয়ে আরও উপরে ওঠা। এক সময় আমরা চূড়োয় গিয়ে পৌঁছলুম।

অপরূপ পরিবেশ। পশ্চিমের পাহাড় স্তরে স্তরে সমতল ভূমিতে নেমে গিয়ে দিগন্তে মিলেছে। বহু দূরে রূপার রেখার মতো শতদ্রুর স্রোতধারা। ক্লান্ত রক্তাক্ত সূর্য এখন বিদায়ের ক্ষণ গুনছে। পূর্বের দিগন্তকে আড়াল করেছে বলয়ের মতো সিমলার পাহাড়। স্নিগ্ধ বাতাসে সমস্ত শ্রান্তি দূর হয়ে গেল।

আমাদের প্রসন্নতা লক্ষ্য করে রায়বাহাদুর বললেন: আজ

পূর্ণিমা হলে একই সময়ে সূর্যাস্ত ও চন্দ্রোদয় দেখতেন। পূর্বে ছোট সিমলার পাহাড়ের পিছন থেকে চাঁদ উঠত।

স্বাতি বলে উঠল : সত্যি!

উৎসাহ পেয়ে রায়বাহাদুর বললেন : বুঝতেই পারছেন, সে এক অপূর্ব দৃশ্য। সেদিন এখানে দাঁড়াবার জায়গা থাকে না।

স্বাতি জিজ্ঞাসা করল : পূর্ণিমার আর কত দেরি?

স্বাতির এই প্রশ্নে আমার অনেক দিন আগের কথা মনে পড়ল। কন্যাকুমারীর সমুদ্রতীরে বসে আমরা এই পূর্ণিমার কথা ভেবেছিলুম। পৃথিবীতে তখন জ্যোৎস্নার ঢল নেমেছিল। সমুদ্রের ধারে একখানা বড় পাথরের উপর আমি উঠে বসেছিলুম। চোখের সামনে জলের শেষ নেই, শেষ নেই ঢেউএরও। একটার পর একটা ঢেউ এসে পাথরের উপর আছড়ে পড়ছে, আর চতুর্দশীর চাঁদের আলোয় এখানে ওখানে তরঙ্গবিক্ষোভের উপর ঝিকমিক করছে চন্দ্রকিরণ। সমুদ্রের গর্জন শোনা যাচ্ছে একটানা বিরামবিহীন বৈচিত্র্যহীন। ঝড়ের মতো বাতাস বইছে, বিস্রস্ত বিপর্যস্ত করে যাচ্ছে মাথার চুল আর জামাকাপড়। স্বাতি এসে কখন আমার পাশে বসেছিল খেয়াল করি নি। চমক ভেঙ্গেছিল তার আঁচলের স্পর্শে। তারপর অনেক অবান্তর কথা হয়েছিল।

বড় দুরন্ত হয়ে উঠেছিল রাতের বাতাস। অসভ্যের মত খেলা করেছিল স্বাতির আঁচল আর চুলের সঙ্গে। কাছে দূরে সর্বত্র সমুদ্রের অবিশ্রান্ত তরঙ্গভঙ্গ, আর তার নিরবচ্ছিন্ন গম্ভীর গর্জন। অস্পষ্ট ভাবে স্বাতি বলেছিল : Who knows but the world may end tonight? আজ রাতেই যে পৃথিবীর শেষ হবে না কে জানে!

আকাশে চতুর্দশীর চাঁদকে ঘিরে বসেছিল নক্ষত্রের নৃত্যসভা। নিচে আমরা দুজন। অমন পরিপূর্ণতার মধ্যেও যেন অসম্পূর্ণতার আভাস পেয়েছিলুম। মুখে উত্তর এসেছিল : পূর্ণিমার আরও একটি দিন বাকি। আজই সব কিছুর শেষ চেয়ো না।

পরে বুঝতে পেরেছি যে এক দিন নয়, পূর্ণিমার অনেক দিন বাকি ছিল। আজও সেই পূর্ণিমা আসে নি। কোন দিন আসবে কিনা তাও জানি না। সে দিন এই নিষ্ঠুর পৃথিবীর সম্বন্ধে কোন অভিজ্ঞতা ছিল না বলেই স্বাতিকে বলেছিলুম, পূর্ণিমার আর একটি দিন বাকি।

আজ স্বাতির প্রশ্নের জবাব দিতে রায়বাহাদুর অভিজ্ঞতার পরিচয় দিলেন, বললেন : তাইতো, সে খবর তো রাখি নি!

আকাশের এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত পর্যন্ত তাকিয়ে বললেন : আমি আপনাকে কাল বলব, কিংবা আজই রাতে।

পরের কথা শুনে আমি মনে মনে হাসলুম।

মামী মামাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন : এই পাহাড়ে তোমরা না মন্দিরের কথা বলেছিলে?

মামা আমার দিকে তাকালেন।

উত্তর ও দক্ষিণের দিগন্ত এখানে অবরুদ্ধ। পূর্ব থেকে পাহাড় পশ্চিমে বৃত্তাকারে এসে দক্ষিণে তারা দেবীর দিকে চলে গেছে। কয়েক হাত উত্তরে আমরা একটি ছায়াচ্ছন্ন আশ্রমের মতো দেখতে পাচ্ছিলুম। আমি সেই দিকে তাকালুম।

রায়বাহাদুর বলে উঠলেন: কামনা দেবীর মন্দির! আসুন আমার সঙ্গে।

বলে হনহন করে উত্তরের দিকে এগিয়ে গেলেন। মামী তাঁকে সকলের আগে অনুসরণ করলেন।

কেন জানি না আমি পূর্বের আকাশের দিকে তাকিয়ে অন্যমনস্ক হয়ে গিয়েছিলুম। ঐ দিকের আকাশ থেকে ওঠে পূর্ণিমার চাঁদ। কন্যাকুমারীতেও একজন বলেছিলেন যে একটি পূর্ণিমার জন্য দীর্ঘ পথ অতিক্রম করে এসেছেন। একই মুহূর্তে সূর্যাস্ত ও চন্দ্রোদয় হবে সমুদ্রের বুকে। এমন অপরূপ দৃশ্য পৃথিবীর আর কোথাও নাকি নেই। এখানেও আমরা পূর্ণিমা দেখতে পেলুম না।

স্বাতি আমার পাশে দাঁড়িয়ে বলল : কী ভাবছ ?

আমি চমকে চেয়ে দেখলুম যে মামাও অনেকটা এগিয়ে গেছেন। তাই সাহস পেয়ে বললুম : পূর্ণিমার কথা।

কোন মন্তব্য না করে স্বাতি হাসল।

আমি এই হাসির মানে বুঝি। তাই বললুম : ভাবছ কবিতা লিখব!

না।

তবে কি গান গাইব ?

তাও না।

তা হলে ?

স্বাতি বলল : পূর্ণিমার এখনও অনেক দেরি আছে।

অপরিসীম বিস্ময়ে আমার রোমাঞ্চ হল। স্বাতিও কি আজ আমারই মতো একই কথা ভাবছে! একটি মুহূর্ত আমি স্তব্ধ হয়ে তার মুখের দিকে তাকিয়ে দেখলুম। তারপর বললুম : দেরি থাকলে ক্ষতি নেই, কিন্তু—

কিন্তু কী ?

কোন দিন কি পূর্ণিমা আসবে ?

প্রসন্ন হাসিতে তার মুখ উদ্ভাসিত হল। বলল : এস, কামনা দেবীকে এই কথা জিজ্ঞেস করি।

বলে আর দাঁড়াল না। স্বচ্ছন্দ গতিতে এগোল মন্দিরের প্রাঙ্গণের দিকে।

ছোট মন্দির। তার ভিতর কামনা দেবীর মূর্তি দেখলুম। শুধু পাহাড়ী মেয়ে পুরুষ নয়, এ যুগের শিক্ষাভিমানী মানুষও আসে দেবীর মন্দিরে। নানা অভিলাষে মানত করে, সে প্রার্থনা নাকি ব্যর্থ হয় না। জনশ্রুতিতে যাঁদের গভীর বিশ্বাস, তাঁরা এই দেবীকে মনেপ্রাণে জাগ্রত মনে করেন।

রায়বাহাদুর মামীকে বলছিলেন : মায়ের কাছে নিবেদন করলে আপনার কোন বাসনা অপূর্ণ থাকবে না।

মামার দিকে তাকিয়ে বললেন : বুঝতেই পারছেন—

মামা বললেন : বুঝেছি।

স্বাতি এবারে হাসল না। মায়ের সঙ্গে মন্দিরের ভিতরে গিয়ে গলায় আঁচল জড়িয়ে প্রণাম করল কামনা দেবীকে। অনেকক্ষণ ধরে প্রণাম করল। কী প্রার্থনা জানাল, আমি তা জানতে পারলুম না।

বাহির থেকে বারান্দায় মাথা ঠেকিয়ে আমিও দেবীকে প্রণাম করলুম। কিন্তু কিছুই চাইতে পারলুম না। দেবতাকে প্রণাম করবার সময় আমি ভাবি, কী চাইব। কোন চাইবার কথা আমার মনে আসে না। আমি ভাবি, দেবতা তো অন্তর্যামী, তাঁর কাছে কেন চাইতে হবে। তাঁর অজানা তো কিছুই নেই, দেবার হলে তিনি নিজেই দেবেন। তাঁর কাছে চেয়ে নিজেকে কেন ছোট করি! কামনা দেবীর কাছেও আমি কিছু চাইতে পারলুম না।

সূর্যাস্তের পরে আমরা পাহাড় থেকে নামলুম। আকাশে চাঁদ ওঠে নি, তারাও ওঠে নি একটাও। তবে অন্ধকার জমেছে সিমলার পাহাড়ে, আর বাতি জ্বলে উঠছে একটা একটা করে।

একটা জায়গায় এসে আমরা থমকে দাঁড়ালুম। তখন অন্ধকার ঘন হয়ে উঠেছে। আর অসংখ্য বাতি জ্বলে উঠেছে সর্বত্র। পরিবেশটা ভুলে যেতে পারলে মনে হবে, ও কোন শহরের আলো নয়, কালো আকাশে অসংখ্য নক্ষত্র আমাদের দিকে চেয়ে আছে।

রায়বাহাদুর বললেন : আর একটু দেরি করলে আকাশে আর পাহাড়ে কোন প্রভেদ থাকবে না। আকাশের তারায় আর সিমলার আলোয়। সেও এক অপূর্ব দৃশ্য, বুঝতেই পারছেন।

মনে মনে সকলে সে কথা স্বীকার করলেন।

১৭

সকালবেলায় মামার সঙ্গে মামীর বিরোধ বেধেছিল রায়-বাহাদুরকে নিয়ে। মামা বললেন : তুমি যাই বল, লোকটার মতলব ভাল নয়।

মামী বললেন : তুমি খারাপ মতলব তার কী দেখলে ?

চা শেষ করে মামা পাইপ ধরিয়েছিলেন। খানিকটা ধোঁয়া মুখে নিয়ে বললেন : এমন এঁটুলির মতো কেন লেগে আছে, দরকার আছে কিছু ?

দরকারের কথা কেন ভাবছ! পরার্থে কি কিছু করতে নেই নাকি ?

গম্ভীর ভাবে মামা বললেন : যুগটাকেই তুমি পালটে দিতে চাও! ভারি বিপদের কথা।

আমি তাঁদের অন্য প্রসঙ্গে আনবার জন্য স্বাতিকে জিজ্ঞাসা করলুম : আজ কোথাকার প্রোগ্রাম ?

স্বাতি সকৌতুকে বলল : রায়বাহাদুর গাড়ি নিয়ে এলে ঠিক হবে।

মামা বিরক্ত হলেন, বললেন : আবার ঐ লোকটার সঙ্গে !

মামী এ কথার প্রতিবাদ করতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু পারলেন না। দরজায় আঘাত পড়ল।

মামা বিকৃত মুখে বললেন : ভগ্নদূত !

কিন্তু ঘরে এল হোটেলের বেয়ারা, তার হাতে একখানি কার্ড। মামা সেই কার্ডখানি নিয়ে আমার দিকে এগিয়ে দিলেন, বললেন : চোখে চশমা নেই, দেখ তো কে।

নাম পড়েই আমি চমকে উঠলুম।

স্বাতি জিজ্ঞাসা করল : কে গোপালদা ?

বললুম : আমার প্রকাশক।

মামা বললেন : তা বাইরে কেন, নিয়ে এস তাঁকে। আনে দেও, আনে দেও।

বেয়ারার সঙ্গে আমিও তাঁকে আনতে গেলুম।

অমিয়বাবু সপরিবারে এসেছেন, স্ত্রী ও কন্যাকে নিয়ে। সহাস্যে তিনি তাঁদের সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দিলেন। আমিও তাঁদের ঘরে এনে সকলের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলুম।

মামা বললেন : গোপালকে আপনি খুঁজে বার করলেন কী করে?

অমিয়বাবু হেসে বললেন : দৈবক্রমে।

কিছু বুঝতে না পেরে মামা তাঁর মুখের দিকে তাকালেন।

আর অমিয়বাবু আমার মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন : আপনার সঙ্গে যে এখানে এমন ভাবে দেখা হবে, এ আমি স্বপ্নেও ভাবি নি। আপনি কাশী হরিদ্বারের কথা বলেছিলেন, কিন্তু সিমলার কথা তো বলেন নি!

মামা বললেন : সিমলায় তো আমিই ধরে আনলুম।

ভাল করেছেন।

কিন্তু আপনি কোথায় খবর পেলেন?

কাল সন্ধ্যাবেলায় কালীবাড়িতে গিয়ে খবর পেলুম যে একটা সম্মিলনীর ব্যবস্থা হচ্ছে। গোপালবাবু তাতে ভাষণ দেবেন। আর রায়বাহাদুর এখন গোপালবাবুকে সিমলা দেখাচ্ছেন।

মামা বললেন : চেনেন নাকি রায়বাহাদুরকে?

অমিয়বাবু বললেন : মিস্টার রায়কে আমি কলকাতা থেকে চিনি, কিন্তু এখানকার সবাই তাঁকে রায়বাহাদুর বলেন দেখছি।

বলে হাসতে লাগলেন।

মেয়েরা নিজেদের মধ্যে গল্প শুরু করেছিলেন, কিন্তু স্বাতি মাঝে মাঝে আমাদের দিকে চেয়ে দেখছিল।

আমি জিজ্ঞাসা করলুম : আপনি কি মোটরে এসেছেন?

হ্যাঁ। কেন বলুন তো?

আপনাদের রিসিভ করতে রায়বাহাদুর কাল সারা দিন স্টেশনে দাঁড়িয়ে ছিলেন।

সত্যি নাকি!

বললুম: তাই তো বললেন।

অমিয়বাবু লজ্জিত ভাবে বললেন: আমি কি তাঁকে তাই লিখেছিলুম!

মামা স্বাতির দিকে তাকাতেই সে তাঁর ইঙ্গিতটা বুঝল। নিঃশব্দে উঠে সে চায়ের ব্যবস্থা করতে বাহিরে গেল।

আমি বললুম: সে কথা তিনি মনে করতে পারেন নি।

খানিকটা আশ্বস্ত হয়ে অমিয়বাবু বললেন: আজ একটা নিবেদন নিয়ে আপনাদের কাছে এসেছি। আজ বিকেলবেলায় আপনারা আমাদের সঙ্গে চা খাবেন।

মামী শুনতে পেয়েছিলেন। বললেন: না না, তার কী দরকার আছে!

অমিয়বাবু বললেন: দরকার আমাদের। এখানকার অনেকেই গোপালবাবুর সঙ্গে পরিচিত হতে চাইছেন। বিশেষ ভাবে একজন মহিলা লেখিকা।

আমি জিজ্ঞাসা করলুম: কে বলুন তো?

বিকেলবেলায় নিজের চোখেই তাঁকে দেখবেন। বেশি দূর নয়, পাশের হোটেলেই আমরা উঠেছি। ক্লার্ক্স।

আমি জানতুম যে তিনি ঐ রকমেরই একটা শৌখিন হোটেলে উঠবেন। মানুষ তো শৌখিন। জিজ্ঞাসা করলুম: আমরা যে এই হোটেলে উঠেছি, এ কথা কার কাছে জানলেন?

অমিয়বাবু সকৌতুকে হাসলেন, তারপর বললেন: টেলিফোনে। নিজেদের হোটেলের ম্যানেজারকে বলেছিলাম খবর নিতে। আপনার নামটাও বলেছিলাম।

বলে মামার দিকে তাকালেন।

মামা বললেন : ওরাই খোঁজ দিলে !

আমি বললুম : রায়বাহাদুর কিন্তু নিজে খুঁজতে বেরিয়েছিলেন। একটার পর একটা হোটেলে খবর নিতে নিতে কালীবাড়ি থেকে এখানে এসে পৌঁছেছিলেন।

অমিয়বাবু চোখ বড় বড় করে আমার দিকে তাকালেন। তারপর বললেন : ধন্য অধ্যবসায়।

বিকেলবেলায় আমরা তাঁর নিমন্ত্রণ রক্ষা করব এই কথা নিয়ে অমিয়বাবু উঠলেন। কিন্তু দরজার কাছে গিয়ে ধাক্কা খেয়ে ফিরলেন। বাহির থেকে রায়বাহাদুর ঘরে ঢুকছিলেন। ভিতরে পা দিয়েই চেঁচিয়ে উঠলেন : আরে মশাই, কোথায় আমি আপনাদের সারপ্রাইজ দেব, তা নয় তো, বুঝতেই পারছেন—

অমিয়বাবু বললেন : আমরাই আপনাকে সারপ্রাইজ দিলাম, এই তো।

তা আপনারা এলেন কি হাওয়াই জাহাজে ?

অমিয়বাবুরা আর বসলেন না, দ্বিতীয়বার নমস্কার করে বেরিয়ে গেলেন। রায়বাহাদুরও তাঁদের সঙ্গে এগিয়ে গেলেন। আমি তাঁদের রাস্তা পর্যন্ত পৌঁছে দিলুম।

পিছনে দেখলুম স্বাতিও আসছে। বলল : এখন কী করবে ?

এবারে তো যবনের হাতে পড়েছি !

রায়বাহাদুরকে তুমি যবন বলছ ?

তাঁকে আমি ভয় পাই নে।

তবে কি আমাকে ভয় পাও ?

গম্ভীর ভাবে বললুম : ভয় অপদেবতাকে, ঘাড় মটকে দিলে আর জোড়া লাগবে না।

স্বাতি তৎক্ষণাৎ উত্তর দিল : ছিন্নমস্তার মতো তুমি নিজের ঘাড় নিজেই মটকাবে।

ও মেয়েদের কাজ, পুরুষে তা পারে না।

পুরুষের কাজ পুরুষে পারে তো ?

কথার যুদ্ধে আমার প্রবৃত্তি ছিল না, বললুম : রেগে গেলে তোমাকে ভারি সুন্দর দেখায়।

সকৌতুকে স্বাতি বলল : মিথ্যে কথা বলতে কবে শিখলে ?

কেন ?

সৌন্দর্য দেখার চোখ তো তোমার নয়, তোমার চোখ পুরাতত্ত্বের পাতায়। তুমি সৌন্দর্যের কী:বোঝ ?

চোখ তো কানা নয়, তাই মাঝে মাঝে তাকিয়ে দেখি। ব্রাউনিঙের সেই কবিতাটি তো তোমার মনে আছে—

And you, great sculptor—so, you gave
A score of years to Art, her slave,
And that's your Venus, whence we turn
To yonder girl that fords the burn !

স্বাতি জিজ্ঞাসা করল : কোন্ কবিতা বল তো ?

কন্যাকুমারীতে সমুদ্রের ধারে বসে তুমি আমাকে একটি লাইন শুনিয়েছিলে—who knows but the world may end to-night ? জীবনের মূল্যায়নের কথা।

মনে পড়েছে। কিন্তু সমস্ত কবিতাটা আমার মনে নেই।

THE LAST RIDE TOGETHER. এই যখন আমার ভাগ্যে লেখা ছিল, আমার প্রেমের যখন আর কোন মূল্য পাব না—

বাধা দিয়ে স্বাতি বলল : এ কবিতা তোমার আজ কেন মনে পড়ছে ?

মনে পড়ছে সৌন্দর্যের কথায়, শিল্পের কথায়। শিল্পী তার সারা জীবনের সাধনায় যে ভেনাস গড়েছে তার দিকে আমাদের চোখ নিবদ্ধ থাকে না। খোলা জানালা দিয়ে গ্রামের মেয়েকে যদি ছপছপ করে নদী পেরতে দেখি, তবে তারই সৌন্দর্যের দিকে নির্বাক বিস্ময়ে থাকি চেয়ে। শিল্পীর সাধনার দাম তো এই।

তোমার কথায় একটা হতাশার সুর শুনছি।

রাস্তার উপরে আমরা দাঁড়িয়ে থাকি নি। ফিরেও আসি নি বন্ধ ঘরে। হোটেলের সামনে পায়চারি করতে করতে আমরা কথা বলছিলুম। বললুম : জীবনের আকাশে আশার রামধনু আজও দেখতে পাই নি।

গোপালদা!

বল।

স্বাতি গভীর ভাবে আমার মুখের দিকে তাকাল! তারপর বলল : রামধনু তো সত্য নয় গোপালদা, তার জন্যে তোমার ক্ষোভ কেন?

আমার একটা দীর্ঘশ্বাস পড়ল। কোন উত্তর দিতে পারলুম না।

স্বাতি বলল : জীবনে সত্য হল ভাগ্যের সঙ্গে যুদ্ধ। সেই যুদ্ধে ক্ষত-বিক্ষত হয়ে পালালে চলবে না। জয় আর কজনের হয়! পরাজয় না হলেই হল।

তবে কি সারা জীবন মানুষ যুদ্ধ করবে?

ভাগ্যের কাছে যে হার মানে না, ভাগ্যই তার কাছে হার মানে।

স্বাতির কথায় আমার রোমাঞ্চ হল। খানিকক্ষণ তার মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে বললুম : এ কি তোমার নিজের কথা?

এ আমার বিশ্বাসের কথা।

বললুম না যে এ কথায় আমারও বিশ্বাস আছে সম্পূর্ণ। তবু আমি তর্ক করলুম : সবার বেলায় এ কথা বোধ হয় খাটে না।

স্বাতি বিরক্ত হল, বলল : দোহাই তোমার, তুমি এ নিয়ে তর্ক ক'রো না।

কেন?

তুমি তো তোমার ভাগ্যের সঙ্গে সন্ধি করেছ। নিজের ওপরে বিশ্বাস থাকলে কি তুমি তাই করতে?

ঠিক এই মুহূর্তে আমার প্রতিবাদ করবার ইচ্ছা হল। ইচ্ছা হল, আমার সকল কথা তাকে খুলে বলি। ভাগ্যকে আমি মেনে নিই নি,

নেবও না কোন দিন। এত দিন তো যুদ্ধের জন্যই প্রস্তুত হয়েছি, এইবারে বিদ্রোহ ঘোষণা করব। স্বাধীন ভাবে সমান ভাবে বাঁচবার অধিকার তো সকলে আজও পায় নি, এক দিন নিশ্চয়ই পাবে। সে বিশ্বাসও আমার আছে। কিন্তু আমাকে যুদ্ধ করতে হবে। সমাজে প্রতিষ্ঠার জন্য আমাকে যোগ্যতার পরিচয় দিতে হবে সগৌরবে। আমি সেই পরীক্ষার জন্যে তৈরি হয়েছি।

আমার উত্তর না পেয়ে স্বাতি বলল : চুপ করে রইলে যে?

নিজেকে আমি সামলে নিয়েছিলুম। বললুম : আজ এ কথার প্রতিবাদ করব না।

কোন দিন করবে কি?

তুমি কি তার জন্যে অপেক্ষা করবে?

সহসা স্বাতি এ কথার উত্তর দিল না। কিন্তু আমি তার মুখের দিকে তাকিয়ে হতবুদ্ধি হয়ে গেলুম। দু চোখ তার ছলছল করছে। এ শুধু বেদনা নয়, এর সঙ্গে অভিমান আছে মিশে। তাড়াতাড়ি আমি বললুম : তোমার উত্তর আমি জানি।

তবে কেন প্রশ্ন কর?

কেন করি, তা কি আমিই জানি! স্বাতিকে কী উত্তর দেব!

১৮

স্বাতি হঠাৎ সচেতন হয়ে উঠল, বলল : এস আমার সঙ্গে ।

বলে ম্যানেজারের ঘরে আমায় টেনে আনল ।

লম্বা রোগা ভদ্রলোকটি কাগজপত্র নাড়াচাড়া করছিলেন। তাঁকে জিজ্ঞাসা করল : আপনার বন্ধুটি কখন আসবেন ?

মুখ তুলে ম্যানেজার নমস্কার করলেন, বললেন : বসুন না, সোহল এখুনি এসে পড়বে।

স্বাতি বলল : আমরা বাইরে পায়চারি করছি, এলে খবর দেবেন।

আচ্ছা।

বলে ম্যানেজার আবার হিসাবে মন দিলেন। আর আমরা বেরিয়ে এলুম সামনের রাস্তায়।

সোহলকে আমি চিনি না, তার নামও শুনি নি কোন দিন। জিজ্ঞাসা করলুম : কার খোঁজ করছিলে ?

স্বাতি হাসল।

বললুম : এতে হাসবার কী হল ?

তোমার সন্দেহ দেখে।

সন্দেহ নয়, কৌতূহল। বিদেশে তুমি নতুন মানুষের খোঁজ নিচ্ছ, তাইতেই কৌতূহল।

স্বাতি বলল : বাঙলায় একেই বলে, যার জন্যে করি চুরি সে-ই বলে চোর।

ঠিক তা নয়, তুমি চুরি করছ বলে আমি মনে করি নি।

তবে কৌতূহল কেন ?

কৌতূহল শেষ হয়ে গেলেই তো জীবনের দাম ফুরল।

কথাটি ভাল বলেছ।

তবে উত্তরটি দাও।

স্বাতি আর দেরি করল না, বলল : গত দুদিনই ম্যানেজারের ঘরে এক শিখ ভদ্রলোককে দেখেছি। তুমি হয়তো লক্ষ্য কর নি। ভদ্রলোক বসে বসে শুধু বই পড়েন। বই পড়বার জন্যেই যেন এখানে আসেন।

মনে হল, আমিও যেন এই ভদ্রলোককে দেখেছি, কিন্তু তার বেশি কিছু লক্ষ্য করি নি।

স্বাতি বলল : কাল সন্ধ্যাবেলায় তাঁর সঙ্গে আলাপ করে-ছিলাম। তাঁর হাতের বইখানাও দেখেছিলাম। গুরুমুখী ভাষায় লেখা একখানি উপন্যাস। তখুনি আমার তোমার কথা মনে পড়ল।

কেন ?

ত্রিচিনপল্লীর কথা তুমি ভুলে গেছ! কফি খেতে খেতে এক উকিল ভদ্রলোকের কাছে তুমি তামিল সাহিত্যের ইতিহাসখানাই জেনে নিলে!

হেসে বললুম : অনেকের কাছেই আমি অনেক সাহিত্যের ইতিহাস জেনেছি।

তোমার জন্যেই ব্যবস্থা করলাম। ভদ্রলোক আজ তোমাকে পাঞ্জাবী সাহিত্যের কথা শোনাবেন। সাহিত্যের একখানা ইতিহাস ওঁর কাছে আছে, মোটামুটি একটু দেখে আসবেন।

আশ্চর্য!

মানে ?

আমার ওপর তোমার দরদ দেখে আশ্চর্য হচ্ছি।

এই দরদের কারণ আছে। এবারে যে সব জায়গায় তোমাকে নিয়ে যাব, তাতে লেখার উপাদান বেশি পাবে না। বড় মন্দির নেই যে স্থাপত্য নিয়ে আলোচনা করবে, তেমন কোন দুর্গ নেই যে বীরত্বের কাহিনী শোনাবে, প্রাচীন ধ্বংসস্তূপ থাকলেও ইতিহাস ও পুরাতত্ত্বের কাহিনী শোনাতে পারতে।

পাহাড়ের বর্ণনা বেশি করলে পাঠক তোমাকে মারতে আসবে। তাই ভাবলাম—

হেসে বললুম : বুঝেছি।

স্বাতি বলল : সিমলা ছাড়লেই তো আমাদের এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় ছুটতে হবে। কোন এক জায়গায় স্থির হয়ে বসে সাহিত্যের ইতিহাস শোনবার সুযোগ পাবে না।

আমি এই প্রসঙ্গে একটু কৌতুক করব ভেবেছিলুম, কিন্তু তার আগেই সেই শিখ ভদ্রলোক হোটেলে ঢুকে পড়লেন। স্বাতি এগিয়ে গিয়ে তাঁকে নমস্কার করল। আমিও এগিয়ে গেলুম। তারপর এক সঙ্গে ম্যানেজারের ঘরে এসে বসলুম।

সর্দারজী যখন তাঁর বইএর পাতা উলটে দেখছিলেন, আমি আশ্চর্য হচ্ছিলুম স্বাতির ব্যবস্থা দেখে। কখন সে এই ভদ্রলোকের সঙ্গে পরিচয় করে আমার জন্য এই কাজ করেছে তা আমি জানতে পারি নি। ইঙ্গিতেও প্রকাশ করে নি এই ঘটনা। আমার মনে হল, এই পরিবর্তন তার নূতন, আর নূতন বলেই সযত্নে সে তার মনোভাব আমার কাছে গোপন করেছে। আমি আজ শ্রোতার মতো নীরবে বসে রইলুম।

স্বাতি বলল : আপনাকে আমরা বেশি কষ্ট দেব না। পাঞ্জাবী সাহিত্য সম্বন্ধে মোটামুটি একটা ধারণা হলেই আমরা সন্তুষ্ট হব।

সর্দারজী মুখ তুলে বললেন : আমি অল্পই জানি। বেশি কিছু বলা আমার সাধ্যের অতীত।

একটু থেমে বললেন : পশ্চিম পাঞ্জাবের সাহিত্য সম্বন্ধে আমি কিছুই জানি না। শুধু তাদের ভাষার নাম জানি। কেউ লহন্দী বলেন, কেউ বলেন লহন্দে-দি-বোলিঃ। আপনারা জানেন কি না জানি না, আমাদের সাহিত্য পাঠের একটা মস্ত বাধা হল লেখার হরফ। আমরা গুরুমুখীতে লিখি, এই হরফ দেবনাগরীর মতো। মুসলমানেরা লেখেন ফার্সী হরফে। সুফী কবিদের লেখা কবিতা ও

পাঞ্জাবের রোমান্টিক কাব্যগুলি সব ফার্সীতে লেখা। তবে আমাদের কাছে একটা আনন্দের কথা এই যে আজকাল ফার্সীর চেয়ে গুরু-মুখীতে লেখা পাঞ্জাবী সাহিত্যেরই বেশি শ্রীবৃদ্ধি হচ্ছে।

সর্দারজী তাঁর বইয়ের পাতা ওলটালেন কয়েকখানা, পড়লেন কয়েকটা লাইন। তারপর বললেন : বাবা ফরিদ পাঞ্জাবের প্রথম কবি। ইনি পাঞ্জাবী ভাষায় দোঁহা রচনা করে ইসলাম ধর্ম প্রচার করেন।

স্বাতি প্রশ্ন করল : এ কোন্ সময়ের কথা ?

সর্দারজী বললেন : বাবা ফরিদ বাবরের সমসাময়িক। মানে ষোড়শ শতাব্দীর প্রথম দিকে বলতে পারেন। আমাদের আদি গ্রন্থ গ্রন্থসাহেবের রচনাকালও এই শতাব্দীতে পঞ্চম গুরু অর্জুন সিংহের সময়। শিখ ধর্মের প্রতিষ্ঠাতা গুরু নানক বাবরের চেয়ে বয়োজ্যেষ্ঠ ছিলেন এবং বাবরের মৃত্যুর পরেও আট বৎসর জীবিত ছিলেন। আমাদের শেষ গুরু গোবিন্দ সিংহ দশম গুরু। এঁরা সকলেই পাঞ্জাবী সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধির জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করেছিলেন। শোনা যায় যে গুরু গোবিন্দ সিংহ নাকি সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ দিকে পঞ্চাশ বাটজন কবিকে তাঁর দরবারে আসন দিয়েছিলেন এবং সমস্ত ধর্মের গ্রন্থ পাঞ্জাবীতে অনুবাদ করিয়েছিলেন। নানা ভাষার সাহিত্যেরও অনুবাদ করা হয়। লোকে বলে যে এই সমস্ত বইএর পাণ্ডুলিপির ওজন ছিল আঠারো মণ, মোগলরা সে সব নষ্ট করে।

স্বাতি আশ্চর্য হয়ে বলল : সত্যি !

ম্যানেজার এতক্ষণ নীরবে সব শুনছিলেন, এবারে বলে উঠলেন : এ সব গল্প।

সর্দারজী বললেন : কিছু নিশ্চয়ই সত্য আছে। তা না হলে এ সব গল্প কেন প্রচলিত হল !

আমি বললুম : এ যুগের কথা কিছু বলুন।

সে যুগের পরেই এ যুগের কথা। স্বীকার করতে লজ্জা নেই যে আমাদের নিজেদের দোষেই পাঞ্জাবী সাহিত্য আজও সমৃদ্ধ হতে পারে নি। পাঞ্জাবের শক্তিশালী লেখকেরা কেউ ইংরেজীতে লিখলেন, কেউ লিখলেন উর্দুতে, পাঞ্জাবী ভাষায় অনেকেই লিখলেন না। ইক্‌বাল কৃষণ চন্দরের নাম শুনেছেন, মুল্‌করাজ আনন্দ্‌ও আপনাদের পরিচিত। এই রকম নাম আরও অনেক আছে, যাঁরা পাঞ্জাবী ভাষায় সাহিত্য রচনা করলেন না। যাঁরা মাতৃভাষায় লিখলেন, তাঁদের মধ্যে প্রথম নাম হল ভাই বীর সিংহ। ইনি উনবিংশ শতাব্দীতে লিখতে শুরু করেছেন। শুধু কবিতা ও নাটক নয়, উপন্যাস ও গদ্যেও তাঁর সমান কৃতিত্ব। দীর্ঘ জীবনের অধিকারী হয়ে তিনি এত লিখেছেন যে লোকে বলে তাঁর রচনাবলী এনসাইক্লো-পিডিয়ার মতো বিরাট গ্রন্থ হবে।

এই কথাটি আমি কোথাও পড়েছিলুম বলে মনে হল। বোধহয় কোন সাময়িক পত্রে পড়েছি। ১৯৫৫ খ্রীষ্টাব্দে যখন তিনি আকাদেমী পুরস্কার পেয়েছিলেন তখন।

সর্দারজী বললেন: 'রাণা সুরৎ সিং' তাঁর একখানি নাটক, অমিত্রাক্ষর ছন্দে লেখা। রচনায় শিখ ধর্মের প্রভাব এমন স্পষ্ট যে আমরা এই বইকে গ্রন্থসাহেবের মতোই মর্যাদা দিই। তাঁর উপন্যাস বাস্তবানুগ নয়, বরং তাতে ধর্মপ্রচারের চেষ্টা এমন উৎকট যে আজকাল অপাঠ্য মনে হয়।

যদি কবিতা কারও ভাল লাগে, তাহলে ধনীরাম চাত্রিকের 'চন্দনবারী' বা 'কেশরকিয়ারী' পড়া উচিত। তাঁর লিরিকে প্রকৃতি-প্রেম ও দেশাত্মবোধ সমান আদর পেয়েছে। ভাই পূরণ সিংএর 'খুলে ময়দান'এ নানা নূতন ছন্দের সন্ধান পাওয়া যাবে। এঁদের সঙ্গে আরও অনেকে কবিতা লিখেছেন। তাঁদের সকলের নাম আপনারা মনে রাখতেও পারবেন না, দরকারও নেই মনে রাখবার। তার চেয়ে একেবারে আধুনিক কালের কয়েকজন কবির নাম বলি।

সর্দারজী একটু ভেবে বললেন ঃ শ্রীমতী অমৃত প্রীতমের কবিতা আপনাদের ভাল লাগবে। সরল ভাষা ও সুললিত ছন্দে ইনি ভাল প্রেমের কবিতা লেখেন। প্রীতম সিং ও মোহন সিংও ভাল কবি। প্রীতম সিং একটু সিনিক, পাশ্চাত্য আঙ্গিকেও লিখে থাকেন। মোহন সিং কবি সমালোচক ও একখানি মাসিক পত্রিকার সম্পাদক। দৃষ্টি বৈজ্ঞানিকের মতো, কিন্তু প্রাচীন ও লোকসাহিত্যে গভীর অনুরাগী। সেদিন ইনিও আকাদেমী পুরস্কার পেলেন।

কবিদের পরেই নানক সিংএর নাম করতে হয়। তিনি পাঞ্জাবের প্রথম ঔপন্যাসিক। মধ্যবিত্ত সমাজ নিয়ে তিনি লিখেছেন, কিন্তু সকল রকমের সমস্যাকে এড়িয়ে যাবার জন্য তাঁর কাহিনীগুলি দুর্বল। বরং তাঁর ছোট গল্পগুলি তুলনায় অনেক ভাল। বলবন্ত সিং বা হরনামদাসও উপন্যাসে তেমন আধুনিক নন। এঁদের চেয়ে সন্ত সিংএর উপন্যাসে বাস্তবের চিত্র বেশি রূপায়িত হয়েছে। কৃষকদের জীবন নিয়ে লেখা তাঁর ছোট গল্পগুলির একটা বিশেষ আবেদন আছে।

ছোট গল্পের লেখকদের মধ্যে সব চেয়ে শক্তিশালী হলেন সর্দার গুরুবক্স সিং। দীর্ঘ দিন বিদেশে কাটিয়ে তিনি আধুনিক জীবনবোধে বিশ্বাসী। তাঁর প্রথম গল্পগুলি মনোবিকারের, অশ্লীলতাদুষ্ট বলে নিন্দিত হয়েছে। এখন সেই দোষমুক্ত হয়ে মাসিক পত্রিকার সম্পাদনা করছেন।

আর একজন ছোট গল্পের লেখকও এঁরই মতো ফ্রয়েডকে অবলম্বন করেছেন। তাঁর নাম কর্তার সিং দুগাল। ধনী সমাজের দুর্বলতা নিয়ে তিনি গল্প লেখেন।

আমার দিকে চেয়ে সর্দারজী বললেন ঃ শুনে আশ্চর্য হবেন যে বাঙলা দেশের পটভূমিতেও অনেক সুন্দর ছোট গল্প আছে, বাঙালী নায়ক নায়িকা নিয়েও আছে।

সত্যি নাকি!

সর্দারজী হেসে বললেন : যাঁরা বাঙলাদেশে কিছুকাল কাটিয়েছেন, তাঁরা বৈচিত্র্যের জন্য এ রকম গল্প লিখবেনই। এঁদের মধ্যে প্রধান হলেন সুজন সিং ও হরনামদাস। আরও অনেকে লিখেছেন।

স্বাতি বলল : ভারি আশ্চর্যের কথা!

বললুম না যে শিখ ও অবাঙালা নায়ক নায়িকা নিয়ে বাঙলাতেও অনেক গল্প উপন্যাস আছে। সব সাহিত্যেই আছে।

সর্দারজী বললেন : আশ্চর্য আর কী। প্রাদেশিকতার বাধা তো আমাদের উত্তীর্ণ হতেই হবে, সাহিত্যই তাতে সব চেয়ে বেশি সাহায্য করতে পারে।

তারপর বললেন : আজকাল আমরা দেবিন্দর সত্যার্থী ও বলবন্ত সিংএর লেখা আগ্রহ নিয়ে পড়ছি। এঁদের জীবনঘনিষ্ঠ বাস্তব লেখা অনেকেরই ভাল লাগে। আর একটি বলিষ্ঠ নাম নওতেজ, সর্দার গুরুবক্স সিংএর পুত্র। এঁর লেখা বোধহয় আপনারা পড়ে থাকবেন।

কেমন করে?

একেবারে নবীন লেখক হলেও এঁর কয়েকটি ছোট গল্প নানা ভাষায় অনূদিত হয়েছে। লেখায় তাঁর বামপন্থী দৃষ্টিভঙ্গী।

সর্দারজী খানিকক্ষণ ভেবে বললেন : এর পর কী বলি?

আমি বললুম : নাটক ও প্রবন্ধ সাহিত্য সম্বন্ধে কিছু বলেন নি।

নাটক! হ্যাঁ, নাটকও কিছু আছে বৈকি। 'রানা সুরৎ সিং'-এর কথা তো আগেই বলেছি। 'সুভদ্রা' আর একখানি জনপ্রিয় নাটক। লেখক ঈশ্বরচন্দ্র নন্দা। ইনি এ যুগের নাট্যকার, কিন্তু সংস্কারবাদী। সুভদ্রায় যেমন তিনি বিধবা বিবাহকে সমর্থন করেছেন, তেমনই অন্য নাটকে কোন না কোন সামাজিক সমস্যাকে প্রাধান্য দিয়েছেন। তাঁর আঙ্গিক ভাল, সংলাপও ভাল, আর কাহিনী পরিবেশনের গুণে নাটকগুলি জনপ্রিয় হয়েছে। তবু বলব যে পাঞ্জাবী একাঙ্ক নাটক সমৃদ্ধতর।

ঠিক এই সময় মামা এসে দরজার সামনে দাঁড়ালেন। তাঁকে দেখতে পেয়ে আমি তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এলুম।

একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে মামা বললেনঃ তবু ভাল। তোমার মামী তোমাদের জন্যে ভেবেই অস্থির।

আমি লজ্জিত হলুম। বললুমঃ সত্যিই আমাদের বলে বেরনো উচিত ছিল।

মামা বললেনঃ তুমিও যেমন!

বলে আর দাঁড়ালেন না। নিজেদের ঘরের দিকে চলে গেলেন।

স্বাতি দরজার দিকে পিছন ফিরে বসেছিল বলে মামার আগমনের কথা জানতে পারে নি। সে বসে বসে সর্দারজীর গল্পই শুনছিল। আমি নিজের জায়গায় ফিরে এসে দেখলুম প্রবন্ধ সাহিত্যের কথা হচ্ছে।

সর্দারজী বলছিলেনঃ ইতিহাস সাহিত্যের ইতিহাস ধর্ম ও গুরুদের জীবনী নিয়ে কিছু গ্রন্থ রচিত হয়েছে। প্রবন্ধের ধারায় ভাই পূরণ সিংএর নাম সকলের আগে করা উচিত, আর সকলের শেষে সর্দার গুরুবক্স সিং। অন্য নাম না জানলেও কোন ক্ষতি নেই।

আমি জিজ্ঞাসা করলুমঃ অনুবাদের ক্ষেত্র কেমন সমৃদ্ধ?

অসঙ্কোচে সর্দারজী বললেনঃ একেবারেই সমৃদ্ধ নয়। ফার্সী ও সংস্কৃত থেকে কিছু বইএর অনুবাদ হয়েছে, কিছু ইংরেজী থেকে। আপনাদের বাঙলা বইএর কিছু অনুবাদ হয়েছে হিন্দী থেকে। তবে আশার কথা এই যে পাঞ্জাবী সাহিত্য আর বেশি দিন পিছিয়ে থাকবে না। নূতন উদ্যমের এখন আর অভাব নেই।

১৯

অমিয়বাবুর চায়ের নিমন্ত্রণে যেতে মামী রাজী হলেন না। কাজেই মামাও গেলেন না। স্বাতিকে পাঠাবারও মামীর ইচ্ছা ছিল না, কিন্তু মামা জোর করলেন বলেই পাঠাতে হল। বিকেল চারটেয় অমিয়বাবু টেলিফোন করে মনে করিয়ে দিয়েছিলেন, সকলকে আসবার জন্যে বিশেষ ভাবে অনুরোধ করেছিলেন। কাজেই স্বাতি আমার সঙ্গে নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে গেল।

অমিয়বাবুর ব্যবস্থা অতি চমৎকার। একেবারে হোটেলের দরজা থেকেই আমাদের অভ্যর্থনা করে নিয়ে গেলেন। অন্যান্য নিমন্ত্রিতরা আগেই এসে উপস্থিত হয়েছিলেন। তাঁদের সকলের সঙ্গেই পরিচয় হল। সব চেয়ে বেশি আনন্দ হল মিস্টার দাশগুপ্ত ও তাঁর স্ত্রী শ্রীমতী নীলিমা দাশগুপ্তের সঙ্গে পরিচিত হয়ে। এঁরা সিমলার স্থায়ী নিবাসী। মিস্টার দাশগুপ্ত চাকুরির প্রয়োজনে নানা স্থানে ঘুরে বেড়ান, শিক্ষার জন্য ছেলেরা প্রবাসী, শ্রীমতী দাশগুপ্ত একা থাকতে অভ্যস্ত হয়ে গেছেন। পরে তাঁর গৃহে নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে গিয়ে তাঁর অসংখ্য গুণের পরিচয় পেয়েছিলুম। ঘরের সর্বত্র তাঁর হাতের কাজ। শুধু ছবি আঁকেন না, গল্প উপন্যাসও লেখেন। কিন্তু তাঁর লেখা পড়বার আগে তাঁর নিজের হাতের তৈরি নানা রকম মিষ্টি খেয়ে অভিভূত হয়ে গেলুম।

এক দিন সন্ধ্যাবেলায় এক সভায় বক্তৃতা করতে হল। অনেক সঙ্কোচ ছিল। অনেক আপত্তি জানিয়েছিলুম। কিন্তু কারও সমর্থন পেলুম না। অমিয়বাবুও আমাকে বাঁচাবার কোন চেষ্টা করলেন না। কোন রকমে কিছু বলে স্টেজের উপর থেকে নেমে এলুম। স্বাতি বলল : এ কাজ তোমার দ্বারা হবে না।

মামা উপস্থিত ছিলেন, বললেন : এক দিনেই কি হয়! চেষ্টা করতে করতেই হবে।

আমি বললুম : আর যেন চেষ্টা না করতে হয়, সেই আশীর্বাদ করুন।

মামী বললেন : সেকি কথা, নিজের মন্দ আবার কে চায়!

এই সভাতেই গান শুনেছিলুম শ্রীমতী বাণী ঘোষালের। রেকর্ডে বা রেডিওতে তাঁর গান আমি আগে শুনি নি। পরে শুনেছি। এই গানের সম্বন্ধে আলোচনা করতে গিয়ে একটি পাঞ্জাবী মেয়ের সঙ্গে আলাপ হল। তার নাম মাধুরী বাত্রা। ভাল গাইতে জানে, নাচতেও জানে। এই আসরে নাচগান হবে মনে করে সে এসেছিল। গান তার ভাল লেগেছে, কিন্তু নাচ হল না দেখে হতাশ হয়েছে। রায়বাহাদুরই মাধুরীর সঙ্গে আমাদের পরিচয় করে দিয়েছিলেন। বলেছিলেন : মাধুরী আমাদের অফিসেই কাজ করে। গুণী মেয়ে, কিন্তু ভারি লাজুক। পাঁচজনের সামনে কিছুতেই নাচগান করবে না।

আমি বললুম : আমি এক মিস্টার বাত্রাকে চিনি, তিনি ঠিক উলটো। নাচগান জানলে নিশ্চয়ই আমাকে—

আমার কথা শেষ হবার আগেই মাধুরী প্রশ্ন করে উঠল : তার পুরো নামটা বলুন তো?

পুরো নাম জানি নে তো, আর্মির অফিসার, আছেন চণ্ডীগড়ে। তাঁর স্ত্রীর নাম বীণা।

মাধুরী একেবারে লাফিয়ে উঠল। বলল : আপনি আমার দাদাকে চেনেন বুঝি!

খুব ভাল চিনি। দিল্লীতে আমার বন্ধু চাওলার ঘরে পরিচয় হয়েছে।

মাধুরী বলল : তবে এখুনি চলুন আমার সঙ্গে। দাদা বউদি আজ এইখানেই আছেন।

সত্যি নাকি!

মাধুরী বলল : কালই হয়তো ফিরে যাবেন। আপনাকে আজ আমি ছেড়ে দেব না।

বললুম : কাল সকালে তাঁরা থাকবেন তো ?

তা থাকবেন। কিন্তু কাল এলে আমার একটা অনুরোধ আপনাদের রাখতে হবে।

কী ?

দুপুরে আপনারা আমাদের সঙ্গে খাবেন।

হেসে বললুম : আমি রাজী, ওঁদের রাজী করানোর ভার আপনার।

মামা মামী রাজী হলেন না, তার পরিবর্তে স্বাতিকে আমার সঙ্গে যাবার জন্য অনুমতি দিলেন।

ফেরার পথে মামা বললেন : তোমার বসুধৈব কুটুম্বকম্ দেখতে পাচ্ছি।

মামী বললেন : এদের চিনলে কী করে ?

আমি তাঁদের দিল্লীর কথা শোনালুম। বললুম : বীণা বাত্রাকে আপনারাও দেখেছেন।

দেখেছি নাকি ?

দিল্লীতে লালকেল্লার ভেতর চাওলার সঙ্গে দেখেছেন। আমরা যখন ঢুকছিলুম, ওরা তখন হাত ধরাধরি করে বেরিয়ে আসছিল। বীণা ওর এক বন্ধুর বোন। বিয়ে হয়েছে আর্মির এক অফিসারের সঙ্গে।

স্বাতি আমাকে আরও অনেক কথা জিজ্ঞাসা করল। যা জানি, বললুম। মিস্টার বাত্রা কাপ্তেন হয়েও কবি, আর বীণা কেরানী হয়েও নৃত্যগীতপটীয়সী।

মামী বললেন : কেরানী !

মামীর কণ্ঠে অবজ্ঞার সুর চাপা রইল না। স্বাতির মুখ হল রক্তিম। মামার কোন ভাবান্তর দেখলুম না। বললুম : অফিসে কাজ করে, এই পর্যন্তই জানি। কী কাজ তা জানতে চাই নি। কাল যদি দেখা হয় তাহলে হয়তো নাচ দেখতে পাব।

স্বাতি খুশী হবার ভান করে বলল : বেশ হয় তাহলে।

পরদিন সকালে মিস্টার বাত্রা নিজে এসে আমাদের টেনে নিয়ে গেলেন। আর্মির অফিসারকে মিস্টার বলে সম্বোধন করার রীতি নেই, কিন্তু তাঁর পদ জানি নে বলে উপায় ছিল না। মিস্টার বলার সময় আমি ইতস্তত করেছিলুম। 'ঠিক আছে, ঠিক আছে' বলে ভদ্রলোক আমার প্রশ্নটা এড়িয়ে গিয়েছিলেন।

কয়েকটা ঘণ্টা আমাদের প্রচুর আনন্দে কাটল।

এক সময় স্বাতি আমাকে আমার প্রয়োজনের কথা মনে করিয়ে দিল, বলল : তুমি নাচ দেখবে বলেছিলে না?

স্বাতি বাঙলায় এই কথা বলেছিল। বুঝতে না পেরে বীণা বলল : কী?

আমাদের কথা হচ্ছিল ইংরেজী ও হিন্দীতে, যার যা সুবিধে সেই ভাষায়। কখনও হিন্দী ও কখনও ইংরেজীতে। লক্ষ্য করে দেখছিলুম যে দিল্লীতে থেকে স্বাতি হিন্দী বেশ আয়ত্ত করে ফেলেছে। বলল : মাধুরী কাল নাচ দেখাবে বলেছিল, আজ আর মুখ দেখাচ্ছে না।

বীণা হেসে বলল : সত্যি নাকি! তাহলে আমি ওকে পাঠিয়ে দিচ্ছি। ও এখন অতিথি সেবার আয়োজনে ব্যস্ত।

স্বাতি বলল : তারপরে অন্য আপত্তি উঠবে।

কী আপত্তি?

ভরা পেটে নাচা যায় না।

আমি হাসছিলুম। হঠাৎ আমার দিকে চোখ পড়তেই জিজ্ঞেস করল : তুমি হাসছ যে?

বললুম : মাধুরী নয়, মিসেস বাত্রা আমাকে কথা দিয়েছিলেন।

সত্যি!

দিল্লীতে আমি নাচ দেখতে চেয়েছিলুম, মনে আছে?

বীণা এই প্রতিশ্রুতির কথা অস্বীকার করল না, হেসে বলল : আমি কি আর নাচতে পারি!

স্বাতি আমার মনের কথা জানে। বলল : পাঞ্জাবী নাচ দেখবার শখ গোপালদার অনেক কালের।

মিস্টার বাত্রা এতক্ষণ আমাদের কথাবার্তা উপভোগ করছিলেন। এবারে সহাস্যে বললেন : তবে তো আমাকেই নাচতে হবে দেখছি।

স্বাতি আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞাসা করল : কেন ?

দিল্লীতে বীণা আমাকে যে কথা জিজ্ঞাসা করেছিল, তা আমার মনে পড়ল। সে বলেছিল যে দিল্লীতে মানুষ হবার জন্যে সে পাঞ্জাবী নাচ শেখে নি, পাঞ্জাবের সঙ্গে সম্বন্ধ তার এক রকম ঘুচেই গেছে। আমার মনে হল, পাঞ্জাবী নাচের নামেই মিস্টার বাত্রা এই কথা বললেন।

মিস্টার বাত্রা উত্তর দিলেন : বীণা তো পাঞ্জাবী নয়, বীণা দিল্লীর মেয়ে, নামে পাঞ্জাবী। আমরা হলাম জাত পাঞ্জাবী। মাধুরী এলে আমি আপনাদের ভাঙ্গরা নাচ দেখাব। হাসবেন না তো ?

বললুম : উপভোগ করব।

মিস্টার বাত্রা বললেন : হাসি পাবেই, কিন্তু হেসে গড়িয়ে আমাদের তাল নষ্ট করবেন না।

তারপর বীণার দিকে চেয়ে বললেন : দাও না একটু মাধুরীকে পাঠিয়ে। শুধু কি খাইয়ে অতিথি সৎকার হয়!

বললুম : একেবারে খাঁটি কথা বলেছেন।

স্বাতি জিজ্ঞাসা করল : ভাঙ্গরা ছেলেদের নাচ, না মেয়েদের ?

ভাঙ্গরা পাঞ্জাবী পুরুষদের সম্প্রদায় নাচ। গমের কচি চারা লাগিয়ে চাষীরা এই নাচ শুরু করে মনের আনন্দে, আর শেষ করে ফসল কাটার পর বৈশাখী উৎসবে। প্রতি পূর্ণিমায় তারা একটা খোলা মাঠে এসে জড়ো হবে, আর—

মাধুরীকে দেখে মিস্টার বাত্রা থামলেন। মাধুরী তার কপালের চুল সরাতে সরাতে ঘরে এসে ঢুকেছিল। তার পরনে আজ সালোয়ার কুর্তা, বুকের উপর দোপাট্টা। ভারতীয় মেয়েদের এও এক সুন্দর

পোশাক। মেমদের ফ্রক বা স্কার্ট এদেশী মেয়েদের ভাল লাগে না, খানিকটা বেআব্রু বলে আমাদের চোখ অভ্যস্ত হয় নি। অথচ পাঞ্জাবী মেয়েদের সালোয়ার কুর্তা একখানি দোপাট্টার জন্য মনোরম মনে হয়। তবে বয়স ও দেহের গড়নের উপরেও সৌন্দর্য নির্ভর করে। মাধুরীকে ভাল মানিয়েছিল।

মিস্টার বাত্রা তাকে জিজ্ঞাসা করলেন: তোমার একটা ঢোল আছে না?

আছে। কিন্তু এখন তার কী দরকার?

দরকার আছে। গোপালবাবুকে ভাঙ্গরা নাচ দেখাতে হবে।

সর্বনাশ! তুমি নাচবে নাকি?

শুনছেন তো!

বলে মিস্টার বাত্রা আমার দিকে তাকালেন।

হেসে বললুম: নিন্দুকের কথায় আপনি কান দেবেন না।

কিছুতেই না, সে বদ অভ্যাস আমার একেবারেই নেই।

মাধুরী ততক্ষণে তার ঢোল এনে হাজির করেছে। আর মিস্টার বাত্রা নিজের চেয়ার ও সেণ্টার পিসটা দেওয়ালের ধারে সরিয়ে ফেলেছেন। আমরা উঠে পড়ে আমাদের সোফাটা ধরাধরি করে সরিয়ে ফেললুম। বাকি চেয়ার ও পেগ-টেবলগুলো সরাবার পরে মাধুরী ঢোল নিয়ে মাঝখানে দাঁড়াল। মিস্টার বাত্রা স্বাতিকে বসতে বলে আমাকে হাত ধরে টেনে নিলেন।

বীণা দরজার কাছে দাঁড়িয়ে ছিল। তাকে বললেন: ওখানে দাঁড়িয়ে থাকলে চলবে না, দাঁড়াও এইখানে।

বীণা আপত্তি জানিয়ে বলল: তোমার ভাঙ্গরা নাচে আমি কেন দাঁড়াব?

মিস্টার বাত্রা বললেন: আমরা তোমাদের এখন পুরুষ বলে মনে করব। মাধুরী, তুমি ঢোল বাজাবে, গলায় ঝুলিয়ে নাও ঢোল। আর বীণা আমাদের লীডার।

লীডারের কী কাজ ?

ভাব অঙ্গভঙ্গি করতে হবে। গ্রামের দু তিনজন ওস্তাদ ছেলে লীডার হয়ে দাঁড়ায়।

বীণা করুণ ভাবে বলল : আমি পারব না।

পারবার দরকার নেই, আমরা দুজনেই চালিয়ে নিতে পারব, কি বলেন ?

আমারও যে ভয় করছিল না তা নয়, তবু কতকটা সহজ ভাবে বলবার চেষ্টা করলুম : নিশ্চয়ই পারব।

মিস্টার বাত্রা বললেন : সাবাস।

দূরে বসে স্বাতি হাসছিল। তার দিকে তাকিয়ে মিস্টার বাত্রা বললেন : গোপালবাবুর মাথায় মনে করুন লাল সিল্কের পটকা।

পটকা কী ?

পাগড়ি নয়, রুমালও নয়। এক টুকরো লাল কাপড় পাগড়ির মতো মাথায় জড়ানো। আর এই লাচ্ছাও লাল।

লাচ্ছা আবার কী ?

ধুতি বা লুঙ্গি। আমার পটকা লাচ্ছা মনে করুন নীল। মানে সব রঙবেরঙের পোশাক। কিন্তু পাঞ্জাবী কুর্তা সকলের সাদা ও লম্বা, তার ওপর কালো ওয়েস্ট কোট, তার বোতামগুলো হবে চকচকে সাদা। গোপালবাবুর পোশাকটা মনে মনে কল্পনা করুন, আর আমারটাও। আমার দু হাত খালি, গোপালবাবুর হাতে একটা লাঠি, আর দুজনের পায়েই ঘুঙুর।

মেয়েরা পরম কৌতুকে হাসছিল। আর মিস্টার বাত্রা তাতে উৎসাহই পেলেন। বললেন : ভয় পাবেন না গোপালবাবু। নাচের মধ্যে কোন মারপ্যাঁচ নেই, এদের দুজনকে মাঝখানে রেখে ঘুরে ঘুরে নাচতে হবে। যেমন ইচ্ছে পা ফেলবেন, যেমন অঙ্গভঙ্গি করতে পারেন তাই করবেন। কেউ দেরিতে এলে আমাদের মাঝখানে ঢুকে

পড়বে, আর যখন নাচ জমে উঠবে তখন হোই হোই বলে চেঁচিয়ে উঠবেন।

মাধুরীর দিকে চেয়ে বললেন : স্টার্ট।

সঙ্গে সঙ্গে মাধুরীর ঢোলে চাঁটি পড়ল, আর মিস্টার বাত্রা দু হাতে তালি দিতে দিতে হেলেদুলে নানা রকম অঙ্গভঙ্গি করে ঘুরতে লাগলেন। আমিও হাতে তালি দিতে যাচ্ছিলুম, আমার দিকে ফিরে বললেন : আপনার এক হাতে লাঠি আছে।

আমি মিস্টার বাত্রাকে অনুসরণ করবার ব্যর্থ চেষ্টা করলুম। আর আশ্চর্য হলুম মাধুরীর ঢোল বাজানো দেখে। সে আমাদের নাচের গতি যেন বাড়িয়ে দিতে চাইছে, আর তার বাজনার সঙ্গে পায়ের মিল রেখে মিস্টার বাত্রা চেঁচিয়ে উঠলেন : হোই হোই।

দু তিন মিনিট পরেই তিনি দাঁড়ালেন, আমিও দাঁড়ালুম। তারপর তিনি পাঞ্জাবী ভাষায় কী একটা কবিতা আবৃত্তি করে গেলেন। শেষ করে আবার নাচ।

নাচতে নাচতেই আমি জিজ্ঞাসা করলুম : এ কী হল?

মুখ ফিরিয়ে তিনি উত্তর দিলেন : এ একটা বোলি।

বোলি কী?

প্রচলিত লোকগীতি। নাচের এও একটা অঙ্গ।

বীণার দিকে তাকিয়ে বললেন : কই, তুমি কিছু করছ না যে?

বীণা বলল : আমি পারব না।

মিস্টার বাত্রা থেমে বললেন : তবে গিদ্ধা নাচটা তোমাকেই দেখাতে হবে।

আমি শুধু থামলুম না, একেবারে চেয়ারে এসে বসে পড়ে বললুম : সেই ভাল, এবারে আমরা মেয়েদের নাচ দেখব।

বীণা বলল : সর্বনাশ!

কিন্তু মাধুরী ভয় পেল না। বলল : ভয় কি বউদি!

বলে ঢোলটা গলা থেকে নামিয়ে তার দাদার হাতে দিয়ে বউদির

হাত ধরল। মিস্টার বাত্রা বাজাতে আরম্ভ করলেন, মিষ্টি আওয়াজ, মেয়েদের নাচেরই উপযোগী। বীণা ও মাধুরী হাত ধরাধরি করে বনবন করে খানিকক্ষণ ঘুরপাক খেল, তারপর হাত ছেড়ে দিয়ে নিজেরই দু হাত জুড়ে হেলেদুলে নাচ। মাধুরীর ভঙ্গি বড় সাবলীল, কিন্তু বীণা নাচল কোন রকমে।

মিস্টার বাত্রা বললেন : সালোয়ার পরে এ নাচ অচল, নাচের জন্যে ঘাগরা পরতে হয়। আর কুর্তার ওপর ওড়না। যত মেয়ে তত রঙ, আলোয় আর ঝলমলে জরিতে এ নাচ অপূর্ব দেখায়।

খেয়েদেয়ে ফেরার সময় স্বাতি সবাইকে নিমন্ত্রণ করল, বলল : কাল তো আপনারা চণ্ডীগড়ে ফিরবেন, আজ সন্ধ্যাবেলায় আমাদের হোটেলে আসুন।

মিস্টার বাত্রা হাতজোড় করে বললেন : এখানে নয়, দিল্লীতে আপনাদের বাড়ি যাব।

এখানে নয় কেন ?

আজ এক বন্ধুর বাড়িতে আমাদের নিমন্ত্রণ আছে।

স্বাতি আমার দিকে তাকাল। আমি বললুম : একটা দিন থেকে যাওয়া যায় না ?

মিস্টার বাত্রা হাসলেন, বললেন : কলকাতায় আপনার কাছেও যাব।

আমাদের হোটেলের সামনে রায়বাহাদুর ব্যস্ত ভাবে পায়চারি করছিলেন। দেখতে পেয়েই বলে উঠলেন : আপনাদের নিয়ে আর পারি নে।

কেন বলুন তো ?

সকাল থেকে আমি আপনাদের জন্যে গাড়ি নিয়ে অপেক্ষা করছি, আর আপনারা যেখানে সেখানে গিয়ে সময়ের অপব্যবহার করছেন।

আমি বললুম : না না, সময়টা আমাদের ভারি আনন্দে কেটেছে।

বলেন কি, মাধুরী তো একেবারে আনসোস্যাল মেয়ে।

স্বাতি গম্ভীর ভাবে বলল : তার কাছে আমি সব কথা শুনেছি।

অ্যাঁ! কিছু বলেছে নাকি আমার সম্বন্ধে ?

বলেছে।

বলে স্বাতি হোটেলের ভিতর ঢুকে গেল।

রায়বাহাদুর আমাকে বললেন : দেখেছেন মশাই, কী সাংঘাতিক মেয়ে! পরিচয় হতে না হতেই আমার কথা সব বলে দিয়েছে!

ভালোই তো করেছে।

ভালো করেছে! আপনার কি মাথা খারাপ হয়ে গেল!

আমার মনে হল, তাঁর নিজেরই মাথা কিছু খারাপ। তা না হলে এমন উত্তেজিত হবার কোন কারণ নেই। আমাকে কিছু বলবার সুযোগ না দিয়ে বললেন : অফিসে ডিসিপ্লিন রাখতে হলে একটু কড়াকড়ি করতেই হয়। তার জন্যে নতুন লোকের কাছে বলাবলি কেন! আর আপনারাই বা একটা অ্যাসিস্ট্যান্টের বাড়ি নেমন্তন্ন অ্যাক্সেপ্ট্ করলেন কী বলে!

সেই অবজ্ঞা। মানুষ এখানে বড় নয়, বড় তার বৃত্তি। বললুম : আপনার সম্বন্ধে যে মন্দ বলেছে, সে কথা আপনি কেন ধরে নিচ্ছেন!

আল্‌বত মন্দ বলেছে। ও নেমকহারামের জাত মশাই, প্রাণ

দিলেও বদনাম। এই আমার স্টেনোগ্রাফারের কথাই ধরুন না, ওই মেয়েটার জন্য আমি কী না করেছি! শেষ পর্যন্ত আমার এগেন্‌স্টেই ডেমন্‌স্ট্রেশন!

চট করে আমি জিজ্ঞাসা করলুম: আপনার তো স্ত্রীপুত্র আছে!

ভদ্রলোক একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন: থাকলে আর ভাবনা ছিল কী!

আমার আশঙ্কা এই রকমই ছিল। তাই খুশী হয়ে বললুম: আপনি তো বিবাহ করেছিলেন!

অমিয়বাবু বলেছেন বুঝি?

না, তাঁর সঙ্গে আমার কোন কথা হয় নি।

তবে কার কাছে শুনলেন?

কারও কাছেই শুনি নি, আমি আমার অনুমানের কথা বলেছি।

ঠিকই অনুমান করেছেন। আমার রায়বাহাদুর বাবা এক রায়বাহাদুরের মেয়ের সঙ্গে আমার বিয়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু আমার কপালে সে মেয়ে টিঁকল না।

কেন?

রায়বাহাদুর করুণ ভাবে বললেন: ছেলেপিলে হয় নি ভালই ছিলুম, ছেলেই কাল হল। নার্সিং হোমে আগে মা মরল, তারপর ছেলে।

সহসা সংযত হয়ে বললেন: এ সব কথা কাউকে যেন বলবেন না।

হোটেলের সামনে রাস্তায় দাঁড়িয়ে আমরা কথা বলছিলুম। বললুম: আসুন, কোথাও একটু বসা যাক।

ভদ্রলোক বললেন: বসবার কী আর জায়গা আছে, একেবারে ঘরে গিয়ে ঢুকতে হবে।

আমি হোটেলের দিকে পা বাড়িয়েছিলুম, রায়বাহাদুর আমার হাত টেনে ধরলেন। বললেন: একটা সত্যি কথা বলবেন?

বললুম ঃ মিথ্যে বলব না।

ভদ্রলোক একটু ইতস্তত করে বললেন ঃ নাঃ, আপনি সত্যি কথা বলবেন না।

এবারে আমি হেসে বললুম ঃ জিজ্ঞেস করেই দেখুন না।

রায়বাহাদুর মাথা দুলিয়ে বললেন ঃ এ সব ব্যাপারে মানুষ সত্য কথা বলে না।

সুস্থ মানুষ মিথ্যা কথাও কম বলে।

সত্যি বলছেন ?

নিশ্চয়ই।

তবে জিজ্ঞেস করি, কী বলেন ?

ভদ্রলোকের ছেলেমানুষি দেখে আমার কৌতুক বোধ হচ্ছিল। কোন উত্তর দিলুম না।

রায়বাহাদুর অনেক দ্বিধা করে মাথা চুলকে জিজ্ঞাসা করলেন ঃ আমার কথাটা কি আপনি ভেবে দেখেছেন ?

কোন্ কথা বলুন তো ?

কেন, মনে নেই ?

না।

এত শিগগির আপনি ভুলে গেলেন !

সত্যিই আমার কোন কথা মনে পড়ে নি। তাই বললুম ঃ আমার স্মরণশক্তি তেমন ভাল নয়।

রায়বাহাদুর বললেন ঃ মনে নেই, সেদিন আপনারা জাখু পাহাড় থেকে নেমে আসবার পর কথাটা আপনাকে বলেছিলুম।

মনে পড়েছে। ভদ্রলোক স্বাতির সঙ্গে আমার বিবাহের প্রসঙ্গ তুলেছিলেন। বলেছিলেন, এমন অশাস্ত্রীয় কাজ কখনও করবেন না। মনুসংহিতাই না হয় পুড়েছে, ভগবান তো মরে নি। এ রকম সন্দেহ করবার কারণ আমি জানতে চেয়েছিলুম। তার উত্তরে ভদ্রলোক বলেছিলেন যে লেখকের জীবনের কোন কথাই নাকি গোপন

থাকে না। এ নিশ্চয়ই তাঁর শোনা কথা। যিনি বলেছেন, তিনিও সত্য কথা বলেন নি, কিংবা সত্য কথা জানবার চেষ্টা করেন নি। স্বাতি আমার মামাতো বোন ঠিকই, কিন্তু মামা সম্বন্ধটাই যে পাতানো। সম্বন্ধটা আমি পাতাই নি, আমার মাও না। আমার দিদিমা মামার মার সখী ছিলেন। রায়বাহাদুর এ নিয়ে কেন উপদেশ দিয়েছেন, তার কারণ কিছুটা অনুমান করতে পারি। তাঁর ব্যবহারেই তিনি কিছু সন্দেহ করার সুযোগ দিয়েছেন।

আমাকে নীরব থাকতে দেখে রায়বাহাদুর জিজ্ঞাসা করলেন: সত্যিই মনে পড়ছে না?

আপনি আমাকে অশাস্ত্রীয় বিয়ের সম্বন্ধে কিছু উপদেশ দিয়েছিলেন। এ নিয়ে ভেবে দেখবার কী আছে?

ভেবে দেখবার কিছু নেই। আপনি কি আমার কথা অস্বীকার করতে পারেন?

আমি হেসে বললুম: আপনার উপদেশ তো আমি অমান্য করি নি।

আলবত করেছেন। না করলে একটু সাবধান হতেন, বুঝতেই পারছেন।

আমি কোন উত্তর দেবার আগেই স্বাতি এসে আমাকে ডাকল, বলল: বাবা তোমাকে ডাকছেন গোপালদা।

রায়বাহাদুর জিজ্ঞাসা করলেন: আর আমাকে?

স্বাতি সংক্ষেপে বলল: না।

না!

ভদ্রলোককে বিমর্ষ হতে দেখে আমি বললুম: আপনার কথা হয়তো জানেনই না।

ঠিক বলেছেন। চলুন, আমিও আপনার সঙ্গে যাই।

বলে ভদ্রলোক আমার আগে আগেই এসে ঘরে ঢুকলেন। দরজা থেকেই চেঁচিয়ে বললেন: নমস্কার।

মামার মুখে পাইপ ছিল, মাথাটা একটু নোয়ালেন। উত্তর দিলেন মামী, বললেন ঃ আসুন আসুন।

স্বাতির দিকে তাকিয়ে বললেন : চায়ের কথা বলেছিস তো ?

না।

না কেন ?

সময় হলে ওরা নিজেরাই আনবে।

রায়বাহাদুর একখানা চেয়ারে বসে বললেন : আমার জন্যে ব্যস্ত হবেন না। বুঝতেই পারছেন, চা না পেলে আমার কোন কষ্ট হয় না।

মুখ থেকে পাইপ সরিয়ে মামা আমাকে বললেন : স্বাতির কথা শুনেছ ?

পরের কথাটুকু শোনবার জন্য আমি মামার মুখের দিকে তাকালুম।

মামা বললেন : স্বাতি কালই সিমলা ছাড়তে চাইছে।

অ্যাঁ !

রায়বাহাদুর যেন আকাশ থেকে পড়লেন।

আমি বললুম : ভালই তো, এক জায়গায় আর কত দিন থাকা যায়।

স্বাতি আমার দিকে তাকিয়ে একবার চোখ টিপল। বুঝতে পারলুম যে কথাটা বলা আমার ভুল হয়েছে। তাকে সমর্থন করা উচিত হয় নি। তাই বললুম : কিন্তু সিমলায় এখনও তো অনেক কিছু দেখতে বাকি আছে। তারা দেবী—

রায়বাহাদুর বললেন : সিমলার তো আপনারা কিছুই এখনও দেখেন নি। মাশোব্রা কুফ্রি চিনিবাংলো—

স্বাতি মামাকে বলল : দীর্ঘ দিন আমরা পাহাড়ে পাহাড়ে ঘুরব—কাঙ্গড়া ভ্যালিতেই অনেক ভাল জায়গা—ধরমশালা পালমপুর বৈজনাথ জ্বালামুখী, তারপর কুলু মানালি, ওই দিকে ডালহৌসি চাম্বা, তারপর কাশ্মীর। সিমলায় আর আমাদের সময় নষ্ট করা চলে না।

রায়বাহাদুর যেন আর্তনাদ করে উঠলেন, বললেন : এমন হঠাৎ যদি আপনারা চলে যান, বুঝতেই পারছেন, এখনও কোন বন্দোবস্তই করা হয় নি।

মামা বললেন : বন্দোবস্ত আবার কিসের ?

রায়বাহাদুর বললেন : ছুটি নিতে হবে, একখানা গাড়ির ব্যবস্থা করতে হবে। গাড়ি ছাড়া কুলু কাঙ্গড়ায় এক পাও নড়বার উপায় নেই।

স্বাতি মুখ টিপে হাসছিল, আর মামার দিকে তাকাচ্ছিল উত্তর শোনবার আশায়। কিন্তু মামী আগে উত্তর দিলেন, বললেন : সত্যি কথা, চল্ বললেই তো আর চলা যায় না।

উৎসাহ পেয়ে রায়বাহাদুর বললেন : বুঝতেই পারছেন, আমার কী ইচ্ছা ছিল। এখান থেকেই আপনাদের কুলু নিয়ে যেতুম।

মামা গম্ভীর ভাবে বললেন : আমরা ট্রেনে যাব।

বাধা দিয়ে মামী বললেন : ট্রেনে আবার কেন, মোটরেই তো ভাল।

পাহাড় থেকে গড়িয়ে পড়লে ভাল মন্দ বোঝা যাবে।

মামী ভয় পেয়ে রায়বাহাদুরের দিকে তাকালেন।

রায়বাহাদুর বললেন : না, রাস্তা তেমন মন্দ নয়। তবে কিনা বুঝতেই পারছেন, পাহাড়ের রাস্তা তো—

মামা বললেন : সে কথা বুঝতে পারছি বলেই তো ট্রেনে যাব।

বুঝতে পারলুম যে মামা তাঁর সংকল্পে দৃঢ়, এবং স্বাতির ইচ্ছা মতো কাল দুপুরেই যাত্রা করবেন। রায়বাহাদুরের সঙ্গ যে পছন্দ করছেন না, তাতেও আমার সন্দেহ রইল না। কিন্তু মামীর মনোভাব অন্য রকম। রায়বাহাদুরের সম্বন্ধে কী ভেবেছেন তিনিই জানেন, তাঁকে সমর্থন করে যাচ্ছেন। বললেন : আপনিও ট্রেনে চলুন না।

মামা বললেন : উনি কী করতে যাবেন !

রায়বাহাদুর তৎপর ভাবে বললেন : মানে, আমার ও সব তো দেখা জায়গা, আমি সঙ্গে থাকলে বুঝতেই পারছেন—

তা পারছি বৈকি।

মামার বিরক্তিকে রায়বাহাদুর তাঁর সমর্থন মনে করলেন। বললেন : তাহলে ছুটির জন্যে আজই একখানা টেলিগ্রাম করে দিই।

বলে আর কারও মতামতের অপেক্ষা করলেন না। ঊর্ধ্বশ্বাসে বেরিয়ে গেলেন।

মামা বললেন : কী আপদের পাল্লায় পড়া গেল!

স্বাতি হাসছিল। মামী বললেন : আপদ কেন বলছ! কাউকে পরের উপকার করতে দেখলেই তুমি তাকে আপদ ভাব।

এই প্রসঙ্গে আমি আর কোন কথা বললুম না।

আমরা চলে যাচ্ছি শুনে অমিয়বাবু আমাদের দুপুরবেলা খাওয়ালেন। বিলাতি হোটেলে মামী খাবেন না, কাজেই মামাও গেলেন না। আমি স্বাতিকে নিয়ে গেলুম নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে। সে এলাহী ব্যাপার। হোটেলের ডাইনিং রুমে একখানা বড় টেবিলে বসে অনেকক্ষণ ধরে সমস্ত আয়োজন দেখলুম। অসংখ্য পদ অপর্যাপ্ত পরিমাণে পরিবেশন করা হল। আমি বললুম : এ কী করেছেন?

অমিয়বাবু সহজ ভাবে বললেন : আপনাদের কী ভাল লাগে আর কী লাগে না, তা তো জানি নে।

তাই বুঝি এমন অপচয়ের হুকুম করেছেন!

বলে স্বাতি হাসল।

অমিয়বাবু এই রকমই। শুধু অমায়িকতায় নয়, আতিথেয়তায়ও তাঁর বাড়াবাড়ি সর্বজনবিদিত।

কথায় কথায় রায়বাহাদুরের কথা উঠে পড়েছিল। অমিয়বাবু বললেন : আর তিনি আপনাদের জ্বালাতন করবেন না।

কেন?

আমি তাঁকে আপনাদের সম্বন্ধের কথা জানিয়ে দিয়েছি।

স্বাতির মুখ যে রাঙা হয়ে উঠেছিল, আমি তা দেখতে পেয়েছিলুম। কিন্তু আমার মন হয়েছিল বিষণ্ণ। ভদ্রলোক নিশ্চয়ই আঘাত পেয়েছেন।

২১

সেই দিনই আমরা সিমলা ছেড়েছিলুম, আর কালকা থেকে অমৃতসর যাত্রা করেছিলুম রাত দশটার পরে। এই গাড়ির নাম সিমলা মেল। অমৃতসর থেকে আম্বালা হয়ে কালকা আসে, আবার ফিরে যায়। ভোর ছটায় অমৃতসর পৌঁছবে। লুধিয়ানা আর জলন্ধরের উপর দিয়ে যাবে রাত তিনটে ও চারটের সময়। যাত্রীর ভিড় ছিল না বলে আমাদের একখানা কম্পার্টমেণ্ট পেতে অসুবিধা হয় নি।

রায়বাহাদুরের কথা মামী ভুলতে পারেন নি। সিমলা স্টেশনে তাঁকে খুঁজেছিলেন। আশা করেছিলেন যে তিনি আমাদের সঙ্গে না এলেও গাড়িতে তুলে দিতে আসবেন। তারপরে বললেন: কিছু একটা হয়েছে বলে আমার সন্দেহ হচ্ছে।

ট্রেন ছাড়লে নিশ্চিন্ত হয়ে মামা পাইপ ধরিয়েছিলেন। মামীর মন্তব্য শুনে জিজ্ঞাসা করলেন: কী বিষয়ে?

মামী বললেন: ছেলেটা এল না কেন তাই ভাবছি।

মামা তাঁর মুখ বিকৃত করে বললেন: ছেলেই বটে!

তাঁর কথার ধরনে স্বাতি হেসে উঠল।

আমি গম্ভীর ভাবে বললুম: ভদ্রলোক এলে আমাদের খুব সুবিধে হত।

মামা বললেন: কেন?

বললুম: এ সব অঞ্চল তো তাঁর দেখা। আমাদেরও ভাল করে দেখাতে পারতেন।

আমরা নিজেরা কি ভাল করে দেখতে পারি না, না দেখবার কোন বাধা আছে!

আমি সুবিধের কথা বলছি। ও রকম লোক সঙ্গে থাকলে কিছু সুবিধে হয় বৈকি।

অসুবিধেও হয়।

মামী বললেন : অসুবিধে কিসের ?

বিরক্ত ভাবে মামা বললেন : তুমি বুঝবে না।

মামীও সরোষে বললেন : তা বুঝব কেন !

স্বাতি এই অপ্রীতিকর প্রসঙ্গ এড়াবার জন্যে বলল : এখন তো আমরা অমৃতসর যাচ্ছি, পথে এমন আর কী দ্রষ্টব্য স্থান আছে !

আমি বললুম : দ্রষ্টব্য স্থান আছে কিনা, সেইটেই জানবার ইচ্ছা।

স্বাতি হেসে বলল : তার জন্য তো বই আছে সঙ্গে, দেখ না খুলে।

বলেই সেই গাইড বইএর গোছা আমার দিকে এগিয়ে দিল।

প্রথমেই আমি একখানি মানচিত্র খুলে দেখলুম। চোখ পড়ল নাঙ্গাল ও ভাকরা বাঁধের উপর। আমরা এখন দক্ষিণে আম্বালার দিকে যাচ্ছি। চণ্ডীগড় ছাড়িয়ে আম্বালা একটি বড় জংসন। কলকাতা থেকে পাঞ্জাব মেল সাহারাণপুরের উপর দিয়ে আম্বালা আসে, দিল্লী থেকেও ফ্রন্টিয়ার মেল আসে আম্বালায়। তারপর রাজপুরা সরহিন্দ লুধিয়ানা জলন্ধর জংসন হয়ে অমৃতসর। জলন্ধর থেকে একটা লাইন গেছে কপুরথলা হয়ে ফিরোজপুর, আর একটা লাইন পাঠানকোট। লুধিয়ানা থেকেও একটা লাইন ফিরোজপুর গেছে, আর একটা লাইন দক্ষিণে ধুরি হয়ে দিল্লীর দিকে। রাজপুরা থেকে পাটিয়ালা ধুরি, আর সরহিন্দ থেকে নাঙ্গাল, পথে রূপাড় ও আনন্দপুর। মোটরে সংক্ষিপ্ত পথ আছে চণ্ডীগড় থেকে রূপাড়, তারপর আনন্দপুর নাঙ্গাল হয়ে একেবারে ভাকরা বাঁধ। ভাকরা পৃথিবার উচ্চতম বাঁধ।

একদা প্রধান মন্ত্রী পণ্ডিত নেহরু এই ভাকরা বাঁধের উপর দাঁড়িয়ে বলেছিলেন যে এই সব বাঁধই ভারতের নূতন মন্দির। এই বাঁধ উদ্ঘাটন উপলক্ষ্যে তখন কাগজে অনেক কথা পড়েছিলুম। এখন সব কথা মনে নেই। তবে গাইড বই থেকে অনেক কথাই জানতে পারলুম।

ভাকরা বাঁধ সম্বন্ধে প্রথম কথা হল যে দেখতে এটি অন্যান্য বাঁধের মতো নয়। দূর থেকে দেখতে এটি ইংরেজী অক্ষর ভির মতো। সাত শো চল্লিশ ফুট উঁচু। কে একজন বলেছিলেন যে তিনটে কুতব মিনারের সমান। শতদ্রু নদীর জলের চাপ এখানে এত বেশি যে এই সতের শো ফুট লম্বা বাঁধে প্রায় সাড়ে চোদ্দ কোটি কিউবিক ফুট কংক্রিট লেগেছে। সরল কথায় বলা যায় যে এই বাঁধের ভিতর একখানা এক লক্ষ ঘরের ষাটতলা বাড়ি অনায়াসে ঢুকে যাবে। এই বাঁধের পিছনে চৌষট্টি বর্গ মাইল জুড়ে যে হ্রদ সৃষ্টি হয়েছে, তার নাম গোবিন্দ সাগর। শিখ গুরু গোবিন্দ সিংএর নামে নাম। এই জলে পাঞ্জাব ও রাজস্থানের এক কোটি একর জমিতে জলসেচ সম্ভব হবে, বিদ্যুৎশক্তি পাওয়া যাবে দশ লক্ষ কিলোওয়াট। এই বাঁধ তৈরি করতে সরকারের ছেষট্টি কোটি টাকা খরচ হয়েছিল।

এ সব হিসেবের কথা আমরা বুঝি না। এইটুকু বুঝেছিলুম যে এত বৃহৎ পরিকল্পনা আগে এ দেশে হয় নি, বিদেশেও হয়তো বেশি নেই। তাই ভারত সরকার যেদিন এই বাঁধ নির্মাণের ভার নেবার জন্য কণ্ট্রাক্টর চেয়েছিলেন, সেদিন দেশী বা বিদেশী কোন কণ্ট্রাক্টর এগিয়ে আসে নি। সরকারকে নিজের লোক দিয়েই এই কাজ করতে হয়েছিল। তিন শো এঞ্জিনিয়ার ও আট হাজার মজুর কত দিন ধরে এই কাজ করেছিল আমার মনে নেই।

শুধু ভাকরা বাঁধ নিয়ে ভাকরা প্রজেক্ট নয়, এই পরিকল্পনার পাঁচটি প্রধান অঙ্গ আছে।—নাঙ্গাল বাঁধ, নাঙ্গাল হাইডেল চ্যানেল, গাঙ্গুয়াল ও কোটলা পাওয়ার হাউস, ভাকরা বাঁধ ও ভাকরা খাল। হিমালয়ের যে শ্রেণীর নাম নয়না দেবী, সেই পাহাড়ের ভিতর দিয়ে নেমে এসেছে শতদ্রু নদী। এই নদীকে প্রথম বাঁধা হয়েছে ভাকরায়, তারপর আট মাইল নিচে নাঙ্গালে তাকে আবার বাঁধা হল।

নাঙ্গাল ড্যাম এই লাইনের শেষ স্টেশন। এখানে থাকবার অনেক জায়গা আছে। যাঁরা এই বাঁধ দেখতে আসেন, তাঁরা কোন

রেস্টহাউস বা ধর্মশালায় থাকেন। তারপর ভাকরা বাঁধ দেখার অনুমতি পত্র নিয়ে এগিয়ে যান। এই অনুমতি সংগ্রহের জন্য বেশি হাঙ্গামা নেই। টুরিস্ট অফিসার বা পাবলিক রিলেশন্‌স্ অফিসারের কাছ থেকেই অনুমতি পাওয়া যায়। একটি টুরিস্ট বাংলোও আছে।

কে একজন আমাকে বলেছিলেন যে যাঁরা নিজেদের গাড়িতে আসেন, তাঁদেরই এই সব অঞ্চল দেখবার ভারি সুবিধে। ট্রেনে এলে নাঙ্গালের ট্রান্সপোর্ট অফিসারের শরণ নিতে হয়। গাড়িও নাকি পাওয়া যায়। আর একটা উপায় হচ্ছে এই যে যারা ভাকরা বাঁধের কাজ করছে তাদের সঙ্গে যাতায়াত। নাঙ্গাল থেকে একটা ট্রেন তাদের নিয়ে ভাকরা যায় দিনে দুবার—ভোর পৌনে ছটা আর দুপুর পৌনে দুটো, আর আধ ঘণ্টা পরেই সেই ট্রেন ফিরে আসে। আট আনা ভাড়া দিলে যাত্রীদেরও ঘুরিয়ে আনে। সে সময় ভাকরা বাঁধের কাজ চলছিল, এখনও চলছে কিনা জানি না।

বইএর পাতায় আমাকে নিমগ্ন দেখে মামা বলে উঠলেন: গোপাল কি ঘুমিয়ে পড়লে?

আমাকে চমকে উঠতে দেখে স্বাতি হেসে উঠল।

মামী বললেন: ঘুমের আর দোষ কী, রাত তো কম হয় নি!

এ কথা শুনে স্বাতি আবার হাসল।

মামী বিরক্ত হয়ে বললেন: হাসছিস যে?

স্বাতি বলল: গোপালদা স্বপ্ন দেখছিল।

স্বপ্ন!

গোপালদা ইতিহাসের স্বপ্ন দেখে।

মামা বললেন: তুমি কি ইতিহাসের কথা ভাবছিলে নাকি?

বললুম: না, ঠিক ইতিহাস নয়, ভাবছিলুম অন্য কথা। এ অঞ্চল ইতিহাসের তথ্যে এমন সমৃদ্ধ জানলে অন্য কথা ভাবতুম।

কী রকম?

সিমলায় এক সর্দারজীর সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল। আমরা ট্রেনে

অমৃতসর যাচ্ছি শুনে তিনি একটু আশ্চর্য হয়েছিলেন। জিজ্ঞেস করেছিলেন, চণ্ডীগড় থেকে ভাকরা নাঙ্গাল দেখতে যাবেন না? আমি বলেছিলুম, না। দামোদর ভ্যালিতে অনেক বড় বড় বাঁধ দেখেছি, ও সব দেখবার শখ আর নেই। এ কথা শুনে সর্দারজী বললেন, তা হলে ভুলে করবেন। পথে রূপাড় আর আনন্দপুর না দেখলে পাঞ্জাব দেখা আপনাদের অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। এ হল গুরু গোবিন্দ সিংহের দেশ।

স্বাতি অবাক হয়ে আমার মুখের দিকে তাকাল। জিজ্ঞাসা করল: এ সব কথা তোমার সঙ্গে কখন হল?

আমি হেসে বললুম: তুমি তাঁর সঙ্গে পরিচয় করে দিয়ে আমার উপকার করেছিলে।

এবারে মামী আরও বেশি আশ্চর্য হলেন।

মামা বললেন: হোটেলের ম্যানেজারের ঘরে যে সর্দারজীর সঙ্গে তোমরা গল্প করছিলে—

বললুম: তাঁরই কাছে।

মামার পাইপে তখনও আগুন ছিল, তাই বললেন: এ কথা আমাদের আগে বল নি কেন?

কিন্তু রাত তখন সাড়ে দশটা বেজে গেছে। তাই আমি ইতস্তত করছিলুম।

মামা বললেন: ভূমিকাটা এখন শেষ করে রাখ না।

বললুম: রূপাড় কোন পৌরাণিক বা ঐতিহাসিক শহর নয়। চণ্ডীগড় থেকে যে রাস্তাটি সুন্দর প্রাকৃতিক পরিবেশে নাঙ্গাল হয়ে ভাকরা গেছে তারই উপরে প্রথম ও সব চেয়ে বড় শহর। তারপর আনন্দপুর হল শিখদের তীর্থস্থান।

স্বাতি জিজ্ঞাসা করল: রূপাড় শহরের সম্বন্ধে আর কিছু বলবে না?

হেসে বললুম: মোটরে গেলে কোথায় থাকতে হবে জানি।

শতদ্রু নদী আর তার খালের মাঝখানে যে জমি, তারই উপরে একটি সুন্দর ডাকবাংলো আছে। পাখি যদি ভাল লাগে, তবে এই জায়গাটি ছেড়ে আসতে মন চাইবে না। হ্যাঁ, ভাল কথা, এই ডাকবাংলোর বাইরেই তো একটি ঐতিহাসিক বটগাছ আছে।

কী রকম ?

লর্ড বেন্টিঙ্কের সঙ্গে মহারাজ রণজিৎ সিংহের দেখা হয়েছিল এই বটগাছের নিচে। ভুল হল। তখন সেখানে বটগাছটি ছিল না, পরে লাগানো হয়েছিল।

সহসা আমার একটি প্রত্নতাত্ত্বিক অনুসন্ধানের কথা মনে পড়ল। বললুম : আর একটু ইতিহাসের কথা আছে। নিকটে একটি প্রাচীন শহরের ধ্বংসাবশেষ খুঁজে পাওয়া গেছে। মনে হয়, সেটি খ্রীষ্টের জন্মের কয়েক শো বছর পূর্বেকার একটি সমৃদ্ধ শহর।

মামা জিজ্ঞাসা করলেন : পুরাকালে এখানে কোন্ শহর ছিল ?

সবিনয়ে স্বীকার করলুম : জানি নে।

আমার মুখে এ রকম কথা শুনলে অতীতে স্বাতি বলত, বল কি, তুমি জান না এমন কথাও কি পৃথিবীতে আছে! কিন্তু এবারে সে নীরব রইল। তার বদলে আমি বললুম : রূপাড় শহরের কাছে দুটি গ্রাম আছে, গুরু গোবিন্দ সিংহের স্মৃতি জড়িত বলে আজও আদৃত। একটির নাম কোটলা নিহাঙ্গ, আর একটির নাম চমকৌর। গুরু গোবিন্দ সিং যখন শত্রুর ভয়ে আনন্দপুর থেকে পালিয়ে যাচ্ছিলেন, তখন এই কোটলা নিহাঙ্গে এসে পাঠানদের কাছে আশ্রয় ভিক্ষা করেন। পাঠানরা তাঁকে সকৌতুকে একটি জ্বলন্ত চুনের ভাঁটি দেখিয়ে দিয়েছিল। গুরু নির্বিকার চিত্তে তারই ভিতর আশ্রয় নিতে গেলে আগুন সহসা নিবে যায়। এই দৃশ্য দেখে বিস্ময়ে বিমূঢ় পাঠানরা তাঁকে আশ্রয় দিয়েছিল। কোটলা নিহাঙ্গে এখন একটি গুরদোয়ারা আছে।

মামী জিজ্ঞাসা করলেন : এ গল্প কি সত্যি ?

আমি বললুম : শিখরা সত্যি বলে বিশ্বাস করে।

তারপর ?

কোটলা থেকে গুরু গোবিন্দ সিং গেলেন চমকৌরে। গুরুর শেষ দুই পুত্র এখানে যুদ্ধ করতে করতে মারা যান। এই সব ঘটনা স্মরণ করে এখানে অনেকগুলি গুরদোয়ারা নির্মিত হয়েছে।

মামী জিজ্ঞাসা করলেন : গুরদোয়ারা কী?

বললুম : শিখদের মন্দির! বোধহয় গুরুদ্বার কথা থেকে গুরদোয়ারা। শিখ সম্প্রদায়ের দশজন গুরু। গুরু নানক থেকে গুরু গোবিন্দ।

স্বাতি জিজ্ঞাসা করল : গুরুদের কথা কিছু বলবে নাকি ?

বললুম : দশজনের কথা বলতে হলে রাত আজ ভোর হয়ে যাবে।

মামা বললেন : সংক্ষেপেই কিছু বল না।

শিখ সম্প্রদায়ের বিরাট ইতিহাস। তাতে অনেক অধ্যায় আছে গৌরবময়। নিতান্তই কর্তব্য পালনে আমি বললুম : শিখ শব্দটি কোথা থেকে এল, এ সম্বন্ধে পণ্ডিতদের মত আমি জানি নে। তবে শুনেছি যে গুরু নানক যেদিন শিষ্য গ্রহণ করেছিলেন সেই দিনই শিখ জাতির জন্ম হয়। শিষ্য শব্দেরই হিন্দী অপভ্রংশ শিখ বলে অনেকে মনে করেন।

গুরু নানকের জন্ম ১৪৬৯ খ্রীষ্টাব্দে লাহোরের উত্তরে ইরাবতী তীরে তালবন্দী গ্রামে। পিতার নাম কালু। গ্রামের জমিদার রায় বুলারের অধীনে কালু পাটোয়ারী কাজ করতেন, এবং গ্রামে তাঁর একটি দোকান ছিল। ঐশ্বর্যের মধ্যে নানক লালিত হন নি। অভাব ও দুঃখের সঙ্গে তাঁর পরিচয় ঘটেছিল শৈশবেই। গ্রামের পাঠশালায় তিনি লেখাপড়া শিখেছিলেন, তারপরে তিনি শাস্ত্রাদি আলোচনা করেন। তিনি ক্ষত্রিয় ছিলেন, কিন্তু তাঁর শাস্ত্রজ্ঞানের পিপাসা ছিল ব্রাহ্মণের মতো। ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রত্যক্ষ করবার বাসনায় তিনি ধ্যানে নিমগ্ন হয়ে থাকতেন। পিতা তাঁকে সংসারী করবার

অনেক চেষ্টা করেছিলেন। পুত্রকে পণ্য ক্রয়ের জন্য যে অর্থ দিয়েছিলেন, তা দিয়ে নানক উপবাসী ফকিরদের সৎকার করেন। যে দোকান করে দিলেন, তার জিনিসপত্র দরিদ্রকে বিলিয়ে দিলেন। শেষ পর্যন্ত সুলক্ষণী নামে এক সুন্দরী কন্যার সঙ্গে বিবাহ দিয়ে নানককে গৃহী করবার চেষ্টা করলেন। কিছু দিন তিনি সংসার করেছিলেন। শ্রীচাঁদ ও লক্ষ্মীচাঁদ নামে তাঁর দুই পুত্রের জন্ম হয়। তখন তাঁর বয়স ছত্রিশ বৎসর। তার কিছু দিন পরেই তিনি সংসার ত্যাগ করে ফকিরের বেশে তীর্থভ্রমণে বাহির হন। ভারতের সমস্ত তীর্থ পরিক্রমার পর তিনি আফগানিস্তান পারস্য ও পশ্চিম এশিয়ার নানা স্থানে ভ্রমণ করেন। মক্কা দর্শন করে স্বদেশে ফিরে কিছু কাল ছিলেন। তারপর বাঙলা দেশে এসেছিলেন। যোগী গোরক্ষনাথের মতাবলম্বীর সঙ্গে নানা বাদানুবাদ করে দক্ষিণে সিংহলে গিয়ে উপস্থিত হন। তাঁর প্রথম গ্রন্থ 'প্রাণ সন্দলি' প্রণীত হয় সিংহলেই। তার পরবর্তী গ্রন্থ 'আশা'।

নানক দ্বিতীয়বার আফগানিস্তানে গিয়েছিলেন, এবং ফিরে এসে কারারুদ্ধ হয়েছিলেন। তিনি বলতেন যে ঈশ্বর এক, তিনি বহু নন। সাধারণের কাছে তাঁর মাহাত্ম্য বর্ণনায় আমরাই ঈশ্বরকে নানা ভাবে বিভক্ত করে এত ধর্ম ও সম্প্রদায়ের সৃষ্টি করেছি। আমাদের পুরাণ ও কোরাণে যে পরধর্ম বিদ্বেষ আছে, তা সর্বতোভাবে পরিত্যাজ্য। আমরা শুধু শাশ্বত ও সত্য বাণীই সর্বান্তঃকরণে গ্রহণ করব। নানক নিজেকে দেবতার অবতার বা পয়গম্বর বলে কখনও প্রচার করেন নি, তাঁর ধর্মমত তিনি ঈশ্বরের নিকট পেয়েছেন বলেও দাবী করেন নি। বলেছেন, সাধারণ মানুষের জন্য তিনি সর্বধর্মের সার সংগ্রহ করেছেন। ঈশ্বরই সর্বময় কর্তা, তিনি তাঁর দাস।—

তুঁহে নিরহঙ্কার কর্তার,
নানক বান্দা তেরা।

মূলতানের গড়ছত্র মেলায় যখন তিনি এই ধর্মমত প্রচার

করছিলেন, তখন মুসলমানেরা তাঁকে ধরে দিল্লীতে পাঠায়। দিল্লীর সিংহাসনে তখন ইব্রাহিম লোদী। তাঁকে তিনি নির্ভীক চিত্তে বললেন যে বেদ বা কোরাণের ধর্ম ফকিরের জন্য নয়। পাঠান বাদশাহ এই ধৃষ্টতা সহ্য করলেন না, তাঁকে কারারুদ্ধ করলেন।

নানক সাত মাস কারারুদ্ধ ছিলেন। মোগল বাবরের নিকট ইব্রাহিম লোদী পরাজিত হবার পর তিনি মুক্ত হন। তাঁর মৃত্যু হয় ১৫৩৮ খ্রীষ্টাব্দে। তখন তাঁর বয়স উনসত্তর বৎসর।

তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীচাঁদও ফকির হয়ে নতুন এক সম্প্রদায়ের সৃষ্টি করেন। তার নাম উদাসী সম্প্রদায়। এই সম্প্রদায় সম্বন্ধে আমি বেশি কিছু জানি না। শুনেছি যে তারা মঠবাসী সন্ন্যাসী, অপরে রেঁধে দিলেই খায়। এরা উপাসনা করে নানকের 'গ্রন্থ' নামে একখানি ধর্মগ্রন্থ। তৃতীয় গুরু অমরদাস উদাসী মতকে একটি পৃথক ধর্মমত বলে স্বীকার করেছিলেন।

নানক কবি ছিলেন, নানক দার্শনিক ছিলেন। নানক তাঁর ন্যায়-ধর্ম প্রচার করে ভারতের একটি শক্তিমান জাতিকে সৃষ্টি করে গেছেন।

শোনা যায়, তাঁর মৃত্যুর পরে তাঁর দেহ নিয়ে শিষ্যদের মধ্যে বিবাদ হয়। হিন্দুরা দাহ করতে চায় এবং মুসলমানরা চায় কবর দিতে। এই নিয়ে যখন যুদ্ধ হবার উপক্রম, তখন শিষ্যদের মধ্যে প্রবীণরা ঠিক করেন যে দাহ নয়, কবরও নয়। তাঁর মৃতদেহ জলে ভাসিয়ে দেওয়া হবে। সেই ব্যবস্থা করতে গিয়ে শিষ্যরা সবাই স্তম্ভিত হয়ে গেল। শয্যার উপরে শুধু কুসুমাস্তীর্ণ আবরণ বস্ত্র আছে, গুরুর নশ্বর দেহ নেই। বিবাদ মিটে গেল। সেই আবরণ বস্ত্রের একাংশ কবর দিয়ে ও একাংশ দাহ করে তাঁর সৎকার সম্পন্ন হল।

এ কি সত্যি ঘটনা?

মামীর প্রশ্নে আমি চমকে উঠেছিলুম। তিনিও যে মনোযোগ দিয়ে শুনছিলেন, এ কথা আমি ভাবতে পারি নি। এ কথার কি উত্তর দেব আমি যখন ভেবে পাচ্ছিলুম না, তখন মামা বললেন: এই

সব গল্প সত্যি কি মিথ্যা তার যাচাই হয় না। অলৌকিক কাহিনী বিশ্বাস করলেই মনে শান্তি পাওয়া যায়।

মামার উত্তর আমার ভাল লাগল। বিশ্বাস দিয়েই তো দেবতাকে আমরা বাঁচিয়ে রেখেছি। এই বিশ্বাস না থাকলে দেবতার অস্তিত্ব হত ভূতের মতো। পরিপার্শ্বের প্রকৃতি একটা আতঙ্কের মতো দেবতার স্মৃতিকে জাগিয়ে রাখত।

মামা তাঁর পাইপ থেকে ছাই ঝেড়ে ফেলছিলেন। আমি জানি, এবারে তাঁর ঘুম পাবে। আর কিছু নতুন করে বলবার চেষ্টা করলেই একটা হাই তুলে আমাকে থামবার জন্যে নোটিস দেবেন। তাই আমি উঠে দাঁড়িয়ে বললুম ঃ এবারে শোওয়া যাক।

সকৌতুকে স্বাতি বলে উঠল ঃ গোপালদা এবারে গল্পের খেই হারিয়ে ফেলেছে।

কী রকম ?

শিখদের কথা উঠেছিল আনন্দপুরের কথায়। অথচ সেই আনন্দপুরের কোন কথাই এখনও বলা হল না।

মামা বললেন ঃ সত্যিই তো।

মামী বাধা দিলেন, বললেন ঃ রাত তো অনেক হল, কাল সকালে আবার গল্প হবে। সারা দিনই তো গল্প।

মামা আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন ঃ আনন্দপুরের গল্প কি খুব বড় নাকি ?

বললুম ঃ যে জায়গা দেখি নি, তার সম্বন্ধে বেশি কথা জানি নে।

মামা বললেন ঃ তবে গল্পটা শেষ করেই ওঠ।

আমাকে আবার বসতে হল। একটুখানি ভাবতেই আমার শোনা কথা মনে পড়ে গেল। রূপাড় থেকে নাঙ্গাল পর্যন্ত যে পথ গেছে, তারই ধারে আনন্দপুর। অনেকগুলি পাহাড়ী নদী পার হয়ে যেতে হয়। নদীর দুই তীরে যে গাছ তার নাম পম্পা ও ইপিমিয়া। এই চিরসবুজ ইপিমিয়া গাছকে পাঞ্জাবী ভাষায় সদাসোহাগন কেন বলে

মিস্টার সোহল আমাকে তা বলেছিলেন। এই গাছে ফুল ফোটে সারা বছর, নাম তাই সদাসোহাগন। এই পার্বত্য প্রদেশ বড় বন্ধুর। আর এই দুর্গমতার জন্যই গুরু গোবিন্দ সিংহ এই প্রদেশটি পছন্দ করেছিলেন। সমতল স্থান হলে পরাক্রান্ত মোগল শত্রুকে দীর্ঘ কাল উপেক্ষা করা সম্ভব হত না।

স্বাতি বলল : গুরু গোবিন্দ সিংহের কথা তো বল নি।

বললুম : শিখদের তিনি শেষ গুরু। গুরু নানক ও তাঁর মাঝে আরও আট জন গুরু আছেন। তাঁদের কথা আর এক দিন বলব।

তারপর আমি ষষ্ঠ গুরু হরগোবিন্দের নির্মিত কিরাতপুরের কথা বললুম। আনন্দপুর পৌঁছবার আগে পথের ধারের প্রথম বড় মন্দির। তার মাইল দুই দূরেই নয়না দেবী। যে পাহাড়ের কোলে এই শহর, তারই নাম নয়না দেবী, আর একটি চূড়ার উপর নয়না দেবীর মন্দির। আনন্দপুর থেকে সাত মাইল পথ পাহাড়ের উপরে উঠতে হয়। নয়না দেবী শুনেছি কালীরই অন্য নাম।

শতদ্রু নদীর বাম তীরে অবস্থিত আনন্দপুরকে অনেকে মাখোয়াল বলেন। এ নিয়ে একটা কাহিনী আমি মিস্টার সোহলের কাছে শুনেছি। গুরু গোবিন্দ সিংহের পিতা গুরু তেগবাহাদুর যখন এই শহর পত্তন করতে আসেন, তখন এই স্থান একটি নিষ্ঠুর দৈত্যের কবলে ছিল। তার নাম মাখো। সাত শো বছর ধরে সেই দৈত্য এখানে রাজত্ব করছিল। গুরু তেগবাহাদুর যখন তাকে তাড়াতে চাইলেন, তখন সে নিজে থেকে যেতে রাজী হল। কিন্তু অনুরোধ করল যে তার নাম যেন এই স্থানের সঙ্গে যুক্ত থাকে। গুরু বললেন থাকবে, আমার নিজের লোক সোধিরা বলবে আনন্দপুর, আর পাহাড়ীরা এই জায়গাকে বলবে মাখোয়াল।

এইখানে কত গুরুদ্বার আর কত ঐতিহাসিক সৌধ আছে তার হিসাব আমি জানি নে। যত নাম শুনেছি, তার সবই প্রায় ভুলে

গেছি। নিজের চোখে দেখে এলেও বোধহয় সব নাম মনে রাখতে পারতুম না।

স্বাতি হেসে বলল : সব নিশ্চয়ই ভুলে যাও নি!

স্বীকার করলুম যে তা সম্ভব নয়। কয়েকটি ঐতিহাসিক ঘটনা ভুলে যাবার মতো নয়। ১৬৭৫ খ্রীষ্টাব্দে দিল্লীতে গুরু তেগবাহাদুরের মাথা কাটা যায়। সেই মাথা এনে এখানে দাহ করা হয়। ১৬৯৯ খ্রীষ্টাব্দে গুরু গোবিন্দ সিংহ এখানে খালসা ভ্রাতৃমণ্ডল গঠন করেন। ১লা বৈশাখ পাঁচজন শিষ্যকে দীক্ষা দিয়ে তিনি তাদের খালসা বা পবিত্র বলেন। অনুষ্ঠানের সময় তিনি তাদের দিয়ে প্রতিজ্ঞা করান যে তারা শরীরের কোন কেশ কাটবে না। এই সব ঘটনাকে উপলক্ষ্য করে অনেক মহল ও গুরুদ্বার নির্মিত হয়েছে। যেমন, গুরুকা মহল, সিস মহল, কেশ গড়, গুরুদ্বার তেগবাহাদুর, গুরুদ্বার কেশ গড়, গুরুদ্বার আনন্দগড়, ইত্যাদি।

তবে মিস্টার সোহল আমাকে বলেছেন যে আনন্দপুরে যেতে হয় হোলির সময়। হোলির পরদিনই শিখদের হোলা মহল্লার অনুষ্ঠান। এই সময় গুরু এক কৃত্রিম যুদ্ধের আয়োজন করেছিলেন, আজও সেই ঘটনাকে সম্মান করা হচ্ছে। নিহার হল শিখদের একটি সম্প্রদায়। তারা আজও হোলার সময় যুদ্ধসাজে সজ্জিত হয়ে একটি যুদ্ধের অনুষ্ঠান করে। পাঞ্জাবী যুবকরা আসে ভাঙ্গরা নাচ নাচতে।

মামার দু চোখ বুজে এসেছিল। আমি আর কথা না বলে উঠে পড়লুম। স্বাতিকে বললুম : আর নয়। তের মাইল দূরে নাঙ্গালের কথা আমি আগেই বলেছি।

এবারে স্বাতি আর বাধা দিল না।

বাতি নিবিয়ে শোবার আগে পাঞ্জাবের মানচিত্রটা আমি আর একবার দেখে নিলুম। যে পাঞ্জাব মেল কলকাতা থেকে অমৃতসর আসে, তা জগাধ্রির উপর দিয়ে আম্বালায় আসে। গাইড বইএ দেখেছি যে এই জগাধ্রির বারো মাইল উত্তরে একটি তীর্থস্থান আছে, তার নাম গোপালমোচন। এই পল্লীতে দুটি সরোবর আছে, তাদের নাম গোপালমোচন ও ঋণমোচন। এ অঞ্চলের লোকের ধারণা যে গোপালমোচনের জল গঙ্গার চেয়েও পবিত্র, এখানে স্নান করলে সদ্য পাপমোচন হয়। নিকটে অনেকগুলি মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ আছে, এবং মাটি খুঁড়ে অনেক হিন্দু দেবতার সুন্দর মূর্তি পাওয়া গেছে।

আম্বালার পরে রাজপুরা জংসন। এইখানে গাড়ি বদল করে পাতিয়ালা যেতে হয়। পাতিয়ালা শহর পাতিয়ালা রাজ্যের রাজধানী। কিন্তু এই রাজ্য খুব প্রাচীন নয়। অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে আলাসিংহ নামে একজন শিখ নেতা যুদ্ধবিগ্রহ করে পাতিয়ালায় একটি দুর্গ নির্মাণ করেন। তারপর আহম্মদ শাহ দুরানির নিকট পরাজিত হয়ে তাঁর আধিপত্য স্বীকার করে রাজা উপাধি লাভ করেন। তিনিই পাতিয়ালা রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা।

উনবিংশ শতাব্দীতে এই রাজ্যের রাজারা ইংরেজের সঙ্গে বন্ধুতা করেন ও সর্বপ্রকারে ইংরেজের সাহায্য করেন। ইংরেজের পক্ষ নিয়ে তাঁরা গুর্খাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছেন, রণজিৎ সিংহের শিখ সেনাদলের বিরুদ্ধেও দাঁড়িয়েছেন, এবং সিপাহী বিদ্রোহের সময়েও ইংরেজকে সাহায্য করেছেন। এঁরা ইংরেজের কাছে পুরস্কার পেয়েছেন অনেক, সম্মান পেয়েছেন সতেরো তোপের।

এখন পাতিয়ালা একটি পুরনো দুর্গ ও বাগানের শহর। লোকে এখন রাজার মোতিবাগ প্রাসাদে পাঞ্জাব সরকারের জাদুঘর দেখতে

যায়। প্রাচীন চিত্র ও পুঁথিপত্র পদক ও অস্ত্রশস্ত্র দেখবার মতো। কক্ষগুলি বিরাট, তার মর্মরের মেঝে, উপর থেকে বড় বড় ঝাড়-লণ্ঠন ঝুলছে।

লোকে কিলা মুবারক ও বাহাদুর গড় দেখে, দেখে বারাদারি বাগান আর দুঃখ নিবারণ সাহেব গুরুদ্বার। অলিম্পিক স্টেডিয়ামে ভাল ভাল খেলা দেখে।

পাতিয়ালায় না নেমে সোজা এগিয়ে গেলে ধুরি জংসন পেরিয়ে ভাটিণ্ডা। এটি একটি প্রাচীন ঐতিহাসিক শহর। এখন সে দুর্গটির নাম গোবিন্দ গড়, সেই আঠারো শো বছর আগে রাজা ধাব কর্তৃক নির্মিত বলে জনশ্রুতি। এখন নতুন নামকরণ হয়েছে শিখ গুরুর নামে। আর একটি ঐতিহাসিক নিদর্শন রোজা বাবা হাজি রতন।

আমরা পাতিয়ালা ভাটিণ্ডার দিকে যাব না। আমরা আম্বালা থেকে সিরহিন্দের উপর দিয়ে যাব। এই সিরহিন্দ থেকেই ভাকরা যাবার রেল পথ। এই শহরের নাম আমার একটা কথার জন্যে মনে থাকবে। অষ্টাদশ শতাব্দীতে এই শহর কত বড় ছিল তার বর্ণনা করতে গিয়ে এখানকার লোকেরা নাকি বলে যে তখন শহরে তিন শো ষাটটি মসজিদ ছিল। গাইড বইএ আর একটি নতুন শব্দ দেখেছিলুম—সৈরিন্ধ। এই নামের একটি আর্য জাতির শাখা এখানে বসতি স্থাপন করেছিল বলে জায়গার নাম সিরহিন্দ হয়েছে। সৈরিন্ধ নাম আমি কোথাও পড়ি নি। দ্রৌপদীকে সৈরিন্ধ্রী বলা হয়েছে দেশের নামে নয়, যারা কেশ পরিচর্যা কত তাদের বলত সৈরিন্ধ্রী। দ্রৌপদী বিরাট রাজার অন্তঃপুরে এই কাজেই নিযুক্ত হয়েছিলেন।

এই প্রসঙ্গে আমার আর একটি শহরের কথা মনে পড়ল। তার নাম দাশুয়া। সেখানকার হিন্দু অধিবাসীরা বলে বিরাট কি নগরী। হোসিয়ারপুর থেকে পঁচিশ মাইল উত্তর-পশ্চিমে বিপাশার তীরে এই শহর। মহাভারতের যুগে বিরাট রাজার রাজধানী ছিল, সেকালের

একটি দুর্গ নাকি আজও আছে। এই নগরেই পঞ্চপাণ্ডব ছদ্মনামে অজ্ঞাতবাস করেছিলেন।

সিরহিন্দে এখন লোকে হজরত মুজদ্দাদ আলিফ সানির সমাধি রোজাসরিফ দেখে। ষোড়শ সপ্তদশ শতাব্দীর জ্ঞানী ফকির। জাহাঙ্গীর বাদশাহর সামনে সিজ্‌দা করতে অস্বীকার করে তিনি কারা বরণ করেছিলেন, তবু বলতে পারেন নি যে বাদশাহ খোদাতাল্লার চেয়ে বড়।

মাইল চারেক দূরে গুরুদ্বার ফতেগড় সাহেব। গুরু গোবিন্দ সিংহের দুই শিশুপুত্রের স্মৃতি রক্ষার জন্য নির্মিত হয়েছিল বান্দা সিংহের আমলে।

এর পর লুধিয়ানা, জলন্ধর। জলন্ধর থেকে দেশীয় রাজ্য কপুরথলা, আর কর্তারপুর থেকে হোসিয়ারপুর। তারপরে অমৃতসর।

মানচিত্রটি আমি বেশিক্ষণ দেখি নি। এক নজরে দেখে নিয়েই বাতি নিবিয়ে শুয়ে পড়েছিলুম। অনেক রাত হয়েছিল, ভোরবেলায় আবার উঠতে হবে। তারপর সারা দিন শহর দেখার কাজ।

কিন্তু ভোরবেলায় জেগে দেখলুম, অমৃতসর পৌঁছতে আরও কিছুক্ষণ দেরি আছে। ট্রেন লেট হয়েছে। এ কোন নূতন কথা নয়। কলকাতায় ট্রেন লেট না হলেই যাত্রীরা আশ্চর্য হয় বেশি। দূর পাল্লার ট্রেন সময় মতো এসে পৌঁছলে লোকে আগের দিনের ট্রেন ভাবে। বিছানাপত্র বেঁধে আমরা নামবার জন্য তৈরি হয়ে বসলুম।

স্বাতি বলল : কাল অত রাতে গোপালদা অমন মনোযোগ সহকারে কী দেখছিলে?

সংক্ষেপে বললুম : পাঞ্জাবের মানচিত্র।

সে তো তুমি অনেকবার দেখেছ।

কিন্তু যেমন করে দেখা হলে দেখেছি বলা যায়, তেমন করে এখনও দেখা হয় নি।

মামা বললেন : কথাটা তোমার ধাঁধার মতো হল।

স্বাতি বলল : গোপালদার কাজকর্মও সব ধাঁধার মতো।

হেসে বললুম : বুঝিয়ে বললে আর ধাঁধা মনে হবে না।

তবে তাই বল।

বললুম : আমরা অন্ধকার রাতে গাড়ির দরজা এঁটে পাঞ্জাব রাজ্যের শেষ প্রান্ত অমৃতসরে পৌঁছে যাচ্ছি। অমৃতসরটা ভাল করে দেখে কি পাঞ্জাব দেখেছি বলা ঠিক হবে? বলতে হবে, অমৃতসর দেখে এলাম।

এবারে স্বাতি হেসে বলল : তুমি কি মানচিত্র দেখে পাঞ্জাব দেখেছি বলবে নাকি?

পাঞ্জাবের কী দেখি নি তাই বলব।

হাসতে হাসতেই স্বাতি বলল : গোপালদার এখন ভারি অসুবিধে হয়েছে বাবা।

কী অসুবিধে?

থার্ড ক্লাসে ভারি সুবিধে ছিল। অনেক রকমের যাত্রী, তাদের কাউকে ধরে পথের সব কথা জেনে নেওয়া চলত। এখন আমাদের গাইড বইএর উপরেই শুধু ভরসা।

মামা গম্ভীর ভাবে বললেন : আর তোমার ওপর।

আমার ওপর কেন?

তুমি তো এবারে পড়াশুনো করে বেরিয়েছ।

স্বাতি লজ্জা না পাবার ভান করে বলল : সে কথা মেনে নিলে তো কোন ভাবনা ছিল না।

মামা আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন : তুমি কি মেনে নাও নি নাকি?

বললুম : মেনে নিই কী করে বলুন। লুধিয়ানা আর জলন্ধরের উপর দিয়ে আমরা চলে এলুম, অথচ স্বাতি আমাদের এখনও কিছু বলল না।

মামা বললেন : লুধিয়ানায় অনেক গরম কাপড়ের কল আছে।

আর কী আছে ?

স্বাতি উঠে গিয়ে তার বই পুঁথি বার করে আনল। বলল : দাঁড়াও দেখি !

তারপর তন্নতন্ন করে খুঁজে বোধ হয় লুধিয়ানার কোন কথা পেল না। জিজ্ঞাসা করলুম : কী হল ?

হতাশ ভাবে স্বাতি বলল : কিছুই তো লেখে নি দেখছি।

মামা বললেন : তা কি হতে পারে ! লুধিয়ানার নাম তো আমরা সবাই জানি। নিশ্চয়ই একটা সমৃদ্ধ শহর !

বললুম : নিশ্চয়ই। তা না হলে কি আর ম্যাঞ্চেস্টার অব ইণ্ডিয়া বলে !

তাই নাকি !

স্বাতি আমার মুখের দিকে তাকাল।

বললুম : মোজা গেঞ্জি সোয়েটার আর পশমি কাপড়ের কারখানায় আর ব্যবসায় শহর গমগম করছে। সাইকেলের পার্টসও তৈরি হচ্ছে সেখানে। কিন্তু গত শতাব্দীতে এই শহর বৃটিশের সেনানিবাসের জন্যে বিখ্যাত ছিল। এ অঞ্চলের প্রাচীন কাহিনী জানতে হলে শহরের বাইরে যেতে হয়। লুধিয়ানা জেলাতে অনেক প্রাচীন নগরের ধ্বংসাবশেষ এখনও বিদ্যমান আছে। লুধিয়ানা শহরের কাছেই যে প্রাচীন নগরের ধ্বংসস্তূপ আছে, তার নাম সুনেত। এই নগর যে সুবিস্তৃত সমৃদ্ধ ছিল তা অনুমান করা যায়। কিন্তু মুসলমানরা যখন এ দেশে আসে তখন তার গৌরব অনেকাংশে অন্তর্হিত হয়েছিল। মহাভারতে বর্ণিত মৎসপট নগরী এইখানে ছিল কিনা পণ্ডিতেরা তা বলতে পারবেন।

আমার কথা শুনে মামা আশ্চর্য হয়েছিলেন, বললেন : এত প্রাচীন শহর !

বললুম : হয়তো নয়। তবে সুনেত নগরের ইঁট দিয়ে লুধিয়ানা শহরের অনেক বাড়ি তৈরি হয়েছে, তার প্রমাণ আছে।

স্বাতি জিজ্ঞাসা করল : ইটে কি শহরের নাম লেখা আছে?

প্রায় সেই রকম। সুনেত নগরের ধ্বংসস্তূপের যে ইট পাওয়া যায়, তাতে তিন আঙুলের চিহ্ন আছে, লুধিয়ানার অনেক বাড়িতেও এই চিহ্নের ইট আছে। পঞ্চদশ শতাব্দীতে রাজকোটের রাজপুতেরা এখানে সমৃদ্ধ ছিল। এরাই মুসলমান হয়ে দিল্লীর বাদশাহর কাছে এই জায়গা জায়গীর হিসেবে পায়। লুধিয়ানা শহরের পত্তন হয় শতাব্দীর শেষ দিকে। সুবিধার জন্যেই বোধ হয় সুনেত নগরের ইট তারা ব্যবহার করেছিল।

স্বাতি আমার কথা বিশ্বাস করল কিনা জানি নে, বলল : গোপালদার এ সব তৈরি গল্প।

মামা বললেন : তাই নাকি?

হেসে বললুম : গল্প তৈরি করতে পারলে উপন্যাস লিখতুম। পারি নে বলেই—

স্বাতি বলল : বলি।

বললুম : তবে তুমিই এবারে জলন্ধরের গল্প তৈরি করে বল।

স্বাতি তার পুঁথিপত্র নাড়াচাড়া করে বলল : জলন্ধরে খেলাধুলোর ভাল সরঞ্জাম তৈরি হয় বলে শুনেছি।

তারপর?

তারপর আর জানি নে। মহাভারতের সময় জলন্ধরে কে রাজা ছিল তা তুমি বল।

হেসে বললুম : তুমি তার নাম জান। সুশর্মা।

মামা বললেন : নামটা যেন শোনা শোনা লাগছে।

বললুম : লাগবেই তো। পাণ্ডবেরা যখন বিরাট রাজার গৃহে অজ্ঞাতবাস করছেন, তখন ত্রিগর্তের রাজা সুশর্মা উত্তর গোগৃহ থেকে বিরাটের গোধন অপহরণ করেছিলেন।

স্বাতি বলল : সে তো ত্রিগর্তের রাজা। জলন্ধরের সঙ্গে তার কী সম্বন্ধ?

সম্বন্ধ এই জন্যেই যে জলন্ধর ত্রিগর্তেরই বর্তমান নাম। শতদ্রু বিপাশা ও চন্দ্রভাগা এই তিন নদী এই রাজ্যের উপর দিয়ে প্রবাহিত বলে ত্রিগর্ত নাম। জলন্ধর নামটিও আধুনিক নয়, পদ্মপুরাণে জলন্ধরের উৎপত্তির উপাখ্যান আছে।

সে তো আরও পুরনো কথা।

একটু গোলমেলে কথাও। পুরাকালে নাকি এই স্থান পর্যন্ত সমুদ্র বিস্তৃত ছিল। গুরু শুক্রাচার্য চেয়েছিলেন যে এই স্থান জলন্ধর নামে এক দৈত্যকে দেবেন। তাই তিনি সমুদ্রকে সরে যেতে বললেন। সমুদ্র দক্ষিণে সরে গেলে এই স্থানের নাম হয় জলন্ধর।

মামা জিজ্ঞাসা করলেন: গোলমেলে বললে কেন?

এই জন্যে যে এই কাহিনীটা পুরোপুরি মেনে নিলে দেখা যায় যে জলন্ধরই এই জায়গার প্রাচীনতম নাম, ত্রিগর্ত নাম পরে হয়েছে। অথচ পণ্ডিতেরা বলেন যে ত্রিগর্ত নামটাই প্রাচীন, জলন্ধর নাম হয়েছে পরবর্তী যুগে।

এ দেখছি পাত্রাধার তৈল, না তৈলাধার পাত্র!

আমি বললুম: হিউএন চাঙের ভ্রমণ-বৃত্তান্তেও আমরা জলন্ধর নামের উল্লেখ পাই।

বাধা দিয়ে স্বাতি বলল: জলন্ধর দৈত্যের কথা বলবে না?

আমি জানালার বাহিরে একবার তাকিয়ে দেখলুম। পশ্চিমের আকাশ তখনও খুব স্বচ্ছ হয় নি। পশ্চিমে সূর্য একটু দেরিতেই ওঠে। তবু আমরা এতক্ষণে অমৃতসরে পৌঁছে যেতুম। পৌঁছতে আর কতক্ষণ লাগবে তাও বুঝতে পারছি না। ছোট ছোট স্টেশন দু একটা না থেমে পেরিয়ে এসেছি। চেষ্টা করলে টাইম-টেবিল মিলিয়ে হয়তো কোন হদিস করা যায়। তার চেয়ে এই গল্প করতেই আমাদের ভাল লাগছে। বললুম: পুরাণের গল্পে কি তোমার বিশ্বাস আছে?

নাই বা থাকল। ভূতের গল্পও তো বিশ্বাস করি না, কিন্তু শুনতে বেশ লাগে।

মামী আর্তনাদের সুরে বলে উঠলেন : না না, পুরাণের গল্পের সঙ্গে ভূতের গল্পের তুলনা ক'রো না।

স্বাতি বোধহয় লজ্জা পেল, বলল : তাড়াতাড়ি বল। অমৃতসর পৌঁছে গেলে আর শোনা হবে না।

বললুম : ইন্দ্র এসেছেন শিবের সঙ্গে দেখা করতে। কিন্তু শিবের বদলে দেখলেন এক ভীষণ আকারের পুরুষ। ইন্দ্র জিজ্ঞেস করলেন, মহাদেব কোথায় ? সেই পুরুষ নিরুত্তর। উত্তর না পেয়ে ইন্দ্র চটে উঠলেন, বজ্র নিক্ষেপ করলেন তাঁর মাথায়। কিন্তু সেই পুরুষের কিছু হল না। শুধু তাঁর মাথা থেকে আগুন বেরল। ইন্দ্র নিজেই ভয় পেলেন ভস্ম হয়ে যাবার। বুঝতে তাঁর বাকি ছিল না যে তিনি রুদ্রের মাথাতেই বজ্রাঘাত করেছেন। তখন নিজের প্রাণ রক্ষার জন্যে অনেক স্তবস্তুতি করলেন। শিব সন্তুষ্ট হয়ে সেই আগুনকে সমুদ্রে নিক্ষেপ করলেন।

স্বাতি জিজ্ঞাসা করল : আগুন নিবে গেল তো ?

বললুম : নিবলে আর ভাবনা ছিল কি!

কী হল তবে ?

সেই আগুন জলে পড়তেই সমুদ্র থেকে এক শিশু আবির্ভূত হল। ব্রহ্মা এই সংবাদ পেয়ে সমুদ্রের ধারে এসেছিলেন। সমুদ্র সেই শিশুকে ব্রহ্মার কোলে দিয়ে বললেন, আমার এই পুত্রকে আপনি পালন করুন। শিশুটি প্রবলভাবে কাঁদছিল, এইবারে ব্রহ্মার দাড়ি এমন ভাবে চেপে ধরল যে তাঁর দু চোখ বেয়ে জল পড়তে লাগল। এরই জন্য ব্রহ্মা শিশুর নাম রাখলেন জলন্ধর, এবং তাকে অসুর রাজ্যে অভিষিক্ত করে বর দিলেন যে রুদ্র ভিন্ন অপরের হাতে তার মৃত্যু হবে না।

স্বাতি হেসে উঠল : এ ভারি মজার কথা।

কেন ?

ব্রহ্মার দাড়ি ধরে সে ঝুলে পড়ল, আর ব্রহ্মা তাকে রাজা করে বর দিলেন।

মামা বললেন : তা না হলে ব্রহ্মা পিতামহ কেন ! নাতির অত্যাচার একটু সইবেন না !

বললুম : জলন্ধর বিয়ে করেছিল কালনেমির কন্যা বৃন্দাকে। তারপর তার অত্যাচারে দেবতারা স্বর্গ থেকে বিতাড়িত হলেন। ইন্দ্র শরণ নিলেন শিবের, শিব তাঁকে অভয় দিয়ে জলন্ধরকে যুদ্ধে ডাকলেন। বৃন্দা বিপদ দেখে বিষ্ণুর পূজা শুরু করলেন। তখন চক্রী বিষ্ণু বৃন্দার পূজা শেষ হবার আগেই জলন্ধরের রূপ ধারণ করে তাঁর সামনে এলেন। স্বামীকে সামনে দেখে বৃন্দা যেই পূজা ত্যাগ করলেন, যুদ্ধক্ষেত্রে তখনই জলন্ধরের মৃত্যু হল। বিষ্ণুর এই কপটতা দেখে বৃন্দা তাঁকে অভিশাপ দিতে উদ্যত হয়েছিলেন। তখন বিষ্ণু তাঁকে সহমরণের পরামর্শ দিয়ে বললেন যে তাঁর ভস্মে তুলসী ধাত্রী পলাশ ও অশ্বত্থ বৃক্ষের জন্ম হবে।

স্বাতি জিজ্ঞাসা করল : ধাত্রী কী গাছ ?

বললুম : বাঙলা অভিধানে নেই, বাড়িতে যদি সংস্কৃত অভিধান থাকে তাতে দেখে নিও।

স্বাতি হেসে বলল : তারপরে বল।

বললুম : জলন্ধর দৈত্যের দেহ কত বড় ছিল তার কিছুটা অনুমান করা যায়।

কী করে ?

মৃত্যুর সময় তার দেহটা পড়েছিল দোয়াব থেকে মূলতান। সিন্ধু নদের বদ্বীপে তার পৃষ্ঠদেশ পড়েছিল বলে নাম জলন্ধর পীঠ।

অনেকক্ষণ পরে মামী আবার কথা কইলেন। জিজ্ঞাসা করলেন : জলন্ধর কি পীঠস্থান ?

বললুম : এ হল জলন্ধর পুরাণের কথা। জ্বালামুখীতে যে আগুনের শিখা দেখা যায় তা হল জলন্ধরের মুখের আগুন।

জ্বালামুখী তুমি পীঠস্থান বল নি ?

বলেছি। জ্বালামুখীতে সতীর জিহ্বা পড়েছিল। তাই তা পীঠস্থান।

মামা বললেন ঃ এখন যে আবার অন্য কথা বলছ!

এখন বলছি জলন্ধর পুরাণের কথা। এ তো কোন মহাপুরাণ বা উপপুরাণও নয়, এ হল জলন্ধর প্রদেশের উৎপত্তি কথা।

তবে জলন্ধর কেন পীঠস্থান নয়?

তাও ঠিক নয়। জলন্ধর স্তনপীঠ বলে পরিচিত। দেবী সেখানে ত্রিপুরমালিনী, আর ভৈরব ভীষণ।

মামী বললেন ঃ সত্যি!

বললুম ঃ আমি শাস্ত্রের কথা বলছি। জলন্ধরে এ সব আছে কিনা জানি নে।

স্বাতি আবার তার গাইড বইগুলি উলটে পালটে দেখল। তারপর হতাশভাবে বলল ঃ কোন কথাই নেই।

তারপরে আমি হিউএন চাঙের কথা বললুম। তাঁর ভ্রমণ-বৃত্তান্তেও আমরা জলন্ধরের কথা পাই। সপ্তম শতাব্দীতে তিনি এটিকে একটি ছোট রাজ্য হিসেবে দেখেছিলেন। পূর্ব পশ্চিমে তার ব্যাপ্তি এক হাজার লি। আর উত্তর দক্ষিণে আট শো লি। মানে দেড়শো আর সোয়াশো মাইলের কিছু বেশি। তখন কাঙ্গড়া উপত্যকা ছিল জলন্ধর রাজ্যের অন্তর্গত।

সহসা মনে হল যে ট্রেনের গতি কিছু মন্থর হয়েছে। হয়তো এবারে অমৃতসর পৌঁছব। স্বাতি একবার বাহিরের দিকে তাকিয়ে বলল ঃ ইতিহাসের বদলে তুমি অন্য কিছু বল।

তবে তোমার গাইড বইএর কথা বলি। জলন্ধর থেকে ন মাইল উত্তরে কর্তারপুর নামে একটি ছোট শহর গুরু অর্জুনের নামে বিখ্যাত। আর এগার মাইল পশ্চিমে হল দেশীয় রাজ্য কপুরথলার রাজধানী কপুরথলা। এখন আর রাজার রাজ্য নয়, এখন পাঞ্জাব প্রদেশের একটি জেলা। নবাব কপুর সিং একাদশ শতাব্দীতে এই শহর পত্তন করেন। পাঁচ মন্দির নামে একটি হিন্দু মন্দির দর্শনীয়।

ট্রেনের গতি আরও মন্থর হয়ে এসেছিল। তাই দেখে বললুম ঃ

আর একটি শহরের কথা বললে এ লাইনের কথা শেষ হয়। এ শহরের নাম সুলতানপুর লোধি, কপূরথলা থেকে ষোল মাইল দক্ষিণে। গুরু নানকের প্রথম জীবন এখানে কেটেছিল বলে বিখ্যাত। অনেকগুলি গুরুদ্বার এই শহরে আছে।

জানালার বাহিরে আর অন্ধকার নেই। গাড়ির আলো আর প্রখর মনে হচ্ছে না। দুধারে বিজলী বাতি দেখে বুঝতে পারছি যে আমরা স্টেশনে পৌঁছে গেছি। এবারে আমাদের নামতে হবে।

২৩

অমৃতসরের প্ল্যাটফর্মে পা দিয়েই মামা আমাকে জিজ্ঞাসা করলেনঃ কোথায় ওঠা হবে ?

আমি স্বাতির দিকে তাকালুম।

স্বাতি বলল : এখানে ভাল হোটেল আছে গোটা কয়েক। ইম্পিরিয়াল গ্র্যাণ্ড ভলগা অমৃতসর হোটেল দি হোম, ধর্মশালাও আছে গোটা চারেক। সবই ইণ্ডিয়ান স্টাইল।

ট্রেন থেকে মাল নামানো তদারক করতে করতেই আমি বললুম : কদিন এখানে থাকবে তার ওপরেই সব নির্ভর করছে।

স্বাতি বলল : জায়গাটা ভাল না লাগলে আজ রাতেই আমরা পাঠানকোট যাত্রা করব।

তবে স্টেশনের রিটায়ারিং রুমই ভাল। অন্তত বাথ রুমটা ভাল পাওয়া যাবে। আর স্টেশনের খাওয়াটাও মন্দ হবে না।

মামা বলে উঠলেন : এই জন্যেই তোমাকে এত পছন্দ করি গোপাল যে তোমার নজরটা চৌখস। বাসস্থানের ব্যাপারে জীবনের দুটো বড় কাজের কথাই ভেবেছ।

এ কৌতুকের কথা। তবু আমি স্বাতির দিকে একটা গর্বিত দৃষ্টিক্ষেপ করে বললুম : চল রিটায়ারিং রুম।

স্বাতি আমাদের বেশি দেরি করতে দিল না। বলল : দু বেলাতেই যখন অমৃতসর দেখা শেষ করতে হবে তখন সময় নষ্ট করলে চলবে না।

তাড়াতাড়ি মুখ হাত ধুয়ে চা খেয়ে আমরা বেরিয়ে পড়লুম।

শহরে বাস চলাচল করে, ট্যাক্সি টাঙ্গা ও রিক্‌শাও আছে। প্রথমে আমরা স্বর্ণমন্দির দেখতে যাব শুনে একজন রিক্‌শায় যাবার পরামর্শ দিলেন। বললেন : রিক্‌শাই ভাল। দুজনে আরাম করে বসবেন। একেবারে অমৃতসরের ধারে পৌঁছে দেবে।

অন্য যানবাহনেও হয়তো পৌঁছনো যায়। কিন্তু অমৃতসরের ধারে পৌঁছে দেয় শুনে মামা বললেন : স্টেশনটা কি অমৃতসরে নয় ?

পরে আমরা এ কথার মানে বুঝেছিলুম। যে সরোবরের মাঝখানে স্বর্ণমন্দির, তারই নাম অমৃত সরোবর বা অমৃতসর। স্বর্ণমন্দিরকেও এরা মন্দির বলে না। বলে দরবার সাহেব। গোল্ডেন টেম্পল কথাটা এই জন্যেই বোঝে যে বিদেশ থেকে আগত যাত্রীরা এই নামটাই শুধু জানে।

রিক্শায় ওঠা মামী পছন্দ করেন না, বিশেষত কোন বড় শহরে। তার কারণ আমি অনেকবার অনুমান করেছি। মামী চান না যে স্বাতির সঙ্গে আমি এক গাড়িতে উঠি। আবার নিজেও স্বাতিকে নিয়ে উঠতে ভয় পান। বিদেশে ভিড়ের ভিতর মেয়েকে নিয়ে একা যেতে তাঁর ভয় করে। এবারে ভাবলুম, আমিই তাঁর সঙ্গে এক গাড়িতে চড়বার প্রস্তাব করি। কিন্তু স্বাতির মুখের দিকে তাকিয়ে তা আর সম্ভব হল না। সে আগেভাগেই মামীর পাশে উঠে বসল। মামার সঙ্গে আমি পিছনের রিক্শায় বসলুম। আর মামী ফিরে ফিরে আমাদের দেখতে লাগলেন।

কাইসারবাগের পাশ দিয়ে আমরা দরবার সাহেবের দিকে অগ্রসর হলুম।

বারোটি গেটের এই শহর খুব প্রাচীন নয়। ষোড়শ শতাব্দীতে এটি একটি নগণ্য স্থান ছিল, তার নাম চক। চতুর্থ শিখ গুরু রামদাস আকবর বাদশাহর কাছে এই স্থানটুকু উপহার পেয়েছিলেন ১৫৭৭ খ্রীষ্টাব্দে। লাহোর শহরে উভয়ের সাক্ষাৎ হয়েছিল। গুরু রামদাসের চরিত্রমাধুর্যে শিক্ষায় ও ধর্মব্যাখ্যায় প্রীত হয়ে বাদশাহ এই ভূমি তাঁকে দান করেন। তখন এই স্থানের নাম হয় চক রামদাস বা রামদাসপুর। তারপর প্রণামীর টাকা সঞ্চয় করে গুরু একটি সুন্দর জলাশয় নির্মাণ করে তার নাম রাখেন অমৃত সরোবর বা অমৃতসর। শিখধর্মের তখন কোন প্রাণকেন্দ্র ছিল না। গুরু রামদাস তাঁর

ধর্মের একটি কেন্দ্র স্থাপনের মানসে অমৃত সরোবরে একটি মন্দির নির্মাণের পরিকল্পনা করলেন। দেখতে দেখতেই এই সরোবরের তীরে একটি জনপদ গড়ে উঠল।

মামা যে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে ছিলেন, আমি তা লক্ষ্য করি নি। হঠাৎ জিজ্ঞাসা করলেন: অমন গম্ভীর ভাবে কী ভাবছ?

উত্তরটা আমি এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করলুম। বললুম: বেশ ঘন বসতির শহর বলে মনে হচ্ছে।

মামা বললেন: তোমার মন তো পথের দিকে নেই।

স্বাতির সঙ্গে মামী বসেছিলেন সামনের রিকশায়। মাঝে মাঝেই মামী আমাদের দিকে ফিরে দেখছিলেন। আমরা ঠিক পিছনেই আছি কিনা দেখতে না পেলেই হয়তো থামতে বললেন। সেদিকে তাকিয়ে বললুম: সব দিকেই চোখ রাখতে হচ্ছে।

মামা বললেন: বুঝেছি।

গুরু নানকের পরেই গুরু রামদাস নন। তাঁর জন্মও নয় একই বংশে। মৃত্যুর পূর্বে গুরু নানক তাঁর প্রধান শিষ্য লহনাকে আলিঙ্গন করে বলেছিলেন, আমার আত্মা এবারে তোমার মধ্যে প্রবেশ করল, এখন তুমি আমার অঙ্গ বলে বিবেচিত হলে। গুরু নানকের মৃত্যুর পরে এই লহনাই গুরু অঙ্গদ নামে পরিচিত হলেন।

আমাকে নীরব থাকতে দেখে মামা বললেন: মুখ বুজে না থেকে কী ভাবছ বলেই ফেল না।

আমি আর দ্বিধা না করে বললুম: শিখ গুরুদের কথা ভাবছিলুম। চতুর্থ গুরু রামদাস এই অমৃতসর শহর প্রতিষ্ঠা করেছিলেন গুরু নানকের মৃত্যুর প্রায় চল্লিশ বছর পরে। এঁদের মাঝখানে আরও দুজন গুরু ছিলেন—গুরু অঙ্গদ ও গুরু অমরদাস। চৌত্রিশ বছর বয়সে গুরু অঙ্গদ গদিতে বসেছিলেন। কিন্তু তার আগে তিনি জ্বালামুখীতে দেবীর উপাসক ছিলেন।

আশ্চর্য!

বললুম : এমন সরল অনাড়ম্বর ধর্মপ্রাণ মানুষ সহসা দেখা যায় না। তিনি ঘাসের দড়ি তৈরি করে জীবিকা অর্জন করতেন, এবং গুরু নানকের ধর্মনীতি প্রচার করতেন। তাঁর বিদ্যাবুদ্ধি বেশি ছিল না, কিন্তু সহজ ভাবে অনেক ধর্মকথা ও গুরু নানকের জীবনী গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করে যান। পনের বছরে তিনি শিখ সম্প্রদায়কে অনেক সমৃদ্ধ করে যান। গুরুমুখী বর্ণমালা নাকি তাঁরই আবিষ্কার।

মামা খুব মনোযোগ দিয়ে শুনছিলেন, বললেন : তারপর ?

তারপর তাঁর বিশ্বস্ত অনুচর ও প্রিয় শিষ্য অমরদাসকে তিনি গুরু নির্বাচন করলেন। অমরদাস এক গ্রামের জিনিস অন্য গ্রামে বেচে কোন রকমে জীবিকা নির্বাহ করতেন। কিন্তু তাঁর শিক্ষা ও বুদ্ধির অভাব ছিল না। মধুর স্বভাবের এই মানুষটি তাঁর বাগ্মিতায় অনেককে মুগ্ধ করেছিলেন। অনেকে তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছিল। এমন কি দিল্লীর বাদশাহ আকবরও তাঁর মুখে ধর্মকথা শুনে ধন্য হয়েছিলেন। তিনিও ধর্মের অনেক মূল্যবান কথা গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করে যান। জাতিভেদ প্রথা তুলে দেবার জন্যে তিনি যে সাধারণ রন্ধনশালা স্থাপন করেন, তার নাম লঙ্গর।

বাঙলাদেশে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর যা করেছিলেন, পাঞ্জাবে সেই কাজ করেছিলেন গুরু অমরদাস।

কী রকম ?

আমরা ইতিহাসে পড়েছি যে লর্ড বেন্টিঙ্ক আইন করে সতীদাহ প্রথা নিবারণ করেছিলেন এবং বিদ্যাসাগর মহাশয় বাঙলাদেশে প্রথম বিধবা বিবাহ দিয়েছিলেন। সে উনবিংশ শতাব্দীর কথা। শুনে আশ্চর্য হতে হয় যে প্রায় তিন শো বছর আগে গুরু অমরদাস এই কথা চিন্তা করেছিলেন এবং পাঞ্জাবে সহমরণ প্রথা বন্ধ করে বিধবা বিবাহের প্রচলন করেন। তিনি বলতেন যে আগুনে আত্মাহুতি সতীত্বের পরীক্ষা নয়, পরীক্ষা তার জীবনযাপনে। ধর্মের পথই সতীর পথ।

মামা সরল ভাবে স্বীকার করলেন : এ কথা আমি আগে কখনও শুনি নি।

বললুম : শিখ গুরুদের জীবন নিয়ে বাঙলায় ভাল বই নেই, আছে ইংরেজীতে।

মামা বললেন : আমি তাও দেখি নি।

মন্তব্যটা করেই আমার মনে হল যে হয়তো ভুল করেছি। নিজের থিসিস নিয়ে কিছু দিন এমন ব্যস্ত ছিলুম যে এ সব বইএর সন্ধান করবার অবসর পাই নি। সম্প্রতি হয়তো কিছু প্রকাশ হয়ে থাকবে। তাই বললুম : প্রয়োজন হয় নি বলেই বোধ হয় খোঁজ রাখি নি।

আমাদের রিক্‌শাওয়ালা তখন সংকীর্ণ জনবহুল পথে থেমে থেমে অগ্রসর হচ্ছিল। আমার মনে হল যে দরবার সাহেবে পৌঁছতে আর দেরি নেই। তাই আমার পুরনো প্রসঙ্গ শেষ করবার জন্যে বললুম : এই অমৃতসর শহর যিনি পত্তন করেছিলেন, তিনি হলেন গুরু অমরদাসের জামাতা রামদাস। লাহোরের এই যুবকের সঙ্গে অমরদাস তাঁর কন্যা মোহিনীর বিবাহ দিয়েছিলেন। রামদাসও বড় সাদাসিধে সরল প্রকৃতির মানুষ ছিলেন। স্ত্রীর দেশে এসে কুলি মজুরদের কাছে ছোলাসিদ্ধ বিক্রি করতেন। শ্বশুরের মৃত্যুর পরে গুরুর গদিতে বসেও এই কাজ তিনি ত্যাগ করেন নি।

এর পরে আর কিছু বলার অবকাশ পেলুম না। রিক্‌শাওয়ালা জানিয়ে দিল যে আমরা গন্তব্য স্থানে পৌঁছে গেছি। সামনে এগোলেই দরবার সাহেব।

আমাদের নামতে দেখে মামী নামলেন। স্বাতি আগেই নেমে পড়েছিল। নিজের ব্যাগ খুলে রিক্‌শার ভাড়া মিটিয়ে দিল, তারপর বলল : এই দিকে এস বাবা।

মামা আমার দিকে তাকিয়ে বললেন : আর আমাদের ভাবনা নেই, কী বল!

মামার মন্তব্য শুনে আমি হাসলুম।

মন্দিরে প্রবেশ করবার আগে প্রথম দরজাতেই আমরা জুতো খুলে রাখলুম। কাপড়ের জুতো পায়ে দিয়ে প্রবেশের অনুমতি পাওয়া যায়, সে জুতো সেইখানেই সংগ্রহ করে নিতে হয়। স্বাতি বলল : জুতোয় আমাদের প্রয়োজন নেই, কী বল গোপালদা ?

বললুম : এমন মার্বল পাথরের উপর শুধু পায়ে হেঁটেই সুখ বেশি। এই মন্দিরে মার্বল পাথরের আয়তন জান ?

মামা জিজ্ঞাসা করলেন : কত ?

দশ হাজার বর্গ গজ।

আমরা তখন সরোবরের তীরে এসে দাঁড়িয়েছিলুম। মস্ত জলাশয়, তার স্বচ্ছ জল টলটল করছে, জলের উপর ঝিকমিক করছে রৌদ্র। চারিধার ঘিরে যে পথ তা পাথরে বাঁধানো। মাঝখানে স্বর্ণমন্দির, তীরের সঙ্গে সেতু দিয়ে যুক্ত। সেও দেখলুম পাথরের। মন্দিরের ভিতরেও পাথর। এই পাথরের পরিমাণ যে দশ হাজার বর্গ গজ হবে, তাতে আর সন্দেহ রইল না।

দূর থেকেই বোঝা যাচ্ছিল যে মন্দিরটি তিনতলা। দোতলার উপরে সোনার গম্বুজ সূর্যকিরণে ঝকমক করছে। আর বাতাসে ভেসে আসছে গান।

সেতুর দিকে এগোবার সময় আমরা আরও অনেক যাত্রীকে দেখলুম। অনেক মেয়ে পুরুষ জলে স্নান করতে নেমেছেন। তাঁদের মধ্যে শিখই বেশি। যাঁরা মন্দিরে ঢুকছেন কিংবা বেরচ্ছেন তাঁদের সকলেরই মাথায় ঘোমটা কিংবা পাগড়ি আছে। অনাবৃত মাথায় নাকি মন্দিরে ঢুকতে নেই, তাতে অসম্মান করা হয়। আমরা তাই মাথায় রুমাল বেঁধে নিয়েছিলুম। আর স্বাতি তার আঁচলখানা মাথায় তুলে দিয়েছিল। আমি হেসেছিলুম তার মুখের দিয়ে তাকিয়ে, সেও হেসেছিল মুখ লুকিয়ে। মাথায় ঘোমটা দিলে মেয়েদের অন্য রকম দেখায়, হয়তো একটু আকর্ষণও বাড়ে। নববধূর মাথায় তাই ওড়না দেবার রীতি।

এই পরিবেশটি আমাদের ভাল লাগছিল। বড় মনোরম পবিত্র পরিবেশ।

সহসা মামী জিজ্ঞাসা করলেন : এ কোন্ দেবতার মন্দির ?

স্বাতি বলল : হরমন্দির।

আমি বললুম : হরিমন্দির, এরা উচ্চারণ করে হরমন্দির।

মামা বললেন : তার মানে কি বিষ্ণুর মন্দির ?

আমি বললুম : না। শিখ সম্প্রদায়ের হর নেই, হরিও নেই, তারা একেশ্বরবাদী। এই মন্দিরকে বলে দরবার সাহেব।

মামী আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন : কোন দেবতা নেই ?

বললুম : শিখরা তাঁদের আদিগ্রন্থ গ্রন্থসাহেবেরই পূজা করেন।

মন্দিরের ভিতরে প্রবেশ করে পূজার বিধিও আমরা দেখতে পেলুম। সবাই হেঁট হয়ে গ্রন্থসাহেবকে নমস্কার করছেন। আমরাও তাই করলুম। কেউ ফুল কেউ পয়সা দিচ্ছেন। মামাও কিছু দিলেন। তার বদলে আমরা আশীর্বাদ আর প্রসাদ পেলুম।

গানের মতো সুর করে আদিগ্রন্থ থেকে পাঠ হচ্ছে। কেউ বসে কেউ দাঁড়িয়ে তা শুনছেন। ভাষা আমরা বুঝতে পারলুম না, কিন্তু সুরটি ভাল লাগল। এমনি গান এখানে রোজ হয়, দিনে এক-আধ ঘণ্টা নয়, প্রতি দিন পালা করে আঠারো ঘণ্টা গান গাইবার জন্য গায়ক আছে।

মন্দিরের ভিতরে আমরা ফিলিগ্রা ও এনামেলের কাজ দেখলুম, ফ্রেস্কো ছবিও আছে। পুরনো ফ্রেস্কোগুলি কাচ দিয়ে রক্ষা করা হয়েছে। বাহিরের দেওয়ালে মার্বল পাথরের উপর মূল্যবান পাথরও বসানো আছে। আর সোনার পাতে মোড়া গম্বুজ।

মন্দিরের ভিতর বিড়ি সিগারেট খাবার হুকুম নেই শুনলুম, মদ আনারও হুকুম নেই। মন্দিরের বাহিরেও আমি কোন শিখকে ধূমপান করতে দেখি নি। এ তাদের ধর্মে বারণ।

ফেরার পথে স্বাতি বলল : ইতিহাসের কথা কিছু বললে না ?

আমি হেসে বললুম : সে তো তোমার কাজ।

স্বাতি কিছু বলতেই চেয়েছিল, তাই আর দেরি না করে বলল : শিখদের চতুর্থ গুরু রামদাস যে অমৃতসরের প্রতিষ্ঠাতা তা জান তো?

বললুম : এই পুকুরটাও তিনি কাটিয়েছেন বলে শুনেছি।

ঠিকই শুনেছ। তাঁর ছেলের নাম অর্জুন দেব, তিনি হলেন পঞ্চম গুরু। তিনি এই শহরকে আরও বড় করতে চাইলেন, আর এই মন্দিরকে আরও সুন্দর। তাই করতে গিয়ে পুকুরের মাঝখানে এই মন্দিরটি গড়লেন। শুনে আশ্চর্য হবে যে লাহোরের একজন মুসলমান এই কাজ করেছিল। সে ছিল গুরুর একজন ভক্ত বন্ধু, নাম হজরত শেখ মিঞা মীর।

আমি বললুম : এ ঘটনা আমি কোথাও পড়ি নি, তবে অমৃতসর বড় হবার কারণ আমি জানি।

মামা বললেন : কী কারণ?

বললুম : সে যুগে এ দেশের সঙ্গে বাণিজ্য হত কাবুল কাশ্মীর ও তিব্বতের। অমৃতসর এই তিন দেশেরই বাণিজ্যপথের ওপর অবস্থিত। এক দিকে বাণিজ্যের জন্য ভিড়, তার ওপর শিখ ধর্মের প্রধান তীর্থস্থান। শহর বাড়বে না কেন!

স্বাতি আমাকে বাধা দিয়ে বলল : আমি মন্দিরের কথা বলছিলুম।

জানি, এবারে তুমি মহারাজা রণজিৎ সিংহের কথা বলবে। কিন্তু তার আগে আহমদ শাহ দুরানীর কথা কিছু বল।

তার আবার কী কথা?

মামা বললেন : তোমার বইএ বুঝি কিছু নেই!

স্বাতি আমার মুখের দিকে তাকাল।

বললুম : গুরু রামদাস সাত বছর গদিতে ছিলেন, তাঁর মৃত্যুর পর গুরু অর্জুন দেব এই সব শেষ করলেন। আহমদ শাহ দুরানী

এই শহর আক্রমণ করেছিলেন ১৭৬১ খ্রীষ্টাব্দে। শহর ধ্বংস করে মন্দিরের যথেষ্ট ক্ষতি করে গিয়েছিলেন। রণজিৎ সিংহ রাজা হয়েছিলেন অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ বৎসর, আর চল্লিশ বৎসর ধরে রাজত্ব করেছিলেন। রাজা হবার তিন বছর পরেই এই মন্দিরটি সোনা দিয়ে মুড়ে দিয়েছিলেন।

অনেকগুলি চূড়া ও একটি গম্বুজ সূর্যের আলোয় ঝকমক করছে। তারই দিকে চেয়ে মামী জিজ্ঞাসা করলেন: এ সবই কি সোনার?

এ কথার উত্তর স্বাতি দিল, বলল: তামার ওপর পাতলা সোনার পাত।

তারপরেই প্রশ্ন করল: এই যে নতুন সিংহদ্বার, এ কার পয়সায় তৈরি হল বলতে পার?

উত্তর নিজেই দিল: শিখ ও হিন্দু ভক্তের পয়সায়।

এখানে আমরা শিখ ইতিহাসের নূতন জাদুঘর দেখলুম। শিখ যুদ্ধের অনেক সুন্দর ছবি, এঁকেছে এক তরুণ শিল্পী কৃপাল সিংহ। আর একটি জাদুঘরে শুনলুম আদিগ্রন্থের হাতে লেখা নকলের সংগ্রহ আছে।

তারপরে আমরা আকাল তখ্‌ত দেখতে গেলুম। এক শো হাত দূরে একটি ঐতিহাসিক সৌধ। দর্শনীয় বিশেষ কিছু নেই। গুরু গোবিন্দ সিংহের ব্যবহৃত অস্ত্রাদি আর হীরে জহরৎ সব বন্ধ থাকে। বিশেষ উৎসবের দিনে দেখতে পাওয়া যায়। মামী বললেন: এ আবার এমন কী দেখবার জায়গা!

বললুম: এই তখ্‌ত ঐতিহাসিক তাৎপর্যপূর্ণ।

মামা জিজ্ঞাসা করলেন: আকাল তখ্‌ত মানেটা কী?

স্বাতি এ কথার মানে জানে। বলল: আকাল তখ্‌ত মানে চিরকালের দেবতার সিংহাসন। শিখদের কাছে এত সম্মানের এই কারণে যে এই সম্প্রদায়ের সমস্ত সামাজিক ও ধর্মজীবনের ঘোষণা এইখান থেকেই করা হয়।

বললুম : অন্য তখ্‌তগুলি সম্বন্ধেও কিছু বল।

স্বাতি আমার মুখের দিকে তাকাল প্রশ্ন নিয়ে।

বাবা অটলের দিকে চলতে চলতে বললুম : শিখদের তখ্‌ত সব শুদ্ধ চারটি। অমৃতসরে শ্রী আকাল তখ্‌ত সাহেবী, পাটনায় শ্রী পাটনা সাহেবী, সেখানে গুরু গোবিন্দ সিংহের জন্ম হয়েছিল; আনন্দপুরে আনন্দপুর সাহেবী, সেখানে তিনি খালসা সম্প্রদায়ের সৃষ্টি করেছিলেন; আর অবিচল নগরে শ্রী হজুর সাহেবী, সেখানে গুরু দেহত্যাগ করেছিলেন। এ সমস্তই গুরু গোবিন্দ সিংহের স্মৃতির সঙ্গে জড়িত।

বাবা অটল একটি স্মৃতিস্তম্ভ। এক শো পঞ্চাশ ফুট উঁচু, আর পরিধি এক শো বারো ফুট। নিচে মার্বল পাথর, আর উপরে সোনার ফিলিগ্রীর কাজ। চূড়ার উপরে উঠলে যে শহরের দৃশ্য সুন্দর দেখা যাবে, তা আমরা নিচে থেকেই বুঝতে পারলুম।

স্বাতি বলল : ষষ্ঠ গুরু হরগোবিন্দের ছেলে বাবা অটলরায়। তাঁরই স্মৃতিস্তম্ভ।

মামী জিজ্ঞাসা করলেন : তিনি কী করেছিলেন ?

ঘটনাটা স্বাতি ভুলে গিয়েছিল। বলল : কিছু একটা নিশ্চয়ই করেছিলেন।

সিমলায় আমি একদিন তার সমস্ত বইগুলি পড়ে ফেলেছিলুম। আমার মনে ছিল। তাই তাকে ধরিয়ে দিতে বললুম : সেই সাপে কামড়ানোর গল্প।

স্বাতি আমার দিকে একটা কটাক্ষ করে বলল : এক বিধবার একটি ছোট ছেলেকে সাপে কামড়েছিল। বাবা অটল তাঁর অলৌকিক ক্ষমতার বলে তাকে বাঁচিয়ে তুলেছিলেন। এই কাজের জন্য তাঁর বাবা গুরু হরগোবিন্দ যখন তাঁকে বকলেন, তখন তিনি সেই ছেলের বিনিময়ে নিজের প্রাণ বিসর্জন দিলেন। যেখানে এই ঘটনা ঘটেছিল, ঠিক সেইখানেই এই স্মৃতিস্তম্ভ উঠেছে।

মামী বললেন : নিজের প্রাণ দেবার কী দরকার ছিল !

মামা বললেন : না দিলে এই স্মৃতিস্তম্ভ কী করে উঠত !

বাবা অটলের সামনেই কৌলসর নামে একটি পবিত্র সরোবর। তারই নিকটে গুরু রামদাসের সরাই দেখলুম। দুপুরবেলায় গরিবদের এখানে বিনে পয়সায় খেতে দেওয়া হয়। সরাইএ যাত্রীদের থাকবার ব্যবস্থাও আছে। আর একটি দপ্তর দেখলুম, তার নাম শিরোমণি গুরুদ্বার প্রবন্ধক কমিটি। এই দপ্তরই নাকি দেশের সমস্ত শিখ মন্দির পরিচালনা করে থাকেন।

মন্দিরের দপ্তরে সরকারী গাইড পাওয়া যায় শুনলুম। মামা বললেন : একটা নেবে নাকি ?

আপত্তি করল স্বাতি, বলল : কী দরকার তার !

আমরা মন্দিরের সামনের রাস্তায় ফিরে এলুম। তার নাম বাজার মায় সেওয়ান। দোকানে দোকানে অমৃতসরে তৈরি নানারকমের জিনিস, বইপত্র ছবি ও হাতির দাঁতের জিনিস।

খানিকটা এগিয়ে গুরু বাজার। গুরু অর্জুন দেব নাকি এই বাজারের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এখন সোনা রূপার দোকানই বেশি দেখলুম।

কাছেই নাকি জালিয়ানওয়ালা বাগ।

আমরা এখন সেইখানে যাব।

জালিয়ানওয়ালাবাগ যে অমৃতসরের একটি বাগান আমি তা জানতুম না। এই নামটি পাঞ্জাবের কোন শহরের বলে আমার একটা ধারণা ছিল। কোন ভূগোলে দেখি নি, কোন ইতিহাসের বইএও এই স্থানের সম্পূর্ণ বিবরণ পড়ি নি।

জালিয়ানওয়ালাবাগের নাম আমি প্রথম জেনেছিলুম রবীন্দ্রনাথের জীবনী পড়বার সময়। ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দের ২৯শে মে। রাতে তাঁর চোখে নিদ্রা নেই। অস্থির ভাবে নিজের ঘরের মধ্যে পায়চারি করছেন আর ভাবছেন। ভারতের সম্রাট নাইট উপাধি দিয়ে তাঁকে সম্মানিত করেছেন। কিন্তু তাঁর হৃদয় পুড়ে যাচ্ছে। ১৩ই এপ্রিল জালিয়ানওয়ালাবাগে যে নৃশংস হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়েছে, পৃথিবীর ইতিহাসে তার তুলনা নেই। ইংরেজ সরকারের জেনারেল ডায়ার দেড়-দুহাজার নিরস্ত্র নরনারীকে কুকুরের মতো গুলি করে হত্যা করেছে। ডিফেন্স অব ইণ্ডিয়া অ্যাক্টের ভয়ে প্রতিবাদ জানাতে কেউ সাহস পাচ্ছে না।

ট্রিবিউন পত্রিকার কালীনাথবাবুকে পুলিস ধরে নিয়ে গেছে। অমল হোমের কাছ থেকে পত্র পাচ্ছেন না। চিঠিপত্র আসছে না বলে তিনি সন্দেহ করছেন। শান্তিনিকেতন থেকে কলকাতায় এসে তিনি পরিচিত দেশনেতাদের প্রায় সকলের সঙ্গেই দেখা করেছেন। সবাইকে একটা প্রোটেস্ট মিটিংএর ব্যবস্থা করতে বলেছেন। গান্ধীজীর সঙ্গে তিনি পাঞ্জাবে যেতে চেয়েছিলেন, কিন্তু গান্ধীজী রাজী হন নি। পাঞ্জাব সরকার একবার তাঁকে ঢুকতে দেয় নি, আর তিনি যাবেন না।

পায়চারি করতে করতে রবীন্দ্রনাথ ভাবছিলেন যে এই বিদেশী প্রভুর প্রদত্ত সম্মান গ্রহণ করে তিনি তাঁর দেশের মানুষের সঙ্গে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছেন। এই উপাধি তাঁর বর্জন করা উচিত। তারপর বড়লাটকে লিখলেন, "Your Excellency, the enormity of

the measures taken by the Government in the Punjab for quelling some local disturbances has, with a rude shock, revealed to our minds the helplessness of our position as British subjects in India···The time has come when badges of honour make our shame glaring in their incongruous contest of humiliation, and I for my part wish to stand, shorn of all special distinctions, by the side of those of my countrymen, who, for their so-called insignificance, are liable to suffer a degradation not fit for human beings. And these are the reasons which have painfully compelled me to ask your Excellency, with due deference and regret, to relieve me of my title of Knighthood, which I had the honour to accept from His Majesty the King at the hands of your predecessor, for whose nobleness of heart, I still entertain great admiration."

["অদ্যকার দিনে আমাদের ব্যক্তিগত সম্মানের পদবীগুলি চতুর্দিকবর্তী জাতিগত অবমাননার অসামঞ্জস্যের মধ্যে নিজের লজ্জাকেই স্পষ্টতর করিয়া প্রকাশ করিতেছে। অন্তত আমি নিজের সম্বন্ধে এই কথা বলিতে পারি যে আমার যে সকল স্বদেশবাসী তাহাদের অকিঞ্চিৎকরতার লাঞ্ছনায় মনুষ্যের অযোগ্য অসম্মান সহ্য করিবার অধিকারী বলিয়া গণ্য হয়, নিজের সমস্ত বিশেষ সম্মানচিহ্ন বিসর্জন করিয়া আমি তাহাদেরই পার্শ্বে নামিয়া দাঁড়াইতে ইচ্ছা করি। রাজাধিরাজ ভারতেশ্বর আমাকে 'নাইট' উপাধি দিয়া সম্মান করিয়াছেন; সেই উপাধি পূর্বতন যে রাজপ্রতিনিধির হস্ত হইতে গ্রহণ করিয়াছিলাম তাঁহার উদারচিত্ততার প্রতি চিরদিন আমার পরম শ্রদ্ধা আছে। উপরে বিবৃত কারণবশতঃ বড় দুঃখেই আমি যথোচিত বিনয়ের সহিত শ্রীল

শ্রীযুক্তের নিকট অদ্য এই উপরোধ উপস্থাপিত করিতে বাধ্য হইয়াছি যে সেই নাইট পদবী হইতে আমাকে নিষ্কৃতিদান করিবার ব্যবস্থা যেন করা হয়।"]

এই চিঠি লিখবার পরে রবীন্দ্রনাথ কিছু প্রকৃতিস্থ হয়েছিলেন।

অন্যমনস্ক ভাবে পথ চলতে চলতে কখন আমরা জালিয়ানওয়ালা-বাগে পৌঁছে গিয়েছিলুম খেয়াল করি নি। স্বাতি আমার মনোযোগ আকর্ষণ করে বলল: গোপালদা নিশ্চয়ই ইতিহাসের কথা ভাবছে।

কোন্ ইতিহাস?

জালিয়ানওয়ালাবাগের।

বললুম: পড়ার বইএ এ ইতিহাস পড়ি নি। ইংরেজের আমলে সত্যি কথা লিখলে লেখকের জেল হয়ে যেত।

এখন?

অমন অসংখ্য নৃশংস ঘটনার মধ্যে ওর মূল্য কমে গেছে।

আশ্চর্য হয়ে স্বাতি বলল: এমন ঘটনা কি আরও অনেক আছে?

হয়তো অমন বীভৎস ঘটনা আর নেই, কিন্তু নৃশংস ঘটনা নিশ্চয়ই আছে। দেশকে যারা স্বাধীন করতে চেয়েছে, তাদের উপরে অত্যাচার তো কম হয় নি।

মামী এবারে বললেন: কী হয়েছিল এখানে?

আমরা তখন জালিয়ানাওয়ালাবাগের মাঝখানে এসে দাঁড়িয়েছি। চারখানা ফুটবল খেলার মাঠের মতো চতুষ্কোণ বাগান, তার চারি দিকে উঁচু দেওয়াল দিয়ে ঘেরা, আর একটি মাত্র যাতায়াতের পথ। স্বাতি বলল: সে আমার জন্মের অনেক আগের ঘটনা। সামরিক আইনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাবার জন্য কয়েক হাজার দিশী স্ত্রীপুরুষ এই বাগানে একত্র হয়েছিল। জেনারেল ডায়ার তাঁর সৈন্যদল নিয়ে যাতায়াতের একমাত্র পথটি বন্ধ করে দিলেন। তারপর সেই জনতার উপর অন্ধ ভাবে গুলিবর্ষণ শুরু করলেন। এসো, এগিয়ে এসো। ঐ দেওয়ালে সেই গুলির দাগ আজও দেখতে পাবে।

আমরা এগিয়ে গিয়ে সেই গুলির দাগ পরীক্ষা করে দেখলুম। তারপর দেখলুম একটি কূপ। স্বাতি বলল : সেই নৃশংস দৃশ্যের কথা কল্পনা কর। সৈন্যদের গুলিতে নিরুপায় মেয়ে পুরুষ একে একে লুটিয়ে পড়ছে। আত্মরক্ষার কোন পথ নেই। অনেক অসহায় মানুষ এই কুয়োর মধ্যেই লাফিয়ে পড়ল। একজন দুজন করে এত লোক পড়ল যে তাদের মৃতদেহেই এটা ভর্তি হয়ে গেল। এই সেই মেমোরিয়াল ওয়েল।

মামীকে বড় বেদনার্ত দেখলুম, আর মামার মুখে ঘৃণা। বললুম : এই ক্ষতির বিনিময়ে আমরা কী পেলুম জান ?

স্বাতি বলল : না।

পরাধীনতার গ্লানিতে দেশের লোকের মন ভরে গেল। যে রাজনৈতিক চেতনা দেশে আরও অনেক দিন পরে জাগত, তা জাগল রাতারাতি। বৃটিশ শক্তির বিরুদ্ধে দেশ দলবদ্ধ হয়ে গেল।

মামা জিজ্ঞাসা করলেন : কী রকম ?

সে সব ঘটনা আপনার বোধহয় মনে আছে, খবরের কাগজেই পড়েছেন। ইংরেজরা যতই কড়াকড়ি করতে লাগল, লোকেরা ততই বিক্ষুব্ধ হল। শেষ পর্যন্ত ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দে কংগ্রেসের যে অধিবেশন হল অমৃতসরে, তাতে মহাত্মা গান্ধী তাঁর অসহযোগ আন্দোলনের সংকল্প ঘোষণা করলেন।

মাথা নেড়ে মামা বললেন : মনে আছে।

মামা কিছু বলবেন ভেবে আমি তাঁর দিকে তাকালুম।

মামা বললেন : একদিন মোটরে করে কোথাও যাচ্ছিলুম। মুখে একটা সিগারেট ছিল। একটা স্কুলের ছেলে হাত তুলে মোটর আটকে বলেছিল, বিলিতি সিগারেট খেতে আপনার লজ্জা করছে না ? সিগারেটটা আমাকে ফেলে দিতে হয়েছিল। তারপর অনেক দিন বার্মা চুরট খেয়েছিলুম। শেষ পর্যন্ত এই পাইপ ধরেছি। কিন্তু সিগারেট আর খাই নি।

স্বাতি বলল : আজকাল যে টোবাকো খাচ্ছ, সেও তো বিলিতি। এখন সবই এ দেশে তৈরি হচ্ছে।

শহরের অন্য প্রান্তে আমরা দুর্গিয়ানা মন্দির দেখলুম। দুর্গার মন্দির। শিখদের দরবার সাহেবের মতো হিন্দুদের এই মন্দিরটি খুব প্রাচীন নয়। কিন্তু আকারে কতকটা একই রকম। বিরাট এক সরোবরের মাঝখানে অবস্থিত, পারের সঙ্গে তার সংযোগ আছে সেতু দিয়ে। সাদা মার্বল পাথরে তৈরি এই মন্দিরে একটা পবিত্র গাম্ভীর্য দেখে আমরা মুগ্ধ হলুম। সোনা দিয়ে মোড়া চূড়া নেই। ভিড় নেই যাত্রীদেরও। কিন্তু গান হচ্ছে। হয়তো এখানেও সারাক্ষণ গান হয়। দেবীকে প্রণাম করে আমরা বেরিয়ে এলুম।

অমৃতসরে দ্রষ্টব্য স্থান আরও ছিল। শহরের বাহিরে ঐতিহাসিক বাগান রামবাগ গার্ডেন। একদা এটি মহারাজ রণজিৎ সিংহের গ্রীষ্মাবাস ছিল। এখনও সেই প্রাসাদ আছে। আর বাগানের ভিতরেই অনেকগুলি ক্লাব। নিকটে গ্ল্যান্সি মেডিক্যাল কলেজ আর কুষ্ঠরোগী ও অক্ষমদের থাকবার জায়গা পিঙ্গলওয়ারা।

শহর থেকে তিন মাইল পশ্চিমে খালসা কলেজ। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিকে ইংরেজ সরকারের চেষ্টায় শিখদের জন্য এই কলেজের প্রতিষ্ঠা হয়েছিল। অকৃপণ হাতে অর্থব্যয় করেছিলেন শিখ রাজা ও জমিদারেরা।

কিন্তু আমরা আর এ সমস্ত দেখতে গেলুম না। মামী বললেন : বেলার খেয়াল আছে?

সত্যিই তখন বেলা অনেক হয়েছিল। মাথার উপরে মধ্যাহ্নের সূর্য নিষ্ঠুর প্রখর। মামা তবু বললেন : ঝামেলা শেষ করে ফিরলেই ভাল ছিল।

স্বাতি জিজ্ঞাসা করল : ঝামেলা কিসের?

খেয়েদেয়েই আবার বেরতে বলবে তো?

মামী বললেন : সে তো তোমার আরও বড় ঝামেলা।

স্বাতি হাসল এবং দুখানা রিক্শাও যোগাড় করে ফেলল। সামনের রিক্শায় মায়ের সঙ্গে উঠে বলল : সোজা স্টেশন।

ফেরার পথে মামা আবার তাঁর পুরনো প্রসঙ্গে ফিরে এলেন। বললেন : চতুর্থ গুরু রামদাসের কথা তুমি শেষ কর নি।

কতটুকু বলেছি, আর কী বাকী আছে, সহসা সে কথা আমার মনে পড়ল না। বললুম : অমৃতসর প্রতিষ্ঠা ছাড়াও গুরুর আর একটি কীর্তি আছে।

কী?

শিখ গুরুর পদ তিনি বংশপরম্পরাগত করেছিলেন। স্ত্রীর ইচ্ছায় তিনি তাঁর কনিষ্ঠ পুত্র অর্জুন মল্লকে নিজের জীবিতকালেই গদিতে বসান। গুরুর পদে তিনি সাত বছর ছিলেন, এবং তার পরে আরও পাঁচ বছর বেঁচে ছিলেন।

অর্জুন মল্ল ফকিরের বেশে গুরুর গদিতে বসেন নি, বসেছিলেন মালা ত্যাগ করে রাজার বেশে। গুরুর গদিকে তিনি রাজদরবারে পরিণত করেন, প্রণামীকে করেন নজরানা। শিখরা গুরুকে শ্রদ্ধায় যে প্রণামী দিত, তা বাৎসরিক বৃত্তির মতো আদায়ের জন্য তিনি চেলা নিযুক্ত করেন। গুরুকেই শিখরা তাদের রাজা বলে মেনে নিল। এখন থেকেই এই সম্প্রদায় একটি শক্তিতে পরিণত হতে লাগল। ইংরেজীতে বলে যে তিনি শিখ জাতিকে দিয়েছিলেন a code, a capital, a treasury and a chief.

মামা বললেন : গ্রন্থসাহেব শুনেছি গুরু অর্জুনেরই রচনা।

রচনা ঠিক নয়, এই আদিগ্রন্থ তিনি সংকলন করেন। নানক ও তাঁর পরবর্তী গুরুদের উপদেশ ও ধর্মের ব্যাখ্যাগুলি তিনি এই গ্রন্থে একত্র করেন। এই ধর্মগ্রন্থই শিখদের আদিগ্রন্থ গ্রন্থসাহেব নামে পূজিত হচ্ছে।

মামা বললেন : তারপর ?

তারপর হরগোবিন্দের কথা। ১৬০৬ খ্রীষ্টাব্দে পঁচিশ বছর রাজত্বের পর গুরু অর্জুনের যখন মৃত্যু হয়, তখন তাঁর পুত্র হরগোবিন্দের বয়স এগার বছর। এঁর বীরত্ব ইতিহাস-প্রসিদ্ধ। মোগল বাদশাহ জাহাঙ্গীরের সেনাদলের নায়ক হয়ে তিনি কাশ্মীরে অভিযান চালান। তারপরে বাদশাহর বিরাগভাজন হন তাঁর দলে দস্যু ও দণ্ডিত ব্যক্তিকে গ্রহণ করার জন্য। সৈন্যদের বেতন আত্মসাৎ করার অপরাধে বাদশাহ তাঁকে গোয়ালিয়রের দুর্গে অবরুদ্ধ করেন। পরে অবশ্য শিখদের আবেদনে তাঁকে মুক্তি দেন।

মামা বললেন : এ কোন বীরত্বের কথা হল ?

স্বীকার করলুম : না।

তবে তিনি ইতিহাসে বিখ্যাত হলেন কিসে ?

বললুম : শাহজাহানের সঙ্গে তাঁর বিবাদের জন্যে। বাদশাহকে সেনা সাহায্য করবার জন্যে তিনি নিযুক্ত হয়েছিলেন। বাদশাহজাদা দারাশিকোর সঙ্গে বন্ধুতার জন্যে কিংবা অন্য কারণে শাহজাহান তাঁর প্রতি রুষ্ট হন। তাঁকে দমন করবার জন্যে সাত হাজার মোগল সেনা নিয়ে যে সেনাপতি এসেছিলেন, তাঁকে তিনি অমৃতসরের নিকটে পরাজিত করলেন। কিন্তু আত্মরক্ষার জন্যে ভাটিণ্ডার জঙ্গলে গিয়ে আশ্রয় নিলেন। এইখানে বাবা বুদ্ধা নামে এক দস্যু সর্দার সদলে তাঁর শিষ্য হয়। এরা বাদশাহর দুটি ঘোড়া লাহোর থেকে চুরি করে গুরুকে উপহার দিয়েছিল বলে মোগল সেনা আবার তাঁকে আক্রমণ করে। যুদ্ধে দুজন মোগল সেনাপতি পরাজিত ও নিহত হয়। বাদশাহর সেনার সঙ্গে গুরু হরগোবিন্দের তৃতীয় বার যুদ্ধ হয়। সেবারেও তিনি বীরত্বের পরিচয় দিয়েছিলেন। লোকে বলে, হরগোবিন্দ এক সঙ্গে দুখানা তলোয়ার রাখতেন, একখানা ধর্মের ও অপরটি সম্প্রদায়ের উপর তাঁর কর্তৃত্বের চিহ্ন রূপে। পৌত্র হররায়কে গুরুর পদে অধিষ্ঠিত করে তিনি বাবা বুদ্ধার সঙ্গে বানপ্রস্থে গিয়েছিলেন।

হররায় তাঁর শান্ত স্বভাব নিয়ে ঔরঙ্গজেব বাদশাহর সঙ্গে বিবাদ করতে সাহসী হন নি। তাই উদ্ধত শিখদের দমন করবার জন্য বাদশাহ যখন তাঁকে তাঁর দরবারে ডেকে পাঠালেন, তখন তিনি বাদশাহর বশ্যতা স্বীকার করে পুত্র রামরায়কে পাঠিয়েছিলেন। তাঁর মৃত্যুর পরে তাঁর কনিষ্ঠ পুত্র হরেকৃষ্ণ গুরু হয়েছিলেন পাঁচ বছর বয়সে॥ কিন্তু তিন বছর পরে হঠাৎ তাঁর মৃত্যু হলে শিখরা হরগোবিন্দের কনিষ্ঠ পুত্র তেগবাহাদুরকে ডেকে এনে গুরু করে।

তেগবাহাদুর সাহসী ছিলেন। মায়ের কাছে পিতার একখানি তলোয়ার পেয়েই অর্থ সংগ্রহে মনোনিবেশ করেন। একজন মুসলমান অনুচরের সঙ্গে দস্যুবৃত্তি অবলম্বন করে শিখদের শক্তিবৃদ্ধি শুরু করেন। বাদশাহ তাঁর এই ধৃষ্টতা সহ্য করেন নি, দিল্লীতে ধরে নিয়ে গিয়ে তাঁকে বধ করেন।

তেগবাহাদুরের জীবন নিয়ে অনেক অলৌকিক কাহিনী আছে। হরগোবিন্দ তাঁর কনিষ্ঠ পুত্রকে বঞ্চিত করে পৌত্র হররায়কে গুরু করেন। তাঁর স্ত্রী যখন এর কারণ জানতে চান, তখন তিনি বলে-ছিলেন যে তেগবাহাদুরও একদিন গুরু হবে ও তার পুত্র হবে আরও বরণীয়। সত্যিই তাঁর পুত্র গোবিন্দ সিংহ সারা ভারতের বরণীয় হয়েছেন।

ঔরঙ্গজেবের সৈন্যেরা যখন তেগবাহাদুরকে দিল্লীতে ধরে নিয়ে যাচ্ছে, তখন তিনি গোবিন্দ সিংহকে ডেকে বলেছিলেন, এই নাও তোমার পিতামহের তরবারি। আমি আর ফিরব না, কিন্তু আমার দেহ যেন কুকুরে না খায়। পনের বছরের কিশোর তার পিতার আদেশ পালন করেছিল। তেগবাহাদুরের ছিন্ন মস্তক আনন্দপুরে সমাধিস্থ করা হয়েছে। অনেকে বলেন যে কারাগারে অত্যাচার করে যখন তাঁকে বধ করা হয়, তখন তাঁর মাথা একজন বিশ্বস্ত শিখের কোলে গিয়ে পড়ে। সে সেই মাথা নিয়ে আনন্দপুরে ছুটে আসে।

চারি দিক অন্ধকার করে এক প্রচণ্ড ঝড় উঠেছিল, ধুলোর ভিতর কেউ তাকে অনুসরণ করতে পারে নি।

ঔরঙ্গজেব তেগবাহাদুরকে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করবার জন্য অনেক উৎপীড়ন করেছিলেন। গুরু দৃপ্তকণ্ঠে বলেছিলেন, মক্কার ধর্মপ্রচারক পৃথিবীতে এক ধর্ম প্রবর্তন করতে পারেন নি, তুমি তা কী করে পারবে! বাদশাহ হুকুম দিয়েছিলেন, যতক্ষণ ও ইসলাম ধর্ম না মানে, ততক্ষণ অত্যাচার চালিয়ে যাও। মৃত্যুকেই তেগবাহাদুর মেনে নিয়েছিলেন।

তাঁর আর একটি ভবিষ্যদ্বাণী গুরুমুখী কাহিনীতে অক্ষয় হয়ে আছে। ঔরঙ্গজেব নাকি বলেছিলেন যে গুরু তাঁর বাসগৃহের ছাদ থেকে হারেমের দিকে তাকিয়েছিলেন। গুরু বলেছিলেন, না, তোমার হারেমের দিকে নয়, তোমার বেগমদের দিকেও আমি তাকাই নি। আমি দেখছিলুম সাগরপারের সেই বিদেশীদের, যারা তোমার পর্দা ছিঁড়ে সাম্রাজ্যটাই ধ্বংস করতে আসছে। শিখ লেখকরা নাকি লিখেছিলেন যে ১৮৫৭র সিপাহী বিদ্রোহে ইংরেজ সৈন্য এই জিগীর তুলেই দিল্লীর মোগলদের আক্রমণ করেছিল। গুরু তেগবাহাদুরের ভবিষ্যদ্বাণী মিথ্যা হয় নি।

২৫

স্টেশনে ফিরে এসে আমরা আর দেরি করি নি। রেস্টরেণ্টে খেয়ে বিশ্রাম করতে এলুম। একখানা আরাম চেয়ারে হেলান দিয়ে মামা তাঁর পাইপ ধরালেন। খানিকটা ধোঁয়া মুখে যেতেই মন মেজাজ প্রসন্ন হল। স্বাতির দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন : কদিন এখানে থাকা হবে তাই বল।

স্বাতি তার গাইড বই খুলে বসেছিল। গভীর মনোযোগে কিছু পড়ছিল। মুখ তুলে প্রশ্ন করল : আমাকে বলছ ?

মামা বললেন : এবারে তো তোমার ওপরেই সব ভার।

স্বাতি বলল : সেই কথাই ভাবছি।

কী স্থির করলে ?

আজ রাতেই আমরা পাঠানকোট রওনা হতে পারি।

মামী আশ্চর্য হয়ে বললেন : আজই রাতে !

স্বাতি বলল : দেখবার আর বিশেষ কিছু বাকি নেই। এক দিকে রামবাগ গার্ডেন, আর এক দিকে একটা গুরুদ্বার, নামটা সরগড়ি না কী ঠিক উচ্চারণ করতে পারছি না।

মামী বললেন : আরও গুরুদ্বার আছে !

কয়েকটা লাইন পড়ে নিয়ে স্বাতি বলল : কুইন ভিক্টোরিয়ার স্ট্যাচুর কাছে এই গুরুদ্বার। এক দল বীর শিখ সৈন্যের স্মৃতি রক্ষার জন্যে ইংরেজ সরকার এটি নির্মাণ করেছে। তারা উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত রক্ষার কাজে মারা গিয়েছিল।

মামী বললেন : গুরুদ্বার দেখে আর কাজ নেই। সময় থাকলে বাজারটা একবার দেখে নেওয়া যাবে।

স্বাতি বলল : গান্ধী বাজার আর গুরু বাজার নামে দুটো বাজারের নাম দেখছি। কাশ্মীর এম্পোরিয়াম আছে, আর ঈস্ট

ইণ্ডিয়া কার্পেট অ্যাণ্ড উলেন মিলস্। এক শো বছর ধরে এই মিলে কার্পেট আর শাল তৈরি হচ্ছে।

মামা হেসে বললেন : আর কিছু ?

স্বাতি হাসল না, গম্ভীর ভাবে বলল : আর নর্দার্ন ইণ্ডিয়ান অ্যাকাডেমি অব ফাইন আর্টস।

সে আবার কী ?

স্বাতি পড়ে নিয়ে বলল : রামবাগ গার্ডেনে যাবার পথে পড়ে। ইণ্ডিয়ান আর্টের একটা সেণ্টার। মাঝে মাঝে একজিবিশন হয় সেখানে।

মামা বললেন : বুঝেছি। তাহলে কখন আমাদের ট্রেনে চাপতে হবে ?

এ কথার উত্তর না দিয়ে স্বাতি বলল : দ্রষ্টব্য স্থান যে আর একটা রয়ে গেল—তরণ তারণ। না না, সে অমৃতসরে নয়, এখান থেকে পনর মাইল দক্ষিণে। গুরু অর্জুন প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এখানকার সরোবরে স্নান করলে নাকি কুষ্ঠরোগ ভাল হয়।

মামী বললেন : সত্যি নাকি !

স্বাতি উত্তর দিল : তাইতো লিখেছে।

গাইড বইএর শেষ পাতাটাও স্বাতি দেখে নিল। তারপর সেটা রেখে দিয়ে টাইম-টেবলটা তুলে নিল। ঠিক পাতাটা বার করতে তার বেশ সময় লাগল। একবার চোখ বুলিয়েই বলে উঠল : ওমা, এ যে মাত্র সাতষট্টি মাইল পথ, তিন ঘণ্টাতেই পৌঁছনো যায়।

বুঝতে পারলুম যে সে অমৃতসর থেকে পাঠানকোটের দূরত্বের কথা বলছে। বললুম : তাহলে তো বিপদ আছে !

কেন ?

প্রথম রাতে রওনা হলে মাঝ রাতে পৌঁছব।

স্বাতি বলল : কাশ্মীর মেল তো সকাল সাতটায় দেখছি। আর সকাল ছটায় যে ট্রেন পৌঁছয় তা ছাড়ে রাত তিনটেয়।

মামা বললেন : এখান থেকে যদি ছাড়ে, তাহলে খেয়েদেয়ে গাড়িতে উঠেই আমরা ঘুমতে পারি।

শেষ পর্যন্ত তাই স্থির হল। রাতের খাওয়া সেরে আমরা গাড়িতে উঠে ঘুমোব। অবশ্য যদি গাড়িখানা প্ল্যাটফর্মের উপরে পাওয়া যায়। স্বাতি বলল : ব্যবস্থা তাহলে এখুনি আমাদের করতে হবে।

সে ভাবনা আমার নয়।

বলে মামা গভীর ভাবে পাইপ টানতে লাগলেন।

আমি ভেবেছিলুম যে এবারে তিনি আমাকে গুরু গোবিন্দ সিংহের কথা জিজ্ঞাসা করবেন। নয় জন গুরুর কথা তাঁকে বলেছি, দশম গুরুর কথা এখনও বাকি আছে। এই বক্তৃতার কাজ থেকে অব্যাহতি পাবার জন্য একটা ফন্দি আমার মাথায় এসেছিল। ভাবছিলুম যে টিকিট কাটা ও গাড়ি রিজার্ভ করার নাম করে উঠে পড়ব। কিন্তু তার আগে মামা জিজ্ঞাসা করলেন : লাহোর এখান থেকে কত দূর?

স্বাতি বলল : লাহোর তো এখন পাকিস্তানে।

আমি বললুম : মাইল তিরিশেক দূরে শুনেছিলুম। তবে পাকিস্তানের সীমান্ত মাঝপথে। জায়গাটার নাম বোধহয় ওয়াগা।

স্বাতি তাড়াতাড়ি গাইড বইখানা খুলে বলল : ঠিক বলেছ। ওয়াগা এখান থেকে ষোল মাইল দূরে, ভারত ও পাকিস্তানের সীমানা।

মামা বললেন : পাকিস্তানেও অনেক সুন্দর জায়গা আছে, সে সব বোধহয় আর আমাদের দেখা হবে না।

মামীর দিকে তাকিয়ে আমি বললুম : একটি পীঠস্থান আমাদের আর দেখা সম্ভব হবে না।

মামী জিজ্ঞাসা করলেন : কোন্‌টা?

বললুম : মরুতীর্থ হিংলাজ।

মামা বললেন : হ্যাঁ হ্যাঁ, মনে পড়ছে। সেবারে বলেছিলে বটে।

মামী বললেন : আমার কিছুই মনে পড়ছে না।

স্বাতি বলল : হিংলাজ নামটাই শুধু মনে আছে।

আমি হেসে বললুম ঃ একান্ন পীঠের প্রথম পীঠ হিংলাজ। সতীর ব্রহ্মরন্ধ্র এখানে পড়েছিল। শক্তি কোট্টরী এবং ভৈরব ভীমলোচন।

স্বাতি বলল ঃ আমার শুধু পথের দুর্গমতার কথাই মনে আছে। উটের পিঠে যেতে হয়। সাংঘাতিক মরুভূমির ভেতর একেবারে অসাধ্য জায়গা।

এই তীর্থের কথা আমি প্রাচীন গ্রন্থে পড়েছি। এমন কঠিন জায়গা বলে আমার জানা নেই। সিন্ধু নদীর মোহানা থেকে আশি মাইল পশ্চিমে, আরব সাগর থেকে বারো মাইল দূরে। হিঙ্গল নদীর তীরে এই হিঙ্গুলা বা হিংলাজ পীঠ পাহাড়ের উপর। কালীর মন্দির, কিন্তু স্থানীয় লোক তাকে 'নানী' বা 'মহামায়ী' বলে।

শিবনারায়ণস্বামীর ভ্রমণ-বৃত্তান্তে অন্য কথা পড়েছি। জাহাজে চেপে তিনি করাচী যান, সেখান থেকে নগর ঠাট্টা, তারপর মরুভূমি। 'সেথো'র সঙ্গে উটের পিঠে চড়ে হিংলাজ। যাতায়াতে বারো চোদ্দ দিন সময় লেগেছিল। তাঁর তীর্থের বর্ণনা কিছু অন্য রকম। কালী-মন্দিরের উল্লেখ নেই, আছে একটি কুণ্ডের কথা। এক মুসলমান বৃদ্ধা প্রদীপ জেলে অপেক্ষা করে। যাত্রীরা স্নান সেরে বিভূতি মাখে, পরে জ্যোতি দর্শন ও দানপুণ্য করে ফিরে আসে। আদায়ের কথাও স্বামীজী লিখেছেন। সমস্তই নগর ঠাট্টার মোহান্তের লভ্য, ভাগ পায় 'সেথো' আর সেই মুসলমান বৃদ্ধা।

মামার হাই উঠছিল, পাইপের আগুনও ফুরিয়ে গিয়েছিল। এই-বারে তিনি একটু শোবেন। স্বাতি আমার মুখের দিকে তাকিয়ে মনের কথা বোধহয় বুঝল, বলল ঃ চল, আমরা টিকিটের ব্যবস্থা করি।

প্রস্তাবটি মামার পছন্দ হয়েছিল, বললেন ঃ টাকা পয়সা আছে তো?

নিজের ব্যাগটি সংগ্রহ করে স্বাতি উত্তর দিল ঃ আছে।

মামী বললেন ঃ বেশি দেরি করবে না তো তোমরা?

স্বাতি বলল ঃ না।

তারপরে আমরা বেরিয়ে এলুম।

আরও কোন কোন জায়গায় আমরা এমনি করে বেরিয়ে এসেছি। ঘুরে ঘুরে স্টেশন দেখেছি, আর গল্প করেছি ওয়েটিং রূমে বসে। স্বাতি যখন রিজার্ভেসনের ব্যবস্থা করছিল, আমি তখন তার পাশে দাঁড়িয়ে পুরনো দিনের কথা ভাবছিলুম। সেদিন আমি স্বপ্ন দেখা শিখেছিলুম, কিন্তু আজ সে সাহস যেন হারিয়ে ফেলেছি। হারিয়েছি সিমলার জাখু পাহাড়ে। আমার মনে হল, আজ ছুপুরটা আমাদের কাটবে না। জীবনের স্বচ্ছন্দ গতির সামনে যদি বাধা থাকে, তবে সে বাধা অতিক্রম করা যায়। বাধা ছুর্লঙ্ঘ্য হয় যখন মন বেগড়ায়। আজ আমার মনে সেই চলার বেগ নেই।

স্বাতি তার কাজকর্ম শেষ করে আমার দিকে তাকিয়ে হাসল। কেন হাসল সে কথা আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলুম না। বললুম: এবারে কি ওয়েটিং রূমে গিয়ে বসতে হবে?

দাঁড়াতে যদি কষ্ট হয় তো সোজা ওয়েটিং রূমেই চল।

কিন্তু আমরা সোজা ওয়েটিং রূমে গেলুম না। প্রথমে আমরা ঘুরে ঘুরে স্টেশনটা দেখলুম, তারপরে গেলুম ওয়েটিং রূমে। ছুখানা চেয়ার দখল করে পাশাপাশি বসলুম।

প্রথমেই স্বাতি হাসল, সেই কৌতুকে ভরা মিষ্টি হাসি।

আমি চারি দিকের যাত্রীদের দিকে চেয়ে কোন কৌতূহল দেখলুম না। বললুম: কোন মজার কথা মনে পড়ল বুঝি?

মজার কথাই বটে।

কিন্তু সে কথা বলল আরও একবার হাসবার পরে: রানাবাবুকে তুমি বুদ্ধিতে তোমার চেয়ে খাটো ভাবতে। এখন দেখছি তুমি নিজেই অনেকের চেয়ে—

আমি তৎপর ভাবে বললুম: নিজের কথা আমি জানি। কিন্তু রানাকে তো আমি কখনও নির্বোধ বলি নি।

বল নি, কিন্তু ভেবেছ।

এ কথার প্রতিবাদ আমি করতে পারলুম না, কেননা কথাটা মিথ্যা নয়। রানাকে আমি কোন দিনই খুব বুদ্ধিমান ভাবতে পারি নি। আর নিজেকে বোকা ভাবা খুব কঠিন কাজ।

স্বাতি বলল : কই, উত্তর দিলে না যে?

এ কথার উত্তর তোমার জানা। কেননা তুমিও আমাকে তোমার চেয়ে বুদ্ধিতে অনেক খাটো ভাবো।

সহাস্যে স্বাতি বলল : সে কথা কি মিথ্যে?

না।

স্বীকার করলে তাহলে!

দুনিয়ার সব পুরুষই নারীর কাছে নির্বোধ। আমি তার ব্যতিক্রম নই। তবে সে বুদ্ধি কল্যাণের না ছলনার, তা বিচার করে দেখা দরকার।

স্বাতি তার দৃষ্টি দিয়ে আমাকে ভর্ৎসনা করল।

আমি বললুম : এ সব তর্কের কথা থাক। রানার গল্পটাই বল।

স্বাতি বলল : আমার দুঃখ হয় এই ভেবে যে রানাবাবুর দুঃখটা তার বাবাও বুঝল না।

তুমি বুঝেছ তো, সেই তার ভাগ্য।

স্বাতি রাগ করল না, বলল : আমি বুঝে তো তার কোন লাভ হবে না। লাভ হত তার বাবা বুঝলে। তার বন্ধুবান্ধবরা কিছু বুঝলেও তাকে এমন বদনামের ভাগী হতে হত না।

বললুম : ভূমিকাটি ভাল হয়েছে, এইবারে কাহিনী শুরু কর।

সবাই শুনেছে যে রানাবাবু অফিসের একটা স্টেনোগ্রাফার মেয়েকে বিয়ে করেছে। কিন্তু কেন করেছে তা কেউ শোনে নি। রানাবাবু তাকে বিয়ে করে অনেক অসম্মানের হাত থেকে মেয়েটাকে রক্ষা করেছে।

তবে যে আমি শুনলুম তারা ভালবেসে বিয়ে করেছে!

ভুল শুনেছ। মেয়েটা রানাবাবুর স্টেনো ছিল না, ছিল তার

স্টেনোর বন্ধু। এই সুবাদেই তার বিয়েতে রানাবাবুকে নিমন্ত্রণ করেছিল। বিয়েটা আকস্মিক।

বিয়েটা কি তাহলে অন্য লোকের সঙ্গে হচ্ছিল ?

তাদের অফিসেরই একটি পাঞ্জাবী ছেলের সঙ্গে।

এইবারে আমি আশ্চর্য হলুম, বললুম : এ যে নাটকের মতো মনে হচ্ছে!

স্বাতি বলল : পুরনো নাটক। বাঙলাদেশে মেয়ের বাপ পুরো পণ দিতে পারে নি বলে বরকে পিঁড়ি থেকে তুলে নিয়ে গেছে ছেলের বাপ। কিংবা কোন কলঙ্কের কথা প্রকাশ হয়ে পড়েছে বলে বিয়ে ভেঙে গেছে।

হেসে বললুম : এই সুযোগে উদার হৃদয় নায়ক এসে পিঁড়ির ওপর বসে পড়ল। হাততালি পড়ল চারি দিক থেকে।

রানাবাবুও ঠিক এই কাজই করেছে। কিন্তু হাততালি নেবার জন্যে করে নি, এ কাজের পরিণামের কথা ভাল করে জেনেও করেছে।

এর পরে স্বাতি আমাকে অনিতার কথা শোনাল। অনিতা সেই মেয়েটির নাম। স্বাধীনতার জন্য দেশ বিভাগের সময় পশ্চিম পাঞ্জাব থেকে অনিতা পূর্ব পাঞ্জাবে এসেছিল একা। সে তখন বালিকা। পথে তার পিতার প্রাণ গেছে। আর হারিয়ে গেছে মা। কী ভাবে কেমন করে কার চেষ্টায় সে এ দেশে এল, আজ তা ভাল করে মনে পড়ে না। এক আত্মীয়ের বাড়িতে সে আশ্রয় পেয়েছিল। কিন্তু সে স্বল্পকালের জন্যে। তারপর যখন তার মা এসে পেঁ‌ৗছল, তখনই সে আশ্রয়চ্যুত হল। একটি কথা তার আজও মনে আছে। বাড়ি থেকে বার করে দেবার সময় তারা তার মাকে বলেছিল, বিষ খেয়ে মরতে পারলে না? তার মা তাদের এ কথার উত্তর দেয় নি, দিত তাকে। কখনও রেগে গেলে বলত, তোর জন্যেই তো মরতে পারলাম না। তারপর তার একটি ভাই হয়েছিল, সেই ভাই এখন বালক।

সহসা স্বাতি জিজ্ঞাসা করল : রানাবাবু আমাকে কী বলেছে জান

গোপালদা ? বলেছে যে, কলঙ্ক তো অনিতার মায়ের নয়, কলঙ্ক আমাদের দেশের। দেশের নেতাদের। অনিতাকে শাস্তি দিয়ে কি সেই পাপের প্রায়শ্চিত্ত হবে ?

সমস্ত ঘটনাটা আমি বুঝতে পেরেছি। তাদের এই কাহিনীটা প্রকাশ হয়ে পড়ায় সেই পাঞ্জাবী যুবকটি পিছিয়ে গেছে। স্বাতি বলল : শুধু সেই ছেলেটা নয়, তাদের পরিচিত সমস্ত ছেলেই পিছিয়ে গেল। রানাবাবু বিয়ে না করলে অনিতার হয়তো বিয়েই হত না।

স্বাধীনতা আমরা সংগ্রাম করে অর্জন করি নি। তাই তার মহত্ত্ব আমরা জানি না, তার দায়িত্ব সম্বন্ধেও নই সচেতন। আমাদের স্বাধীনতায় রক্তক্ষরণ হয়েছে সংকীর্ণ সাম্প্রদায়িকতায়। আজও সেই রক্তক্ষরণ বন্ধ হয় নি। দীর্ঘ দিন এই দেশ আপন স্বার্থে সাম্প্রদায়িকতাকে লালন করেছে। তারপর বিদেশীরা বাঁচিয়ে রেখেছিল এই ঘৃণ্য মনোভাব। আজ পৃথক হয়েও আমরা সেই কথা ভুলতে পারছি না।

এই সম্বন্ধে কিছু ভাবতে গেলে আমার আর একটি কথা মনে হয়। অন্যত্র কত ছোট ছোট রাষ্ট্র কত সুস্থ জীবন যাপন করছে। আমরা তা পারি না কেন! কেন আমরা মানুষের প্রাথমিক অধিকারকে সহজে মেনে নিতে পারি না! ধর্ম কেন রাষ্ট্রীয় বিঘ্নের কারণ হবে!

স্বাতি আমার চিন্তায় বাধা দিল, বলল : আবার কী ভাবতে শুরু করলে ?

বললুম : আজ আমরা এই কথা ভাবছি, কিন্তু সেদিনের সমস্যাটা কি কল্পনা করতে পার, যেদিন ভারত স্বাধীন হয়েছিল!

স্বাতি শিউরে উঠল না। কিন্তু তার মুখে আমি গভীর বেদনার ছায়া দেখলুম। বললুম : স্বাধীনতার নামে আমরা যা করেছি, ধর্মে তার কোন সমর্থন নেই। পৃথিবীর কোন ধর্ম মানুষকে অমানুষ হতে বলে না। বরং ধর্মের ধর্ম হল উলটো—অমানুষকে মানুষ হতে বলে।

স্বাতি বলল : তোমার কথাগুলো দেখছি ঠিক আগের মতো আছে।

আর সব কিছু বুঝি বদলেছে ?

বদলেছে মন। তোমার চলার আনন্দে যেন ভাঁটা পড়েছে।

সে কথা মিথ্যে নয়।

স্বাতি এইবারে অন্য যাত্রীদের দিকে চেয়ে দেখল। কেউ আমাদের দিকে মনোযোগ দেয় নি দেখে নিশ্চিন্ত হল। জিজ্ঞাসা করল : কেন এমন হল বলতে পার ?

সে প্রশ্ন আজ থাক।

কেন থাকবে ?

সে কথায় মন রক্তাক্ত হবে।

হোক রক্তাক্ত। জীবনের জোয়ার ফুরিয়ে গেলে বাঁচব কী নিয়ে গোপালদা !

এই আবেদনে আমার বুকের ভিতরটা মুচড়ে উঠল। গলার কাছে একটা বেদনা উঠল টনটন করে, আর দু চোখের পাতা সহসা ভারি হল।

স্বাতি আমার চোখের দিকে তাকিয়ে ছিল। তার চোখে আমি আমার নিজের চোখের ছায়া দেখলুম। যেন প্রতিবিম্ব দেখছি। বাহিরের রৌদ্রতপ্ত পৃথিবীর কথা আমার মনে রইল না। ভুলে গেলুম পাশের যাত্রীদের কথা। আমার মনে হল, কোন নিরালা নির্জন স্থানে আমরা অনেক দিন পরে মিলিত হয়েছি। আমাদের বলার কথার যেন শেষ নেই, আর মনের কথা বেশি বলা যায় মৌন থেকে।

অনেকক্ষণ চেয়ে থাকবার পর স্বাতি বলল : বল।

তখন আমার একটা পুরনো গল্প মনে পড়েছে। ব্যাঙ্গালোরের ওয়েটিং রূমে কতকটা এমনই আবহাওয়ার মধ্যে বসে আমি একটা আজগুবী গল্প তাকে বলেছিলুম। কার্তিকের মতো রাজপুত্র পক্ষীরাজে

চড়ে তেপান্তরের মাঠ পেরিয়ে এল। প্রাসাদের অলিন্দ থেকে রাজকন্যা তাকে দেখছিল। বলে উঠল, রাজপুত্তুরের যে খোঁড়া পা, পক্ষীরাজের পিঠ থেকে নামিয়ে দিলে সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারবে না। রাজবৈদ্য দেখে বললেন, সর্বনাশ! পায়ে যে কুষ্ঠ হয়েছে, নীচে থেকে পচছে!

আর্তস্বরে স্বাতি বলেছিল : কী বলছ এ সব ?

সে কথার উত্তর না দিয়ে আমি বলেছিলুম : উলটো ধার থেকে একটা জোয়ান আসছে চাষাড়ে গোছের, শক্ত সমর্থ সবল চেহারার পুরুষ। দুপদাপ করে নেমে পড়ল তেপান্তরের মাঠে। কী করে পার হবে! তার পক্ষীরাজ কোথায়! নাই বা থাকল! সুস্থ দেহ আছে, সাহসী মনও আছে। তেপান্তরের মাঠ কি সে পেরতে পারবে না ?

বললুম : সেই চাষাড়ে জোয়ানের গল্প মনে আছে ? যাকে দেখতে পেয়ে রাজা বলল, সাবাস, আর রাণী বলল, ওর একটা পক্ষীরাজ ঘোড়া নেই ?

আজ আবার এ গল্প কেন ?

বললুম : রাজকন্যে কী বলেছিল মনে আছে ?

বলেছিল, লোকটা বেদম বোকা।

ঠিক কথা। রাজকন্যে অমন করে চেয়ে আছে, অথচ তাকে সে দেখতেই পেল না!

রাজকন্যার যেন আর খেয়েদেয়ে কাজ নেই!

তবে তাকে বোকা বলল কেন ?

অমন পক্ষীরাজ ঘোড়াটার পাশ দিয়ে গেল, অথচ খোঁড়ার কাছ থেকে ঘোড়াটা কেড়ে নিতে পারল না!

রাজপুত্রের সেপাই শাস্ত্রী যে বল্লম হাতে পাহারা দিচ্ছিল। হাত বাড়ালেই পেট ফুটো করে দিত।

স্বাতি এবারে সকৌতুকে বলল : এখন কি তার সে ভয় গেছে ?

এখন যে রাজকন্যেই তার মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে।

আমার উত্তর শুনে স্বাতি স্তব্ধ হয়ে গেল। অনেকক্ষণ নীরব থাকবার পরে বলল: তোমার সমস্ত বুদ্ধি এই প্রসঙ্গে এসে ফুরিয়ে যায়। সত্যকে তুমি কি অস্বীকার করবে গোপালদা?

ছলছল করে উঠল তার দু চোখের দৃষ্টি।

আমি অবিলম্বে বললুম: না না।

মনে হল, কোন কড়া নেশায় আমার সমস্ত বুদ্ধি আচ্ছন্ন হয়ে গেছে।

২৬

মাঝরাতের ট্রেনে আমরা অমৃতসর ত্যাগ করলুম।

বিকেলে চা খাবার পর একবার বেরনো হয়েছিল। বড় বড় রাস্তা ধরে খানিকক্ষণ বেড়াবার পর বাজারে এসেছিলুম। মামীর হয়তো কিছু কেনবার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু মামা রাজী হন নি। বলেছিলেন: কুলু কাঙ্গড়া হয়ে তো আমরা কাশ্মীরে যাচ্ছি, কাশ্মীরেই হল এ মুলুকের শ্রেষ্ঠ বাজার। দেশে ফেরবার আগে যত পার বোঝা বাড়িও।

মামী হয়তো এ কথা মানতেন না, কিন্তু পছন্দ মতো জিনিসের নাম খুঁজে পান নি। কার্পেটের দরকার নেই, নিয়ে যাবার হাঙ্গামা বেশি। গরম কাপড় কাশ্মীরেরই বিখ্যাত। আর এখানকার শাড়ির কোন বৈশিষ্ট্য নেই। কাজেই সন্ধ্যেবেলায় আমাদের ফিরে আসতে হয়েছিল, এবং সময় কেটেছিল গল্প করে।

মামা বলেছিলেন: পাঞ্জাব সম্বন্ধে আমাদের মোটামুটি একটা ধারণা হয়ে গেল।

আমি বললুম না যে একটি মাত্র শহর দেখেই এই ধারণা হয় না। স্বাতি বলল: যা দেখেছি তার চেয়ে না দেখাই তো বেশি রয়ে গেল। অবশ্য—

অবশ্য কী?

গোপালদার এ কথা মেনে নেওয়া চলবে না।

কেন?

বই পড়ে ভ্রমণ-কাহিনী লিখছি এ কথা তো স্বীকার করা চলে না, দেখেছি বলতেই হবে।

দেখি নি বললেই বা দোষ কী?

বই কাটবে না।

মিথ্যে কথা বলারও যে বিপদ আছে। ছোটখাট ভুল লিখে ধরা পড়ে গেলেই বেইজ্জত।

মামা আশ্বাস দিয়ে বললেন : সে তুমি সামলাতে পারবে।

কী করে ?

স্বাতি কি তোমাকে অপদস্থ করবার কম চেষ্টা করছে! কিন্তু পারছে কই!

মিথ্যা বলি না বলেই পারছে না। অন্যবারে সহযাত্রীর কাছে শুনে লিখেছি, এবারে স্বাতির কাছে শুনে লিখব। বোকার মতো নিজে দেখেছি লিখে ফাঁসব কেন!

বাধা দিয়ে স্বাতি বলল : আমি তোমাকে কিছুই বলি নি।

যা বলেছ তার সাক্ষী আছে।

মামা তাঁর পাইপ ধরাতে ধরাতে বললেন : তোমাদের বিবাদ মিটলে আমি একটা কথা জিজ্ঞাসা করব।

বললুম : বলুন।

মামা বললেন : যত দূর মনে পড়ে, দুটো শিখ উৎসবে আমাদের ছুটি হয়—গুরু নানকের জন্মদিন আর গুরু গোবিন্দ সিংহের জন্মদিন। গুরু নানকের সম্বন্ধে কিছু বলেছ, কিন্তু গুরু গোবিন্দ সিংহের কথা কিছুই বল নি।

মামার প্রশ্ন শুনে স্বাতি আমার দিকে তাকিয়ে হাসল।

জিজ্ঞাসা করলুম : হাসলে যে ?

বেশ সুযোগ পেয়ে গেলে।

কিসের সুযোগ ?

পাণ্ডিত্য প্রকাশের।

স্বাতির উত্তর আমি জানতুম। স্বাতি কেন, অনেকেই এই কথা বলেন। যাঁরা আমাকে পছন্দ করেন না তাঁরা তো বলেনই, যাঁরা ভালবাসেন তাঁদেরও দু একজনের মুখে এই অভিযোগ শুনেছি। বলেন, গোপালকে সবজান্তা মনে হয়। আমার সামনেই এ কথার প্রতিবাদ

করেছেন দু একজন প্রবীণ ব্যক্তি। বলেছেন, ওটা ওর দোষ নয়, ওটা গুণ। বয়স কম বলেই দোষ মনে হচ্ছে, যেমন প্রবীণ ব্যক্তির কিছু না জানাটাই দোষের।

আমাকে নীরব থাকতে দেখে স্বাতি বলল : ঘাবড়ে গেলে নাকি ?

মামা আশ্চর্য হয়ে বললেন : সে কি !

আমি হেসে বললুম : এবারে তো আমার কাজ স্বাতির করবার কথা ছিল। আমি তারই কাছে কিছু শোনবার জন্যে অপেক্ষা করছি।

স্বাতি বলে উঠল : সর্বনাশ !

আমি জিজ্ঞাসা করলুম : ঘাবড়ে গেলে নাকি ?

স্বাতি আর্তস্বরে বলল : তোমার এ কাজ আমি করতে পারব না।

কেন ?

মামা হাসছিলেন দেখে স্বাতি কোন উত্তর দিল না।

আমি বললুম : কাজে ও সমালোচনায় তফাত্ আছে অনেক। কাজ করা কঠিন, সমালোচনা সহজ। অভিজ্ঞতা না থাকলে কাজ ভাল হয় না, কিন্তু কিছু না জেনেও সমালোচনা করা যায়। কাউকে মূর্খ বলতে বিদ্যার দরকার হয় না, কিন্তু পাণ্ডিত্য দেখাতে কিছু জ্ঞানের প্রয়োজন।

মামা বললেন : স্বাতির মন্তব্যটা গোপাল খুব সিরিয়স্‌লি নিয়েছে দেখছি।

বললুম : এটা স্বাতির একার কথা নয়।

মানে ?

এ কথা আরও অনেকে বলেছেন, লিখেছেনও কয়েকজন সমালোচক। সেই জন্যেই আমি একটা কৈফিয়ত দিচ্ছি।

এ কথার উত্তর দিল স্বাতি, বলল : কিন্তু তোমার মন তো দুর্বল নয়, তুমি কেন বিচলিত হও !

দুর্বলতা কিছু আছে বলেই বিচলিত হই, ওটুকু ঝেড়ে ফেলতে পারলেই সহজ হতে পারব।

মামা বললেন: এবারে তুমি সহজ ভাবেই গোবিন্দ সিংহের কথা বল।

স্বাতি আর কোন প্রতিবাদ করল না, মামীও শোনবার জন্য প্রস্তুত ছিলেন। তাই আর সময় নষ্ট না করে বললুম: দশম গুরু গোবিন্দ সিংহই শিখদের শেষ গুরু। তাঁর মৃত্যুর পরে বান্দা গুরু হতে চেয়েছিলেন বটে, কিন্তু ধর্মগুরু হিসেবে স্বীকৃত হন নি, তিনি শিখদের নেতা বলেই ইতিহাসে পরিচিত। পিতা তেগবাহাদুরের মৃত্যুর সময় পুত্র গোবিন্দরায়ের বয়স ছিল পনর বছর। জন্মের অধিকারে গুরুর গদি পেয়েছিলেন বটে, কিন্তু শান্তি পান নি। এক দিকে তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী রামরায়, অন্য দিকে অনেক শত্রু। গোবিন্দ-রায় যমুনার তীরে পাহাড়ের উপর আশ্রয় নিলেন।

এই স্বেচ্ছানির্বাসনে তাঁর অনেক উদ্দেশ্য সাধন হল। মৃগয়া করে তাঁর লক্ষ্য স্থির হল, লেখাপড়া করলেন, এবং তাঁর সম্প্রদায়ের উন্নতির জন্য পরিকল্পনা সম্পূর্ণ করলেন। তিনি সমস্ত হিন্দুশাস্ত্র পাঠ করেছিলেন এবং বাহান্নজন কবিকে দিয়ে রামায়ণ মহাভারত ও পুরাণগুলির অনুবাদ করিয়েছিলেন। শোনা যায় যে তিনি বিজয়ের বাসনায় দুর্গোৎসবও করেছিলেন। এই কাজের জন্য তিনি নিন্দার ভাগী হয়েছেন।

গুরু বিবাহ করেছেন দুবার, তাঁর পুত্রের সংখ্যা চার, এবং প্রায় বিশ বৎসর তিনি পাহাড়ে ও বনে একটি শক্তিমান সম্প্রদায় গঠনের চেষ্টাতেই অতিবাহিত করেছিলেন। ভারতবর্ষে তখন ঔরঙ্গজেব বাদশাহর দুর্দান্ত শাসন। গোবিন্দরায়ের সঙ্গে পাহাড়ী রাজাদের যে বিবাদ হচ্ছিল তার উপর বাদশাহ তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রেখেছিলেন।

তারপর খালসার গল্প।

মামা বললেন: খালসা কথাটা যেন শোনা শোনা মনে হচ্ছে!

বললুম : খুব প্রচলিত শব্দ। ভারতবর্ষের যেখানে শিখ আছে, সেখানেই একটা খালসা হোটেল বা রেস্টুরেণ্ট আছে।

খালসা মানে কী ?

পবিত্র। ১৬৯৯ খ্রীষ্টাব্দের ১লা বৈশাখ গুরু গোবিন্দ সিংহ এই কথাটি একটি বিশেষ অর্থে ব্যবহার করেন। তাঁর পাঁচজন বিশ্বস্ত অনুচরকে তিনি সেদিন খালসা নামে অভিহিত করেন।

তারপর আমি সেই গল্প শোনালুম।

১লা বৈশাখ সমস্ত শিখকে আনন্দপুরে একত্র হবার জন্য গুরু নিমন্ত্রণ করেছিলেন। দূর-দূরান্ত থেকে ষাট হাজার শিখ এই পাহাড়ে এসে উপস্থিত হল। গুরু তাঁর একজন অতি বিশ্বাসী অনুচরকে কিছু নির্দেশ দিলেন। অন্ধকার রাতে সে একটি জায়গা তাঁবু দিয়ে ঘিরে রাখল। প্রভাতে গুরু এক জনসভা আহ্বান করলেন এবং অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে সভায় এলেন।

স্বাতি হঠাৎ বলে উঠল : বুঝতে পেরেছি।

কী বুঝেছ ?

গুরুর কোন বদ মতলব ছিল।

বদ মতলব নয়, মতলব খুবই ভাল। গুরু তাঁর অনুচরদের বিশ্বস্ততার পরীক্ষা নিতে চেয়েছিলেন। প্রথমেই তাদের দিকে তাকিয়ে হেঁকে বললেন, তোমাদের মধ্যে এমন কে আছ যে আমার জন্যে প্রাণ দিতে পার ? সবাই স্তম্ভিত। গুরু আবার বললেন, কে প্রাণ দিতে পার বল। ভয়ে সবাই বিবর্ণ হল, সবাই রইল নিরুত্তর। গুরু আরও জোরে চেঁচিয়ে বললেন, তোমাদের মধ্যে কি কেউ যথার্থ শিখ নেই যে তার মাথা আমাকে উপহার দিয়ে তার বিশ্বাসের প্রমাণ দিতে পারে ? আছে একজন, লাহোরের শিখ দয়া সিংহ। সে উঠে দাঁড়িয়ে উত্তর দিল, আমি আমার মাথা দেব। গুরু বললেন, সাবাস, এস আমার সঙ্গে। বলে সেই তাঁবু দিয়ে ঘেরা জায়গার মধ্যে নিয়ে গেলেন, এবং খানিকক্ষণ

পরেই বেরিয়ে এলেন খোলা তলোয়ার হাতে, সেই তলোয়ার থেকে তাজা রক্ত ঝরছে টপটপ করে। সবাই চমকে উঠল, আর্তনাদ করে উঠল কেউ কেউ। কিন্তু গুরু শান্ত হলেন না। বললেন, তোমাদের মধ্যে আর কেউ আছে? কারও মুখে উত্তর নেই। আর কেউ দিতে পার না তোমাদের মাথা? সভায় গুঞ্জন উঠল, এ কী করছেন গুরু! গুরু ভর্ৎসনা করলেন, ধিক তোমাদের। একটা মাথা কেউ দিতে পার না! পারি, বলে এগিয়ে এল দিল্লীর ধরমদাস। গুরুর চোখ জ্বলজ্বল করে উঠল। তিনি তাকে তাঁবুর ভিতর নিয়ে গেলেন।

স্বাতি শিউরে উঠল, বলল: ওকেও কাটলেন?

হেসে বললুম: একটি দুটি নয়, গুরুর পাঁচটি মাথা চাই। পাঁচটি মাথা দিয়ে তিনি খালসা ধর্ম প্রবর্তন করবেন।

মামী বললেন: সর্বনাশ!

আর মামা বললেন: তারপর?

তারপর গুরু আবার তাঁবুর ভিতর থেকে বেরিয়ে এলেন। আবার তাঁর তলোয়ার থেকে তাজা রক্ত ঝরছে। গুরুর অগ্নি-মূর্তি দেখে এবারে সবাই ভয় পেল, কেউ পালাল, আর কেউ গুরুর মায়ের কাছে গেল নালিশ জানাতে। তলোয়ার তুলে গুরু বললেন, আর কে আছ? আরও! মাথা নিচু করে সবাই বসে রইল। একবার, দুবার, তিনবার ডাকলেন গুরু। এবারেও এগিয়ে এল একজন। ক্রমে ক্রমে বিদারের সাহেবচাঁদ এল, আর জগন্নাথের হিম্মৎ সিংহ।

স্বাতি বলে উঠল: নিশ্চয়ই গুরুর মাথা খারাপ হয়েছিল।

সেদিনও সবাই এই সন্দেহ করেছিল।

তা না হলে সুস্থ মাথায় কেউ পাঁচ পাঁচটা লোকের মাথা কাটতে পারে!

ঠিক কথা। কিন্তু গুরুর মাথা ঠিকই ছিল।

নিশ্চয়ই না।

সমস্ত গল্পটা শুনলেই বুঝতে পারবে যে গুরুর মাথা তোমার আমার চেয়ে ঢের ভাল ছিল। একেবারে সুস্থ মাথায় এই কাজ তিনি করেছিলেন।

এইবারে মামা জিজ্ঞাসা করলেন : কী রকম ?

বললুম : ঐ তাঁবুর ভিতর গুরু পাঁচটি ছাগল বেঁধে রেখেছিলেন। এক একবার এক একটি লোক সেখানে নিয়ে গিয়ে এক একটি ছাগল কেটে বেরিয়ে আসছিলেন। পাঁচটি ছাগল কাটবার পরে সেই পাঁচটি লোককে সাজিয়ে গুছিয়ে সবার সামনে বার করলেন। তারপর এদের খালসা ধর্মে দীক্ষা দিলেন।

মামী বললেন : ওমা !

স্বাতি বলল : বেশ বুদ্ধি তো !

মামা বললেন : গল্পটা যেন শোনা শোনা মনে হচ্ছে !

স্বাতি বলল : গোপালদার বানানো গল্প।

কেন ?

বানানো না হলে কি অত নামধাম মনে থাকে।

বললুম : মনে থাকবে না কেন। লাহোরের দয়া, দিল্লীর ধর্ম আর জগন্নাথের হিম্মৎ। যেখানে যেটা নেই, সেইখানে সেই সিংহ।

মামা প্রবল উত্তমে হেসে উঠলেন, তারপর বললেন : ঠিকই বলেছ, দিল্লীতে ধর্মেরই সব চেয়ে বেশি অভাব।

এর পরে গুরু গোবিন্দ সিংহের জীবনী সংক্ষেপে বলতে হয়। গুরুদের চরণামৃত খাবার প্রথা তিনি তুলে দিলেন। চরণামৃতকে এরা চরণপাহুল বলে। তিনি গুরুর গদিও তুলে দিলেন। বললেন, তাঁর মৃত্যুর পরে যেন সবাই আদিগ্রন্থকেই গুরু বলে মানে। জাতি-ভেদ তুলে দেবার জন্য এক পাত্রে আহারের নির্দেশ দিলেন। সমস্ত শিখ জাতি যেন একটি ভ্রাতৃসঙ্ঘে পরিণত হয়। আর সিংহের মতো

বিক্রমশালী বোঝাবার জন্যে তিনি সিংহ উপাধি দিলেন। নিজের নামও গোবিন্দরায় থেকে গোবিন্দ সিংহ হল। পাঁচ তাঁর প্রিয় সংখ্যা। শিখদের তিনি পাঁচটি জিনিস ধারণের আদেশ দিলেন— কেশ কঙ্গা কৃপাণ কচ্ছ এবং কারা।

স্বাতি বলল : বুঝলাম না।

বললুম : মাথার চুল কাটবে না, চুলে একখানা চিরুনি রাখবে। কোমরে কৃপাণ, পরনে কচ্ছ মানে জাঙ্গিয়া, আর হাতে লোহার বালা।

মামা বললেন : এ সবের সার্থকতা কী ?

আমি সত্য কথা স্বীকার করলুম, বললুম : জানি নে।

স্বাতি ভারি খুশী হল, বলল : এতক্ষণে গোপালদা আটকেছে।

বললুম : শিখদের তামাক খাওয়া বারণ কেন জানি।

স্বাতি বলল : আমিও জানি।

কেন ?

দাড়িতে আগুন লাগবে।

মামা হাসতে গিয়েও থেমে গেলেন। মামী বলে উঠলেন : ধর্ম নিয়ে তামাশা করতে নেই।

তখনই আমি পুরাতন প্রসঙ্গে ফিরে গেলুম। বললুম : গুরু যে তাঁর শিখ অনুচরদের শক্তির প্রেরণা যোগাচ্ছিলেন, দিল্লীর বাদশাহ ঔরঙ্গজেব তা সুনজরে দেখছিলেন না। শেষ পর্যন্ত তিনি আনন্দপুরের দুর্গ অবরোধ করলেন। গুরু গোবিন্দ সিংহ অনেক দিন যুদ্ধ করে-ছিলেন, তারপর আত্মরক্ষার জন্য দক্ষিণ দিকে পালিয়ে গেলেন। যুদ্ধে তাঁর দুই পুত্র নিহত হয়েছিল, আর দুটি পুত্রকে নিয়ে তাঁর মা সিরহিন্দে এক ব্রাহ্মণের গৃহে আশ্রয় নিয়েছিলেন। গুরু গিয়েছিলেন কিরাতপুরে।

গুরুর এই দুটি শিশুপুত্রের মৃত্যুর কাহিনী বড় মর্মান্তিক। আশ্রয়দাতা ব্রাহ্মণ তাঁদের ধনরত্ন কেড়ে নিয়ে সিরহিন্দের মুসলমান শাসনকর্তাকে সংবাদ দিয়েছিলেন। তিনি সেই শিশু দুটিকে ধরে

নিয়ে গিয়ে ধর্মান্তরিত করবার যথাসাধ্য চেষ্টা করে ব্যর্থ হলেন। তারপর তাদের জীবন্ত সমাধি দিলেন।

নৃশংস !

এ তো অষ্টাদশ শতাব্দীর গোড়ার দিকের ঘটনা। এর পরেও এ দেশে এর চেয়ে বেশি নৃশংস ঘটনার বারবার পুনরাবৃত্তি ঘটেছে। ঔরঙ্গজেবের মৃত্যু হয়েছিল ১৭০৭ খ্রীষ্টাব্দে, আর গুরু গোবিন্দ সিংহ তার পরের বছর এক পাঠান আততায়ীর হাতে নিহত হন। ঔরঙ্গজেবের পরে বাহাদুর শাহ বাদশাহ হয়ে গুরুর সাহায্য প্রার্থনা করেছিলেন এবং বাদশাহর কাছে ক্ষমতা লাভ করে দক্ষিণ অভিযানে অগ্রসর হচ্ছিলেন। অতীতে গুরু হরগোবিন্দ গুলখাঁ নামে এক পাঠানের পিতামহকে হত্যা করেছিলেন বলে সেই গুলখাঁ গুরু গোবিন্দ সিংহকে হত্যা করে তার প্রতিহিংসা চরিতার্থ করল।

মামা বললেন : এ যে দেখছি কথামালার গল্প। তোর ঠাকুর্দা ঝর্ণার জল ঘোলা করেছিল।

বললুম : এর চেয়েও বেশি প্রতিশোধ নিয়েছেন বান্দা বলে গুরু গোবিন্দ সিংহের এক বিশ্বস্ত অনুচর। ইতিহাসে তাঁর নাম অক্ষয় হয়ে আছে।

কোন প্রশ্ন না করে মামা আমার মুখের দিকে তাকালেন।

বললুম : বান্দা নিষ্ঠুর ভাবে মুসলমান ধ্বংসে মেতে উঠেছিল। অনেকে বলে যে একটি জনসভায় বক্তৃতা দেবার সময় একজন মুসলমান গুরুকে ছোরা মারে। তিনি নাকি ইসলাম ধর্মে আঘাত দিয়ে কোন কথা বলেছিলেন। তার উপর গুরুর দুই শিশুপুত্রকে হত্যার ব্যাপারটা বান্দা সহ্য করতে পারে নি। সিরহিন্দ লুঠ করে মুসলমানদের উপর অকথ্য অত্যাচার করেছিল। বাহাদুর শাহ তাকে দমন করবার চেষ্টা করেছিলেন। যুদ্ধে শিখদের পরাজিত করেও বান্দাকে বন্দী করতে পারেন নি।

বাহাতুর শাহর মৃত্যুর পরে বান্ধা পাঞ্জাবের পূর্বাংশ যথেচ্ছ ভাবে লুণ্ঠন করছিল। এই সময় মোগলরা তাকে বন্দী করে নিষ্ঠুর ভাবে হত্যা করে। বান্ধার অনুচরদেরও অশেষ যন্ত্রণা দিয়ে হত্যা করা হয়েছিল। সেও এক অদ্ভুত কাহিনী।

আমি ভেবেছিলুম, মামা এইবারে শিখ জাতির ইতিহাস সম্বন্ধে কিছু জানতে চাইবেন। গুরু নানক থেকে গুরু গোবিন্দ সিংহের কথা তুশো বছরেরও বেশি। বান্ধার কাহিনী মাত্র দশ বৎসরের। তারপর প্রায় আশি বৎসর পরে রণজিৎ সিংহের অভ্যুদয়। এই সময়ের মধ্যে স্মরণীয় কোন নেতার অবির্ভাব হয় নি। অন্তত আমার কোন নাম জানা নেই। তাই আমি রণজিৎ সিংহের কথা বলবার জন্যই প্রস্তুত হচ্ছিলুম।

নিরক্ষর রণজিৎ সিংহের আমলেই শিখেরা সবচেয়ে শক্তিশালী হয়ে উঠেছিল। তাঁর পিতৃবিয়োগ হয়েছিল বারো বৎসর বয়সে, তারপরেই তিনি লাহোর ও অমৃতসর অধিকার করেন। কাবুলের অধিপতি রণজিৎকে রাজা উপাধি দিয়েছিলেন। শতদ্রুর পশ্চিমে সমগ্র পাঞ্জাব তাঁর অধিকারভুক্ত হয়। তারপর পূর্বে লুধিয়ানা অধিকার করতেই এ অঞ্চলের শিখেরা ব্রিটিশের শরণ নেয়। তার ফলে ইংরেজ রণজিৎ সিংহের সঙ্গে মিত্রতা করল, আর পূর্ব পাঞ্জাব হল ইংরেজের পদানত।

রণজিৎ সিংহের শিক্ষায় তাঁর খালসা সৈন্য এমন পরাক্রান্ত হয়েছিল যে তাঁর জীবিতকালে কেউ তাঁর সঙ্গে শত্রুতাচরণে সাহসী হয় নি। শতদ্রু থেকে পেশোয়ার কাশ্মীর ও কাঙ্গড়ায় তাঁর রাজত্ব ছিল। অরাজকতা আরম্ভ হল তাঁর মৃত্যুর পরে। শেষ পর্যন্ত তাঁর খালসা সৈন্য তাঁর পাঁচ বৎসরের শিশুপুত্র দলীপ সিংহকে সিংহাসনে বসাল, আর রাজ্য শাসনের ভার নিলেন রানী ঝিন্দন। কিন্তু তিনি খালসা সৈন্যকে শাসন করতে পারলেন না। উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি যখন এই সৈন্য ব্রিটিশ রাজ্য আক্রমণ করল, তখনই বাধল

শিখ যুদ্ধ। পরপর দুবার যুদ্ধ করে তাদের স্বাধীন অস্তিত্ব গেল শেষ হয়ে। এই যুদ্ধের কথা আমরা স্কুলের বইএ পড়েছি।

কিন্তু মামা আর ইতিহাসের আলোচনা করেন নি।

মামী বলেছিলেন : রাত কত হল?

ঘড়ির দিকে তাকিয়ে মামা বলেছিলেন : তা ক্ষিধে পেয়ে থাকলে খাওয়া চলতে পারে।

স্বাতি বলেছিল : আজ মোরগ মোসল্লমের সঙ্গে তন্দুরের রুটি খাব।

আমি বলেছিলুম : কিংবা দুম্বার মাংস। ঘি আর মসলার ঝোলের ভেতর কবজি ডুবিয়ে খাওয়া যাবে।

মামা বলেছিলেন : তা হলে আবার আমাদের বাজারে বেরতে হবে।

স্বাতি বলেছিল : হাতে তো অপর্যাপ্ত সময়।

সত্যিই আমাদের হাতে অপর্যাপ্ত সময় ছিল, এবং খেয়েদেয়ে অনেক সময় নষ্ট করেও যখন গাড়িতে এসে উঠলুম, তখনও বেশি যাত্রী আসে নি। রাত তিনটেয় গাড়ি ছাড়বে। কাজেই আমরা দরজা বন্ধ করে ঘুমিয়ে পড়বার চেষ্টা করেছিলুম।

আমি বললুম ঃ আপনারা মুখ হাত ধুয়ে নিন, আমি একটু খোঁজ খবর নিয়ে আসছি।

স্বাতি বলল ঃ কোথায় যাবে ?

বললুম ঃ এত সকালে টুরিস্ট অফিসে গিয়ে লাভ নেই, হয়তো বন্ধ দেখব। তার চেয়ে বাস-স্ট্যাণ্ডে গেলেই সব খবর জানতে পাব।

মামা বললেন ঃ চা খেয়ে বেরবে তো ?

তার আগেই আমি ঘুরে আসছি।

কিন্তু ঘর থেকে বেরিয়ে আমি আশ্চর্য হলুম। স্বাতিও আমার সঙ্গে বেরিয়ে এসেছে। বলল ঃ দাঁড়ালে কেন ? চল।

হেসে বললুম ঃ চল।

স্বাতি যেন রাগ করল, বলল ঃ এতে হাসবার কী আছে !

তাতে রাগ করবারই বা কী আছে !

এবারে স্বাতিও হাসল।

স্টেশনের বাহিরেই বাসের মেলা দেখলুম। নানা জায়গা থেকে নানা জায়গার বাস ছাড়ছে। শ্রীনগরের বাসই ছাড়ছে তিন জায়গা থেকে, তিনটি প্রতিষ্ঠানের বাস। তারপর ডালহৌসির বাস, কাঙ্গড়া বৈজনাথের বাস, কুলু ও মানালির বাস। অমৃতসর ও জলন্ধরেও বাস যাচ্ছে। অমৃতসর এখান থেকে সাতষট্টি মাইল পথ।

জিজ্ঞাসা করে জানলুম যে কুলু ও মানালির বাস সকালবেলায় ছেড়ে সন্ধ্যেবেলায় পৌঁছে দেয়। অন্য সব জায়গার জন্যে সারা দিনই বাস পাওয়া যায়। কুলুর বাস তখন ছাড়ছিল, মানালির বাস বোধ হয় চলে গেছে। কাজেই আমরা নিশ্চিন্ত হলুম যে তাড়াহুড়ো করবার আর দরকার নেই। ধীরে সুস্থে স্নান খাওয়া সেরে কাছের কোন জায়গায় যাওয়া যাবে।

স্বাতি জিজ্ঞাসা করল ঃ কোথায় যাবে তাহলে ?

বললুম ঃ পাঠানকোটে তো কিছু দেখবার নেই, টুরিস্ট অফিসারের সঙ্গে দেখা করেই না হয় সে কথা স্থির করব।

২৭

প্রভাতে আমরা পাঠানকোটে পৌঁছলুম।

পাঠানকোট বড় লাইনের শেষ স্টেশন। অমৃতসর থেকে দিল্লী থেকে কলকাতা থেকেও এখানে ট্রেন আসে। কেউ জম্মুর পথে কাশ্মীরে যাবে, কেউ ডালহৌসি চাম্বা, কেউ বা কাঙ্গড়া কুলু উপত্যকা। পাঠানকোট থেকে ন্যারো গেজ ট্রেন এঁকেবেঁকে কাঙ্গড়া উপত্যকার শেষ প্রান্ত যোগীন্দ্রনগর পর্যন্ত যায়। পথে কাঙ্গড়া শহর জ্বালামুখী রোড পালমপুর ও বৈজনাথ। কুলু উপত্যকায় ট্রেন নেই। যোগীন্দ্রনগরের পর বাসে চেপে মণ্ডিরাজ্য হয়ে কুলু যেতে হয়। বাসের পথ শেষ হয়েছে মানালিতে।

কিন্তু প্ল্যাটফর্মে নেমে এ সব কথা আমরা ভাবি নি। প্রথমেই খোঁজ নিলুম রিটায়ারিং রুমের। এয়ারকণ্ডিসণ্ড রিটায়ারিং রুমও এখানে আছে। দিন ভাড়া পনর টাকা। মামা ভারী খুশী হয়েছিলেন, বললেন: দু একটা দিন এখানেই থাকা যাক।

মামী বললেন: কেন?

এমন সুন্দর ব্যবস্থা!

পাহাড়ে বেড়াতে এসে কেউ ঠাণ্ডা ঘরে থাকে!

মামা মেনে নিলেন: সেও ঠিক কথা।

শেষ পর্যন্ত আমরা ওয়েটিং রুমেই মালপত্র রাখলুম। মামা আমার দিকে চেয়ে বললেন: এর পরে কী করতে হবে তুমিই ঠিক কর।

স্বাতি বলল: ঠিক তো করাই আছে। কাশ্মীরে আমরা প্রথমে যাব না, যাব পরে। প্রথমে আমরা কুলু কাঙ্গড়া দেখব।

জিজ্ঞাসা করলুম: ডালহৌসি চাম্বা?

স্বাতি বিপদ এড়াতে চাইল, বলল: সে আমি জানি নে।

মামা আমার মুখের দিকে তাকালেন।

কেন, আমরা নিজেরা কি কিছু স্থির করতে পারব না ?

পারব বৈকি।

যে বাড়িটির সামনে দাঁড়িয়ে আমরা কথা বলছিলুম, সেটি দেখলুম একটি বিরাট রেস্টরেণ্ট। রেল কর্তৃপক্ষের ব্যবস্থা। স্বাতিও এটা লক্ষ্য করেছিল, বলল : খাওয়াদাওয়ার অসুবিধে তাহলে হবে না।

বললুম : ডালহৌসির বাস ছাড়ে চার ঘণ্টা অন্তর। বারোটার পরে একখানা বাস ছাড়বে। খেয়েদেয়ে আজ ডালহৌসিই যাওয়া যাক। পঞ্চাশ মাইল পথ চার ঘণ্টাতেই পৌঁছে যাব।

এ সংবাদ আমরা বাস-স্ট্যাণ্ডেই পেয়েছিলুম। কিন্তু স্বাতি খুব আগ্রহ প্রকাশ করল না।

বললুম : পচ্ছন্দ হল না বুঝি ?

স্বাতি বলল : ডালহৌসির উচ্চতা আমি জানি। নৈনিতাল মসুরি দার্জিলিঙেরই মতো। খেয়েদেয়ে বাসে উঠলেই মাথা ঘুরে বমি হবে।

তবে ?

কাঙ্গড়ায় চল, না হয় জ্বালামুখী। বেশি উঁচু নয়, দূরও নয় বেশি। একটা মন্দির দেখাতে পারলে মা-ও খুশী হবেন।

তার কথা শুনে আমি হাসলুম। কিন্তু স্বাতি রাগ করল না। বলল : তোমাকে মানুষ করতে আমার সময় লাগবে।

তা লাগুক, ধৈর্য হারিয়ো না।

ওয়েটিং রূমে ফিরবার আগে আমরা আরও কিছু সংবাদ সংগ্রহ করলুম। পাঠানকোটে থাকবার জায়গার অভাব নেই। বাজারে গোটা তিনেক হোটেল আছে, ডাকবাংলো আছে। একটা টুরিস্ট বাংলোও আছে। শ্রীনগর থেকে ফিরে যাত্রীদের একটা রাত কাটাতে হয়।

স্বাতি বলল : আর নয়, বাবা মা বোধহয় তৈরি হয়ে নিয়েছেন। চা খেয়ে অন্য কাজ।

রেলের রেস্টরেণ্টেই আমরা চা খেলুম। ব্যবস্থা মন্দ নয়, প্রয়োজনীয় সব কিছুই পাওয়া যায়। স্টেশনের ভিতরে শুধু চা বিস্কুটের দোকান, আহারের জন্য এখানে আসতে হয়।

চা খেতে খেতে মামা জিজ্ঞাসা করলেন: প্রোগ্রাম কিছু তৈরি হল ?

স্বাতি তৎপর ভাবে উত্তর দিল: টুরিস্ট অফিসারের সঙ্গে দেখা করে ফাইনাল হবে।

আমি বললুম: প্রথমে আমরা জ্বালামুখী যাচ্ছি। পীঠস্থানে পূজো দিয়ে আমরা অন্যত্র যাব।

মামী উৎকর্ণ হয়েছিলেন। মামা বললেন: ভারি ভক্তি যে !

বলে স্বাতির দিকে তাকালেন।

আমার মনে হল, তিনি কিছু সন্দেহ করেছেন। দৃষ্টি দিয়ে সেই সন্দেহ দুজনের দিকেই সঞ্চারিত করে দিলেন।

কুলু ও কাঙ্গড়া উপত্যকার একখানা গাইড বই স্বাতির হাতে ছিল। আমি সেইখানা চেয়ে নিয়ে তারই পাতায় মন দেবার চেষ্টা করলুম।

স্বাতি মামার কথার উত্তর দিল, বলল: ভূতের মুখে রাম নাম শুনে ভয় হয় !

মামী বললেন: এখানে বসে থাকবার জন্যে তো আসা হয় নি !

মামা এবারে অন্য কথা বললেন, জিজ্ঞাসা করলেন: কী দেখছ ?

আমি বইএর শেষ পাতায় মানচিত্রটি খুলে দেখছিলুম। বললুম: এ অঞ্চলের মানচিত্র।

তা চুপ করে দেখছ কেন ? একটু জোরে জোরে দেখ।

মানুষ নীরবেই দেখে। কিন্তু মামার কথা আমি বুঝতে পারলুম। বললুম: আজ একটা অনেক দিনের ভুল ভাঙল।

কী রকম ?

বললুম : এতদিন জানতুম যে কুলু ও কাঙড়া উপত্যকা হিমাচল প্রদেশে।

তা নয়?

না। এ দুই উপত্যকাই পাঞ্জাবে। চাম্বা উপত্যকা দেখছি হিমাচল প্রদেশে, শহর ডালহৌসি।

স্বাতি বলল : তবে তোমার এই ভ্রমণকে হিমাচল ভ্রমণ বললে নাম সার্থক হবে না।

বললুম : তা হবে। হিমাচল তো হিমালয়েরই নাম। এবারে আমরা হিমালয় দেখতে বেরিয়েছি। পাঞ্জাব তো ট্রেন থেকে দেখলুম।

কেন, অমৃতসর দেখি নি?

তা দেখেছি। কিন্তু হিমালয় দেখব মনপ্রাণ ভরে। এর আগে তো কখনও হিমালয় দেখি নি।

স্বাতি বলল : কেন, মসুরি পাহাড়ে তো উঠেছিলে বলে শুনেছি।

বললুম না যে সেখানে হিমালয় দেখতে উঠি নি, কিছু দেখি নিও। উঠেছিলুম মানুষ খুঁজতে, আর সেই লোভেই এসেছিলুম দিল্লীতে। এখন আর অন্য কোন লোভ নেই। তাই এখন হিমালয় দেখব। বললুম : কিছু দেখতে আর পেলুম কোথায়! তোমাদের পেয়াদা যে ধরে আনল!

মামা হাসছিলেন, বললেন : পেয়াদা তো এবারে সঙ্গেই আছে, আর তোমার ভয় নেই। হিমাচলের কথাটা একটু বুঝিয়ে বল।

বললুম : তাহলে খবরের কাগজের কথা বলতে হয়।

তাই বল।

পরাধীন ভারতে বাঙলার মতো পাঞ্জাবও একটি বিরাট প্রদেশ ছিল। ১৯৪৭-এ দেশ যখন স্বাধীন হল, তখন এই দুটি প্রদেশই দু ভাগ হয়ে গেল। বড় অংশটা গেল পাকিস্তানে, যা রইল তার মধ্যেও ভাগাভাগি। দেশীয় রাজ্যগুলিকে কিছুদিন আলাদা রাখতে হয়েছিল। বিভক্ত পাঞ্জাবে হয়েছিল তিনটি প্রদেশ—পাঞ্জাব পেপসু

ও হিমাচল প্রদেশ। পেপস্থ মানে পাতিয়ালা ও ঈস্ট পাঞ্জাব স্টেট্স ইউনিয়ন। বর্তমানে এই অংশটি পাঞ্জাবের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেছে।

হিমাচল প্রদেশ গঠিত হয়েছিল ভারত স্বাধীন হবার এক বৎসর পরে। একুশটি পাহাড়ী দেশীয় রাজ্যের এই প্রদেশটি কেন্দ্রীয় সরকার এখনও পরিচালনা করছেন। এর রাজধানী সিমলায়। সিমলা জেলাটি কিন্তু পাঞ্জাব প্রদেশের অন্তর্গত।

স্বাতি জিজ্ঞাসা করল: সিমলা কি তাহলে পাঞ্জাবের শহর?

মানচিত্রে তা মনে হয় না। সিমলা পাঞ্জাবের শহর হলে পাঞ্জাবের রাজধানী চণ্ডীগড়ে না গিয়ে হিমাচলের রাজধানী যেত ডালহৌসি কিংবা মণ্ডিতে

তবে সিমলা পাঞ্জাবের জেলা কী করে হল?

সে কথা কোন ভৌগোলিককে জিজ্ঞাসা ক'রো, কিংবা এ দেশের কোন সরকারী কর্মচারীকে।

মামা বললেন: হিমাচল প্রদেশটি গড়বার কী দরকার ছিল জানি নে।

রাষ্ট্রীয় প্রয়োজনের কথা আমিও জানি নে। তবে যে কারণে বাঙলায় ত্রিপুরা ও আসামে মণিপুর রাজ্যকে রক্ষা করা হচ্ছে, বোধহয় সেই কারণেই হিমাচল প্রদেশও বেঁচে আছে।

চিন্তিত ভাবে মামা বললেন: কী কারণ বল তো?

আমি স্বীকার করলুম: কোন দিন ভেবে দেখি নি।

স্বাতি তখনই মন্তব্য করল: আশ্চর্য কথা!

আশ্চর্য কেন?

তুমি ভেবে দেখ নি এমন কথাও তাহলে আছে!

এ তার পুরনো কৌতুকে। আমি কোন উত্তর দিলুম না। বললুম: কাঙ্গড়াও পাঞ্জাবের একটি জেলা, তার সদর হল ধর্মশালায়।

মামী বললেন: ধর্মশালা কি শহরের নাম?

বললুম: হ্যাঁ। কাঙ্গড়ায় কনেকগুলো দ্রষ্টব্য স্থান আছে।

মানচিত্র দেখে বললুম : ধরমশালা কাঙ্গড়া জ্বালামুখী, পালমপুর বৈজনাথ ও যোগীন্দ্রনগর। পাঠানকোট থেকে সোজা রাস্তা পূর্বে গেছে। আটচল্লিশ মাইল দূরে গিয়ে দু দিকে দুটো রাস্তা বেরিয়েছে—ধর্মশালা আট মাইল উত্তরে, আর তিন মাইল দক্ষিণে কাঙ্গড়া। কাঙ্গড়া থেকে একুশ মাইল দক্ষিণে জ্বালামুখী। এই পথই দক্ষিণে হোসিয়ারপুর হয়ে জলন্ধরে গেছে। পালমপুর হল প্রধান পথের উপর পাঠানকোট থেকে বাহাত্তর মাইল দূরে, সেখান থেকে বৈজনাথ এগার মাইল, আর বৈজনাথ থেকে যোগীন্দ্রনগর পনর মাইল। কাঙ্গড়া উপত্যকা এইখানেই শেষ হয়েছে। রেলপথেরও শেষ এইখানে।

মামা প্রশ্ন করলেন : এর পরেই বুঝি কুলু?

বললুম : না। কুলু যেতে হয় মণ্ডি হয়ে। মণ্ডি হিমাচল প্রদেশের একটি রাজ্য। যোগীন্দ্রনগর থেকে খানিকটা উপরে উঠে পথ ধীরে ধীরে মণ্ডিতে নেমে এসেছে পঁয়ত্রিশ মাইল দক্ষিণে। কুলু যেতে হলে অনেকে নাকি এইখানেই রাত কাটায়। মণ্ডি থেকে কুলু তেতাল্লিশ মাইল উত্তরে, আর কুলু থেকে মানালি তেইশ মাইল, সেও উত্তরে।

স্বাতি জিজ্ঞাসা করল : এত সব মাইলের হিসেব কোথায় পাচ্ছ?

হেসে বললুম : এই বইএই। কোন্ জায়গার উচ্চতা কত, আর কোন জায়গায় থাকবার জায়গা আছে আর কোথায় নেই, তাও এখানে আছে।

স্বাতিও হেসে বলল : তাহলে দেখছি তোমার আর যাত্রী ধরবার দরকার হবে না।

বললুম : যাত্রী ধরতে পারলে কিছু মানুষের কথা জেনে নেওয়া যাবে।

আর?

আর এমন কোন অন্তরঙ্গ কথা যা সরকারী বইএ নেই।

মামী জিজ্ঞাসা করলেন ঃ তোমরা কি আর এক পেয়ালা করে চা খাবে ?

মামা আমার দিকে তাকালেন।

আমি বললুম ঃ আর নয়। বরং আমরা দুপুরের খাবারটা আজ তাড়াতাড়ি খেয়ে নিই।

কেন ?

জ্বালামুখী এখান থেকে অনেকটা দূর, সন্ধ্যের আগে পৌঁছতে পারলেই ভাল।

মামা আর এক মুহূর্ত দেরি করলেন না, বললেন ঃ অন্ধকারের আগে আমাদের পৌঁছতেই হবে। পাহাড়ী রাস্তায় ছেলেখেলা উচিত নয়।

স্বাতি আমার মুখের দিকে তাকিয়ে হাসল।

ঠিক এগারটার পরেই আমরা কাঙ্গড়া যাত্রা করলুম। আমি আশা করি নি যে মামা এমন তাড়াহুড়ো করবেন। চা খেয়ে বেরিয়েই বলেছিলেন : আর দেরি নয় গোপাল, তুমি বাসের সময়টা জেনে এস। আমরা তৈরি হয়ে নিচ্ছি।

সেই ভাল।

বলে আমি এগিয়ে যাচ্ছিলুম। মামা আবার ডেকে বললেন : বাসের দেরি দেখলে একখানা ট্যাক্সির ব্যবস্থা করো।

মামী বললেন : ট্যাক্সির আবার কী দরকার! শুধু শুধু পয়সা নষ্ট।

এখন তাই মনে হচ্ছে। গরিবের কথা বাসী হলেই ভাল লাগে।

বলে মামা স্টেশনের দিকে এগিয়ে গেলেন। স্বাতি ও মামী গেলেন তাঁর সঙ্গে।

টুরিস্ট অফিসে কাউকে পেলুম না, বাস-স্ট্যাণ্ডেই সব খবর পেয়ে গেলুম। এগারটায় বৈজনাথের বাস ছাড়বে, সেই বাস কাঙ্গড়া হয়ে যায়। সেখান থেকে জ্বালামুখীর বাস পাওয়া যাবে। ধরমশালা থেকে জ্বালামুখীর বাস কাঙ্গড়া হয়ে যাতায়াত করে। দুপুরে বাস বদল করে বিকেলেই আমরা জ্বালামুখীতে পৌঁছে যাব। পাঁচখানা সীটের ব্যবস্থা করে আমি স্টেশনে ফিরে এলুম।

মামা বাসে উঠে খুশী হলেন। বললেন : ঠিক এই জন্যেই তোমায় পাঠিয়েছিলুম।

স্বাতি বলল : রামখেলাওন গেলেও এই ব্যবস্থাই করে আসত।

বললুম : তুমি গেলে ব্যবস্থা আরও ভাল হত।

কী রকম?

তুমি এই বৈজনাথের বাসে উঠতে না, উঠতে ধর্মশালার বাসে।

কেন?

সোজা ধর্মশালায় পৌঁছে যেতে। বিকেলবেলায় সব দেখেশুনে রাত কাটাতে টুরিস্ট রেস্টহাউসে। তারপর সকালবেলায় জ্বালামুখীর বাসে চাপতে। সেখান থেকে ফেরার পথে কাঙ্গড়া দেখে বৈজনাথ।

তাতে কী সুবিধা হত?

বারে বারে বাস বদল করতে হত না। বসবার জায়গা নিয়ে মারামারি এড়ানো যেত।

মামা বললেন: তবে সেই ব্যবস্থাই কেন করলে না?

এ কথা আমি আগে জানতুম না। খেয়েদেয়ে স্টেশন থেকে বেরবার সময় কিছু অপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্র স্টেশনের ক্লোক রুমে জমা করে দিয়েছিলুম। তারপর সবাইকে বাসে বসিয়ে দিয়ে আর একবার গিয়েছিলুম টুরিস্ট অফিসে। পাঞ্জাব সরকারের অফিস। দেখা হয়েছিল টুরিস্ট অফিসারের সঙ্গে। তিনিই এই পরামর্শ দিয়েছিলেন, আর দিয়েছিলেন কিছু কাগজপত্র। বাসেরও একটা টাইম-টেবল আছে, কিন্তু তা বিক্রি হয় না। জিজ্ঞাসা করে সময় জেনে নিতে হয়। বলেছিলেন যে এ অঞ্চলে এত বেশি বাস যে বাসের অভাবে কোথাও পড়ে থাকতে হয় না। সারা দিন দুটো কোম্পানীর বাস চলেছে—কুলু ভ্যালি ট্রান্সপোর্ট আর হিমাচল প্রদেশ গভর্নমেণ্ট ট্রান্সপোর্ট। আর কাঙ্গড়া একটা বড় জংসন স্টেশন। ভদ্রলোক আমার জ্বালামুখী যাবার অভিপ্রায় জেনে আশ্বাস দিয়েছিলেন যে তাতে কোন অসুবিধা হবে না। মামার প্রশ্নের উত্তরে আমি স্বীকার করলুম যে এ কথা আমার জানা ছিল না।

আমার উত্তর শুনে স্বাতি ভারি খুশী হল। পিছন থেকে হাত বাড়িয়ে একটা আপেল দিয়ে বলল: তোমার সত্যবাদিতার জন্যে এই পুরস্কার পেলে।

সুন্দর আপেল! এখানেই কিনলে নাকি?

গম্ভীর ভাবে স্বাতি বলল: রেড ডিলিশাস।

মামী বললেন: আপেল এখানে ভারি সস্তা।

মামা বললেন : তবে আর কী! আপেল খেয়েই থাক।

স্বাতিও একটা আপেলে কামড় দিয়েছিল। মামী তাই দেখে বললেন : তোমাদের ঘেন্না-পিত্তি নেই।

কেন ?

না ধুয়েই খাচ্ছ!

মামীর কথার উত্তর না দিয়ে স্বাতি রামখেলাওনকেও একটা আপেল দিল। সে কিছু ইতস্তত করল এই আপেল নিতে। ইতস্তত করবেই। নিজেকে সে ভাগ্যবান ভাবতে শেখে নি।

সরল সমতল পথ ধরে আমরা অনেক এগিয়ে গেলুম। তারপর বাম হাতে একটা নূতন পথ বেরিয়ে গেল। একজন যাত্রীর কথায় জানতে পারলুম যে এটি ডালহৌসির পথ। খানিকটা জায়গায় এক-সঙ্গে এক দিকের গাড়ি চলে। ডালহৌসি যদি জমজমাট শহর হত, তাহলে দুদিক থেকে গাড়ি চলবার উপযোগী প্রশস্ত পথ হত অনেক দিন আগেই।

আরও একটু খবর পেলুম। এ পথ শুধু সংকীর্ণ ই নয়, অন্যান্য পাহাড়ের মতো ওঠানামাও বেশি। পাকদণ্ডীতে যাত্রীর দুর্ভোগও কিছু কম নয়। এ সব দিক থেকে কাঙ্গড়া উপত্যকার তুলনা নেই। মনে হবে সমতল ভূমির উপর দিয়ে চলেছি। একটু-আধটু চড়াই আনন্দের বলেই মনে হবে।

স্বাতি হঠাৎ আমাকে বলে উঠল : তোমার হিসেবের একটু ভুল হয়েছে মনে হচ্ছে।

বল।

তুমি হিমাচল প্রদেশ বলেছিলে বৈজনাথ ছাড়িয়ে।

বৈজনাথ কেন, যোগীন্দ্রনগরেরও পরে। মণ্ডিরাজ্য হল হিমাচল প্রদেশে।

স্বাতি বলল : চাম্বা উপত্যকাও তো হিমাচল প্রদেশে।

তাও ঠিক।

তবে কি এই হিমাচলে প্রবেশের দুটো পথ ?

হেসে বললুম : হিমাচল প্রদেশের দুটো অংশ—একটা চাম্বা উপত্যকা, আর একটা মণ্ডির দিকে। কিছুদিন আগে বাঙলাদেশের যেমন দুটো অংশ ছিল, ঠিক তেমনি। বিহারের কাছ থেকে এক-ফালি জমি পেয়ে পশ্চিম বাঙলার সঙ্গে উত্তর বাঙলা এখন যুক্ত হয়েছে। কিন্তু এখানে সে সম্ভাবনা নেই। হিমাচল প্রদেশের দুই অংশের মাঝখানে কুলু ও কাঙ্গড়া উপত্যকা। কাঙ্গড়া জেলা পাঞ্জাবের অধীন।

মামা বললেন : এই জেলাটা হিমাচল প্রদেশকে ছেড়ে দিলেই তো চলতে পারে।

বললুম ঃ তা কি আর দেবে ! বরং গোটা হিমাচল প্রদেশটাই একদিন গ্রাস করবে। যেমন পেপসুকে করেছে।

যে বাসটিতে আমরা চলেছিলুম সেটি খুব ভাল নয়, ছোট পুরনো বাস। বসবার জায়গাও তেমন আরামদায়ক নয়। পরে এই লাইনে এর চেয়ে ভাল বাসে চড়েছি। কিন্তু পথ মসৃণ বলে কোন কষ্ট হচ্ছিল না। বরং পারিপার্শ্বিক আবহাওয়ার গুণে বেশ ভাল লাগছিল।

মামা আমার কথার উত্তর দিলেন না। তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে মনে হল যে তিনি গভীর ভাবে কিছু ভাবতে শুরু করেছেন। আমিও আর কথা না বলে নিঃশব্দে আপেল খেতে লাগলুম।

খানিকক্ষণ পরে তিনি কথা কইলেন, বললেন : বুড়ো বয়সের অনেক বিভ্রাট গোপাল, পুরনো কথা মনে করতে গেলে উদোর পিণ্ডি বুদোর ঘাড়ে চেপে যায়।

আমি তাঁর পরের কথার অপেক্ষা করতে লাগলুম।

মামা একটু থেমে বললেন : কোথায় যেন পড়েছিলুম যে এ অঞ্চলের একটা মন্দির লুঠ করতে মুসলমানরা বারে বারে আসত, আর মণে মণে সোনা নিয়ে যেত।

মামার কথার উত্তর দেবার আগে আমি স্বাতির মুখের দিকে একবার তাকালুম। সে অমনি হেসে ফেলল। আমি তা উপেক্ষা করেই বললুম : আপনার ঠিকই মনে আছে। সে কাঙ্গড়ার মন্দির।

মামীর দিকে তাকিয়ে মামা আত্মপ্রসাদের হাসি হাসলেন। তারপর আমার দিকে তাকিয়ে আদেশ করলেন : বল না ঘটনাটা।

গজনীর সুলতান মামুদের কথা আমার মনে পড়েছিল। ভারতে রাজ্য প্রতিষ্ঠার বাসনা তাঁর ছিল না। তিনি বারে বারে এ দেশে এসেছেন ধনসম্পদ লুণ্ঠনের লোভে। সোমনাথের মন্দির লুণ্ঠনের মতো কাঙ্গড়ার মন্দির লুণ্ঠনও ইতিহাসে সুবিদিত। তখন কাঙ্গড়া শহরের নাম ছিল নগরকোট, আর এই নগরকোট রক্ষার জন্য শক্তিশালী কোন রাজা তখন ছিলেন না। একাদশ শতাব্দীর প্রথমেই আনন্দপালকে যুদ্ধে পরাজিত করে সুলতান মামুদ কাঙ্গড়ার মন্দির লুঠ করলেন। বললুম : কাঙ্গড়ার মন্দির লুঠ করে সুলতান মামুদ যা পেয়েছিলেন, লোকে আজকাল তা অবিশ্বাস্য ভাবে। বেশি নয়, সাত লক্ষ দিনার, মানে স্বর্ণমুদ্রা, সাত শো মণ সোনা ও রুপার বাসন, বিশুদ্ধ সোনা দুশো মণ ও রুপা দু হাজার মণ, আর হীরা মুক্তা মণিমাণিক্য মাত্র কুড়ি মণ।

দুচোখ কপালে তুলে মামী বললেন : এত !

স্বাতি বলল : এ তোমার নিজের মনগড়া হিসেব বুঝি !

বললুম : আমার নয়, এ হল প্রাচীন ভারতের বিখ্যাত ঐতিহাসিক ফেরিস্তার হিসাব।

মামা বললেন : তাদের কি চল্লিশ সেরে মণ হত ?

স্বাতি বলল : না, সেই দক্ষিণ ভারতের সেরের মতো চল্লিশ সের ?

আমি মামার কথার উত্তর দিলুম, বললুম : আপনার সন্দেহই ঠিক। যাঁরা ফেরিস্তার এই হিসেব অতিরঞ্জিত বলে মনে করেন না, তাঁরা মনে করেন যে ফেরিস্তার মণ চল্লিশ সেরে নয়। সে

সময় আরব ও পারস্যের নানা জায়গায় এক থেকে চার সেরে মণ হত। ফেরিস্তার মণ কত সেরে তা আজ জানবার উপায় নেই।

মামা বললেন: তাহলেও তার পরিমাণ কিছু কম নয়।

স্বাতি জিজ্ঞাসা করল: পুরাণের কথা কিছু বললে না?

এ যে তার কৌতুকের কথা, আমি তা বুঝি। তাই বললুম: চেষ্টা করলে পুরাণের কথা আনা যায় বৈকি।

মামা বললেন: সত্যি নাকি!

বললুম: এ অঞ্চলে কুলু ও কুনেৎ নামে দুই প্রাচীন জাতির কিছু লোক এখনও আছে। এই দুটি শব্দ কুলূত ও কুলিঙ্গের অপভ্রংশ বলে মনে হয়।

কেন?

মহাভারত ও পুরাণে আমরা কুলূত ও কুলিঙ্গ নামে দুই পার্বত্য জাতির উল্লেখ পাই। তখনই এই অঞ্চলের নাম ছিল কুলূত জনপদ ও কুলিঙ্গ জনপদ।

স্বাতি বলল: এ নিশ্চয়ই তোমার তৈরি গল্প।

পুরাণের গল্পও তো সবাই তৈরি বলে। তাই বলে পুরাণ তো মিথ্যা হয়ে যায় নি। কোন দিন হবে না। ধর্মের মৃত্যু নেই, আর ধর্ম যত দিন থাকবে তত দিন আমরা ঐতিহ্যকে শ্রদ্ধা করব। যে কুলূত ও কুলিঙ্গ জাতিকে তাড়িয়ে রাজপুতেরা এই অঞ্চল অধিকার করেছিল, তারাও নিজেদের কুরু-পাণ্ডবের সমকালীন বলে পরিচয় দেয়। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের সময় তারা নাকি জলন্ধরে ছিল—কতোচ রাজবংশ। এ কালে মুসলমানের উপদ্রবে বিরক্ত হয়ে কাঙ্গড়ার গিরিদুর্গে আশ্রয় নিয়েছে। তাদেরও একটা ইতিহাস আছে।

মামা বললেন: সেদিন তুমি অন্য কথা বলেছিলে। মহাভারতের যুগে এই অঞ্চলের নাম ছিল ত্রিগর্ত।

সে তো অন্য কথা নয়। ত্রিগর্ত হল জলন্ধর রাজ্যের প্রাচীন

নাম, আর তারই অধীন কাঙ্গড়া উপত্যকা। চীনা পরিব্রাজক হিউএন চাঙ জলন্ধর রাজ্যের রাজধানী জলন্ধর শহরে প্রায় এক মাস বাস করেছিলেন। তাঁর ভ্রমণ-কাহিনীতেও কিছু কিছু উপকরণ পাওয়া যায়। জলন্ধরে তিনি যাঁকে রাজা দেখেছেন, তাঁর নাম উ-তি-তো বা উদিত। একখানা শিলালিপিতে আমরা আদিম রাজার নাম পাই। এমনও হতে পারে যে উ-তি-তো ও আদিম একই ব্যক্তি। জয়চন্দ্র তাঁর অধস্তন সপ্তম পুরুষ। অনেকে বলেন যে পঞ্চম শতাব্দীর শেষ ভাগে কাশ্মীরের রাজা এই ত্রিগর্ত রাজ্য প্রবরেশের নামে উৎসর্গ করেন। তাঁর কী অধিকার ছিল জানা যায় না। তবে একাদশ শতাব্দীতে দেখা যায় যে কাশ্মীরের রাজা অবন্ত জলন্ধরের রাজা ইন্দুচন্দ্রের দুই কন্যাকে বিবাহ করেছেন। তারপর জলন্ধর রাজ্য অনেকগুলি ছোট ছোট রাজ্যে বিভক্ত হয়ে যায়। তখন নাকি কাঙ্গড়ায় জলন্ধর রাজ্যের রাজধানী ছিল। সুলতান মামুদ যখন কাঙ্গড়া আক্রমণ করেন, তখন থেকেই এই রাজ্যগুলি কাঙ্গড়ার প্রাধান্য অস্বীকার করে।

বাস এক জায়গায় দাঁড়িয়েছিল। কয়েকজন যাত্রী নেমে গেল, উঠলও কয়েকজন। শুনলুম, আমরা পাঠানকোট থেকে উনিশ মাইল এসেছি, এ জায়গার নাম নুরপুর। আমাদের সঙ্গী একজন কৌতূহলী যাত্রী নানারকম খোঁজখবর নিতে নিতে আসছিলেন। এ জায়গার নাম নুরপুর কেন হল, তিনি জানতে চাইলেন। এই প্রশ্ন শুনে পাশের ভদ্রলোক চটে উঠলেন। হিন্দীতে কথা হচ্ছিল, হিন্দীতেই খেঁকিয়ে উঠলেন : জায়গার নাম কেন হল, তা কী করে বলব!

সেই ভদ্রলোক নাছোড়বান্দা। বললেন : নুর কথাটা মুসলমানী কিনা, তাই এই কথা জিজ্ঞাসা করছি। মামুদপুর হলে কিছু জিজ্ঞেস করতাম না।

কেন?

ভাবতাম, সুলতান মামুদ কাঙ্গড়া থেকে ফেরার পথে এই নাম রেখে গিয়েছিলেন।

স্বাতি আমাকে একটা ঠেলা দিয়ে বলল : উত্তরটা বলে দাও না গোপালদা।

এও তার কৌতুকের কথা। কিন্তু উত্তর আর আমাকে দিতে হল না। এখান থেকে যে যাত্রীরা উঠেছিলেন, তাঁদেরই একজন বললেন : এ জায়গার প্রাচীন নাম ধামেরি। মোগল বাদশাহ জাহাঙ্গীরের নামে নাম হয়েছে নুরপুর।

সে আবার কী?

বাদশাহ হবার আগে জাহাঙ্গীরের নাম ছিল নুর-উদ-দীন, মানে বিশ্বাসের আলো। আর তাঁর বেগমের নাম নুর জাহান, মানে জগতের আলো। জাহাঙ্গীর হয় তাঁর নিজের নামে আর না হয় বেগমের নামে এই জায়গার নাম রেখেছিলেন নুরপুর।

সেই কৌতূহলী যাত্রীটি খুশী হয়ে পাশের সঙ্গীকে বললেন : দেখলেন তো, সব নামেরই একটা মানে আছে। আপনি শুধু শুধু আমার উপরে চটে উঠেছিলেন।

কিন্তু কেউই জানতে চাইলেন না যে জাহাঙ্গীর বাদশাহ এই জায়গার নাম রাখতে দিল্লী থেকে এসেছিলেন কেন। ইতিমধ্যে সেই ভদ্রলোক আরও অনেক খবর দিয়ে ফেলেছিলেন। নুরপুর এই তহশিলের প্রধান শহর, রাস্তা থেকেই একটা এক হাজার বছরের পুরনো দুর্গ দেখা যায়। রাজা বসুর তৈরি এই দুর্গ।

চলতি বাস থেকেই আমরা সেই দুর্গ দেখেছিলুম।

ভদ্রলোক আরও বলেছিলেন পশমিনার কথা। নুরপুরের প্রধান শিল্প হল উলের শাল। ১৭৮৩ খ্রীষ্টাব্দে কাশ্মীরে যে দুর্ভিক্ষ হয়েছিল তাতে বহু কাশ্মীরী এখানে পালিয়ে এসে এই কাজ শুরু করে। এখন এই ব্যবসা স্থানীয় লোকের হাতে পড়েছে।

হিন্দীতে কথাবার্তা বুঝতে মামার অসুবিধা হচ্ছিল। বললেন: জাহাঙ্গীর এখানে কেন এসেছিলেন?

তা বলতে হলে ইতিহাসের কথা বলতে হয়।

তাতে কে বারণ করছে!

পিছন ফিরে দেখলুম, স্বাতি আমার দিকে চেয়ে হাসছে। বললুম: ইতিহাসের কথা সবার ভাল লাগে না।

মামা বললেন: যার ভাল লাগে না সে শুনবে না। সবার সব কথা কি সকলের ভাল লাগে!

বললুম: সুলতান মামুদের পর ফিরোজ তুঘলুক কাঙ্গড়া আক্রমণ করেছিলেন চতুর্দশ শতাব্দীর মাঝামাঝি। সুলতান মামুদ দেবমূর্তি ধ্বংস করবার পঁয়ত্রিশ বৎসর পরে যে নতুন মূর্তি রাজারা প্রতিষ্ঠা করেন, তা এবারে মক্কায় চলে গেল। রাজারা বশ্যতা স্বীকার করে শুধু রাজ্য রক্ষা করলেন। এর প্রায় দুশো বছর পর আকবর বাদশাহ এই অঞ্চল অধিকার করে নিলেন। শুধু কয়েকজন রাজপুত সর্দার অতি দুর্গম কয়েকটি স্থান নিজেদের অধিকারে রাখতে সমর্থ হলেন। এঁরাই দুবার কাঙ্গড়ার দুর্গ অধিকারের চেষ্টা করেছিলেন। তাঁদের দমন করবার জন্য জাহাঙ্গীর বাদশাহকে এখানে দুবার আসতে হয়েছিল।

জাহাঙ্গীর শৌখিন লোক ছিলেন। অনেক সুন্দর জায়গায় তিনি গ্রীষ্মাবাস রচনা করেছেন, অনেক সুন্দর বাগান আজও তাঁর রূপ-চেতনার স্বাক্ষর বহন করছে। এখানেও নাকি এক গর্গরি গ্রামে সেই নিদর্শন আছে।

দিল্লীর বাদশাহরা এ অঞ্চলের রাজাদের সম্মান করতেন। শাহজাহানের সময় নুরপুরের রাজা জগৎচাঁদ চোদ্দ হাজার সৈন্য নিয়ে বাল্‌খ ও বদকসানের উজবেগদের দমন করেছিলেন। তাঁর পৌত্র মান্ধাতাকে ঔরঙ্গজেব বামিয়ান ও ঘোরবন্দের শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন। এর প্রায় এক শো বছর পরে কাঙ্গড়ার রাজা ঘমন্ডচাঁদ জলন্ধর ও তার উত্তর অঞ্চলের শাসনকর্তা নিযুক্ত হন।

অষ্টাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি থেকেই এই রাজারা স্বাধীন হবার চেষ্টা করেন। কাঙ্গড়ার দুর্গটি তখন আহমদ শাহ দুরানির হাতে ছিল। জগৎসিংহ নামে একজন শিখসর্দার কৌশলে তা অধিকার করেন, এবং তার বছর দশেক পরে কাঙ্গড়ার রাজপুত্র রাজা সংসার-চাঁদকে ছেড়ে দেন।

সংসারচাঁদ কাঙ্গড়ার শ্রেষ্ঠ রাজা। বিশ বৎসর তিনি প্রবল প্রতাপে রাজত্ব করেন। এ অঞ্চলের সর্দারদের নিয়ে তিনি দিগ্বিজয়ে বার হতেন। তিনি প্রথম বিপদে পড়লেন শতদ্রুর পরপারে বিলাসপুর রাজ্য আক্রমণ করে। বিলাসপুরের রাজা গুর্খা সর্দারদের সাহায্যে যুদ্ধ জয় করে কাঙ্গড়া আক্রমণ করলেন। গুর্খাদের অমানুষিক অত্যাচারে কাঙ্গড়া ধ্বংস হয়ে গেল। তারপর মহারাজ রণজিৎ সিংহের সাহায্যে তিনি তিন বছর পরে কাঙ্গড়া উদ্ধার করেন। এ সমস্ত উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকের ঘটনা। তখন শুধু কাঙ্গড়ার দুর্গ আর কিছু গ্রাম রণজিৎ সিংহর অধীনে ছিল। ধীরে ধীরে তিনি সবই নিজের অধীনে আনতে লাগলেন। সংসারচাঁদের মৃত্যুর পরে অনিরুদ্ধচাঁদ রাজা হয়েছিলেন চার বছরের জন্য। রণজিৎ সিংহ তাঁর মন্ত্রীপুত্রের সঙ্গে অনিরুদ্ধচাঁদের ভগিনীর বিবাহ দিতে চেয়েছিলেন। এই অপমানকার প্রস্তাবে অনিরুদ্ধচাঁদ ক্ষুব্ধ হয়ে রাজ্যত্যাগ করে হরিদ্বারে চলে যান। সমগ্র কাঙ্গড়া তখন শিখরাজ্যের অন্তর্গত হল। তারপর প্রথম শিখযুদ্ধের পরে হল ইংরেজের অধীন। সিপাহী বিদ্রোহের সময় যে সর্দারেরা বিদ্রোহী হবার চেষ্টা করেছিলেন, ইংরেজরা তাদের ছ জনের ফাঁসি দেয়। তারপর থেকেই কাঙ্গড়া শান্ত।

মাঝে মাঝে আমি বাহিরের প্রাকৃতিক শোভা দেখছিলুম। সমতল রাস্তা মাঝে মাঝে উপরে উঠছে, তারপরে আবার সমতল। দুধারে শ্যামল শস্যক্ষেত্র। ধবলাধার পাহাড়ে নাকি আর বরফ নেই। প্রচণ্ড গ্রীষ্মে বরফ গলে শেষ হয়ে গেছে। শীতে আবার সমৃদ্ধ হবে। এখন

তার শিলাময় পাঁজরগুলি রুক্ষ শুষ্ক। এই ধবলাধার কাঙড়া উপত্যকাকে বিচ্ছিন্ন করেছে চাম্বা থেকে। চাম্বা যেতে হলে আমাদের পাঠানকোটে আবার ফিরে যেতে হবে।

মামা আমাকে নীরব দেখে বললেন ঃ তারপর ?

তারপর আর ইতিহাস নেই।

নুরপুর থেকে একুশ মাইলে শাহপুর নামে একটি লোকালয় আমরা ছেড়ে এসেছিলুম। এবারে এলুম গগ্‌গল নামে একটি জায়গায়। শাহপুর থেকে মাত্র আট মাইল দূরে এই লোকালয়। কয়েকটি ফলের ও সবজির দোকান বেশ সরগরম দেখলুম।

সেই কৌতূহলী যাত্রীটি এই জায়গাটির নাম ভাল উচ্চারণ করতে পারছিলেন না। অনেক জায়গার নামই আমরা সঠিক উচ্চারণ করতে পারি না। তার কারণ আমরা ইংরেজী বানান দেখে উচ্চারণ করি, স্থানীয় লোকের কাছে জিজ্ঞাসা করে জেনে নিতে লজ্জা বোধ করি।

গগ্‌গল থেকে উত্তর ও দক্ষিণ দুদিকেই রাস্তা বেরিয়েছে। উত্তরে আট মাইল দূরে ধরমশালা, আর দক্ষিণে কাঙড়া শহর মাত্র তিন মাইল। এই তিন মাইল অতিক্রম করতে আমাদের কয়েক মিনিট সময় লাগল।

২৭

ঘন লোকালয়ের মাঝখান দিয়ে আমরা কাঙ্গড়ার বাস স্টেশনে এসে নামলুম। মোটর বাসের এত বড় জংশন স্টেশন কাঙ্গড়া উপত্যকায় আর নেই। স্বীকার করতে দোষ নেই যে রেল স্টেশনের মতো বাস বদলের এমন ব্যবস্থা আমি এর আগে কোথাও দেখি নি। এই বাস-স্টেশনে নানা দিক থেকে বাস আসছে—পাঠানকোট থেকে, বৈজনাথ থেকে, জ্বালামুখী থেকে আর ধরমশালা থেকে। বৈজনাথের বাস কাঙ্গড়ায় খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে চলে যাবে। আমরা তাই এখানে নেমে পড়লুম।

একখানা পুরনো বাড়ির ভিতর ওয়েটিং রুম। কয়েকখানা বেঞ্চে বসে কয়েকজন যাত্রী অন্য বাসের অপেক্ষা করছেন। মহিলাদের আলাদা ঘর আছে। মালপত্র নিয়ে সবাই অপেক্ষা করছেন।

টিকিট-ঘরে আমরা জ্বালামুখীর টিকিট পেলুম না। ধরমশালা থেকে জ্বালামুখীর বাস আসবে। তাতে জায়গা থাকলেই টিকিট পাওয়া যাবে। এই কথা শুনেই মামা ক্ষেপে গেলেন, বললেন: চরম অব্যবস্থা। জায়গা না থাকলে কি আমরা এখানে পড়ে থাকব?

টিকিটবাবু আশ্বাস দিয়ে বললেন: তা থাকতে হবে না। বাসে জায়গা পাওয়া যাবেই।

তবে টিকিট দিতে আপত্তি কী?

সেই হল নিয়ম।

নিয়মের মুখে ছাই।

মামীর দিকে তাকিয়ে বললেন: এই জন্যেই আমি ট্যাক্সিতে আসতে চেয়েছিলুম। পরের মুখাপেক্ষী তাহলে হতে হত না।

স্বাতি বলল: বাসের জন্যে অপেক্ষা না করে কাঙ্গড়ার শহরটা দেখে নিলে হত না?

বললুম: কিন্তু দেরি হলে এখানেই রাত কাটাতে হবে।

মামী বললেন : না না, আগে মায়ের দর্শন হোক, তারপর অন্য কথা।

জিজ্ঞাসা করে জানা গেল যে আধ ঘণ্টার মধ্যেই জ্বালামুখীর বাস এসে পৌঁছবে। কাজেই এখন অন্যত্র যাওয়া সমীচীন নয়। বজ্রেশ্বরীর মন্দির পাহাড়ের উপর, যেতে আসতে সময় লাগবে। কাঙ্গড়ার ভাঙা দুর্গ এখান থেকে অনেক দূরে, সেখানে পায়ে হেঁটে পৌঁছনো যাবে না। বাজার মন্দিরের রাস্তায়, সরকারী দপ্তর কাছারিতে দ্রষ্টব্য কিছুই নেই। অতএব এই বাস-স্টেশনের চাএর দোকানেই তৃষ্ণা নিবারণের চেষ্টা ভাল। স্বাতি এক নজরে দোকানপাটগুলো দেখে নিয়েই বলল : গরম পকৌড়া ভাজছে গোপালদা।

হেসে বললুম : সঙ্গে ভাল চাটনি দিচ্ছে তো?

চাটনির নামেই অনেকের জিভে জল আসে। স্বাতি বলল : চলে এস।

এখানে দোকান যতগুলি দেখলুম, তার বেশির ভাগই খাবার জিনিসের দোকান। চালার নিচে হোটেল, ভাত ডাল পুরি তরকারি পাওয়া যায়। চা বিস্কুটের দোকান আছে, শরবৎ আর পানের। কিছু পরিচ্ছন্ন একটা চায়ের দোকানে বসে পকৌড়ার হুকুম দিলুম সামনের দোকানে। গরম তেল থেকে ছেঁকে তুলে ওজন করে পাঠিয়ে দিল। মামী খেলেন না, মামা শুধু চা খেলেন। খেলুম আমি আর স্বাতি।

বাস সময় মতোই এল। তাতে প্রবল ভিড়। পিছন দিকের দরজা দিয়ে দু একজনকে নামতে দেখেই আমি সামনের দিকের দরজা দিয়ে মামা মামীকে তুলে দিলুম। স্বাতি দাঁড়িয়ে ছিল। বললুম : তুমিও উঠে পড়।

স্বাতি বলল : তোমার কী হবে?

হবে একটা গতি।

বলে তাকেও ঠেলে তুলে দিলুম। রামখেলাওনকে কিছু বলতে হল না। সে উঠল পিছনের দরজা দিয়ে। আমার কাজ বাকি ছিল। ছাদের উপরে মালপত্র তুলল কুলীরা। টিকিট কেটে তাদের পয়সা মেটালুম। তারপরে উঠলুম বাসে।

বসবার জায়গা সবাই পেয়েছিলেন। এমন কি রামখেলাওনও একটুখানি জায়গা দখল করে বসেছিল। আমি উঠতেই স্বাতি বলল : সামনেই তোমার জায়গা।

তুজনের জায়গা। তার উপর একটি সাদা টুপি। গান্ধী টুপি নয়, এই টুপি আমরা তুপুরবেলায় খেলার মাঠে দেখি খেলোয়াড়ের মাথায় নয়, কর্মীদের মাথায়—জাজ বা আম্পায়ারের মাথায়। টুপিটা একটু এক পাশে সরিয়ে আমি বসলুম।

টুপির মালিক উঠলেন বাস ছাড়বার ঠিক আগের মুহূর্তে। গোলগাল প্রসন্ন চেহারা। প্রথমটায় খেয়াল করি নি, টুপি মাথায় দিয়ে আমার পাশে বসতেই তাঁকে দেখতে পেলুম। কিন্তু কোন্ অঞ্চলের মানুষ তা বুঝতে পারলুম না।

বাস ছাড়বার পরে পিছন থেকে স্বাতি বলল : গোপালদার আর কী চাই! বসবার জায়গা পেয়েছে, সঙ্গীও পেয়েছে ভাল।

টুপিওয়ালা ভদ্রলোক মুখ ফিরিয়ে বললেন : ভাল সঙ্গী তা কী করে বুঝলেন!

বাঙলা কথা শুনে স্বাতি চমকে উঠল, লজ্জাও পেল প্রচুর। কিন্তু কোন উত্তর দিতে পারল না।

আমি বললুম : আমি ছাড়া আর সবাইকে স্বাতি ভাল লোক মনে করে।

ভদ্রলোক বয়সে আমার চেয়ে তরুণ। বললেন : গোপালদা আমাকে ফাঁকি দিতে পারবেন না। সঙ্গী ভাল পেয়েছি আমি।

বন্ধুতা হতে আমাদের সময় লাগল না। দেবপ্রসাদ দাশগুপ্ত ধরমশালা থেকে জ্বালামুখী যাচ্ছেন। তু তিন দিন সেখানে থেকে

কাঙ্গড়া ফিরবেন, কাঙ্গড়া থেকে বৈজনাথ হয়ে কুলু ও মানালি। তারপর রোতাং পাস থেকে তিব্বতের বরফ দেখে কুলুতে দশেরার উৎসব দেখবেন। কলকাতায় ফিরবেন ভাইফোঁটার আগে, বোনের কাছে ফোঁটা নিতে হবে।

জিজ্ঞাসা করলুম : বাড়ি থেকে বেরিয়েছেন কত দিন ?

তা অনেকদিন হল। বাড়ি ফেরবার জন্যে দু তিনখানা টেলিগ্রামও পেয়েছি। মামা ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন।

এই মামার পরিচয়ও দিলেন। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের অনুজ পি. আর. দাস—পাটনার শ্রেষ্ঠ আইনজীবী।

আমার মামা মামীর সঙ্গে আমি তাঁর পরিচয় করে দিলুম। স্বাতির সঙ্গেও। দেবপ্রসাদ তাঁর সৌজন্যে ও অমায়িকতায় সবাইকে মুগ্ধ করলেন।

এক সময় আমি জিজ্ঞাসা করলুম : ধরমশালায় কত দিন ছিলেন ?

দু তিন দিন।

তার আগে ?

কাশ্মীর থেকে চাম্বা উপত্যকায় এসেছিলুম। সেখানেই বেশি দিন কেটেছে।

কাশ্মীরের কথা আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করলুম না। এখান থেকে আমরা কাশ্মীরে যাব। ধরমশালায় যাবার ইচ্ছাও আছে। কিন্তু চাম্বা যাওয়া হবে কি না জানি না। কাঙ্গড়া ও কুলু উপত্যকা দেখে পাঠানকোটে ফিরে মামা হয়তো কাশ্মীরে যেতে চাইবেন। চাম্বার আকর্ষণ তাঁর কাছে কম। আমি তাই জিজ্ঞাসা করলুম : চাম্বা নিশ্চয়ই আপনার ভাল লেগেছে ?

অপরূপা চাম্বা। ডালহৌসি থেকে পায়ে হেঁটে আমি চাম্বা গিয়েছিলাম।

পায়ে হেঁটে !

হিমালয়ে হেঁটেই তো আনন্দ। এমনি করে বাসে বেড়িয়ে কি আনন্দ আছে!

তারপর আমি তাঁর কাছে ডালহৌসি ও চাম্বার গল্প শুনলুম।

পাঠানকোট থেকে ডালহৌসির দূরত্ব যে পঞ্চাশ মাইল তা জানতুম, আরও জানতুম যে এই পথে ওয়ান ওয়ে ট্র্যাফিক, মানে এক সময়ে এক ধার থেকেই গাড়ি চলে। এইবারে জানলুম যে ঠিক তা নয়। বাস প্রায় এক সঙ্গে দু ধার থেকেই ছাড়ে, তারপর ডুনেরা নামে একটা জায়গায় এসে দুদিকেরই বাস দাঁড়ায়। পাঠান-কোট থেকে যে বাস ছাড়ে ভোর পৌনে পাঁচটায়, আটাশ মাইল পথ অতিক্রম করে সাড়ে ছটায় তা ডুনেরা পৌঁছয়। আর ডালহৌসি থেকে যে বাস পাঁচটায় ছাড়ে, তাও ডুনেরা পৌঁছয় সাড়ে ছটায়। আধ ঘণ্টা দাঁড়াবার পর দুদিকের বাসই ছেড়ে যায়। এই পথে ডুনেরা একটা উল্লেখযোগ্য জায়গা। আর একটা জায়গাও চাম্বার যাত্রীদের কাছে স্মরণীয়। তার নাম বানিখেত, কুমায়ুন পাহাড়ের রাণীখেত নয়। ডালহৌসি পৌঁছতে পাঁচ মাইল পথ বাকি থাকতেই এই বানিখেতে সব বাস দাঁড়ায়। ফেরার বাসও তাই। ডালহৌসি থেকে বানিখেতে পৌঁছতে মাত্র পনর মিনিট সময় লাগে। বানিখেত থেকে চাম্বার পথ শুরু হয়েছে। চাম্বা যাবার আরও একটি পথ আছে, সে ডালহৌসি থেকে কালাটপ খাজিয়ার হয়ে। সে পথ আরও সুন্দর, আরও রমণীয়। এমন অপরূপ পথ জীবনে কম দেখা যায়।

ধবলাধারের উপর পাঁচটি পাহাড় নিয়ে ডালহৌসি শহর। পাহাড়গুলির নাম বালুন কাথলগ পোট্রেন টেহরা ও বাক্রোটা। অন্যান্য শৈলাবাসের মত এই শহরটিও গোরা সৈন্যের বিশ্রামের জন্য এক শো বছর আগে গড়ে উঠেছিল। বালুন পাহাড়ে এখনও একটি বড় ছাউনি আছে। পাঁচ থেকে সাত হাজার ফুট উঁচু এই পাহাড়গুলির মধ্যে বাক্রোটাই সব চেয়ে উঁচু। এখানে সবাই প্রকৃতির সৌন্দর্য

দেখতে ওঠে। উত্তরে বরফ দেখা যায় আঠারো উনিশ হাজার ফুট উঁচু পর্বত শিখরে, আবার দক্ষিণের সমতল ক্ষেত্রও দেখা যায়। পরিষ্কার দিনে নাকি ইরাবতী শতদ্রু ও বিপাশার ক্ষীণধারা দেখা যায় প্রবাহিত হতে। ইরাবতী এই উপত্যকার নদী, কিন্তু মানচিত্রের দিকে তাকিয়ে বিশ্বাস করতে কষ্ট হয় যে শতদ্রু ও বিপাশাও দেখা যায়।

দেবপ্রসাদ বললেন : এমন নির্জন এমন শান্ত এমন সুন্দর শৈলাবাস আগে কখনও দেখি নি। বাইরে থেকে কখনও বুঝতে পারা যায় না ডালহৌসিতে এত সুন্দর সুন্দর বাঙলো আছে। বিদ্যালয় আছে, হাট বাজার গুরুদ্বার গির্জা মন্দির সব কিছুই আছে। সব কিছুই লুকিয়ে আছে গাছের আড়ালে আড়ালে বনানীর অন্তরালে। সব আছে, শুধু মানুষের ভিড় নেই ডালহৌসিতে।

এ কথা আমিও শুনেছিলুম যে ডালহৌসির মত নির্জন শৈলাবাস ভারতে আর নেই। শুধু নির্জন নয়, সস্তাও বটে। দুধ ঘি ফলমূল সবজি, সবই সস্তা। থাকবার জন্যে বড় বড় বাড়ি পাওয়া যায়, তারও ভাড়া সস্তা। কোন দিনই এই শহর অন্যান্য শৈলাবাসের মতো দুর্মূল্য ছিল না। তবে এমনটিও ঠিক ছিল না। দেশ স্বাধীন হবার আগে এখানে নাকি অনেক সমৃদ্ধ মুসলমানের বাস ছিল। তারাই তাঁদের সম্পত্তি ফেলে পাকিস্তানে চলে গেছেন।

দেবপ্রসাদের বলার ভঙ্গিটি বড় মনোরম। বললেন : ডালহৌসির অন্যতম শ্রেষ্ঠ পরিভ্রমণের পথ হল টেগোর রোড। পুরো মাইল তিনেকের চক্কর, কোথাও একটু উঁচু নিচু নেই। যেন সমতল ভূমির নির্জন বনপথ। পাইন সিডার আর ফার গাছের ছায়ায় ছায়ায় গেছে টেগোর রোড। পুরো বাক্রোটা পাহাড়ের চূড়োটাকে পেঁচিয়ে আছে। গাছের ফাঁকে ফাঁকে দেখা যায় হিমালয়ের উত্তুঙ্গ তুষারমৌলী শিখরশ্রেণী। দেখা যায় কত নদী, কত ঝর্ণা, কত ঝোরা অবিরাম ঝরে পড়ছে কঠিন পর্বতের গা বেয়ে বেয়ে। দেখা যায় অনিন্দ্যসুন্দর

পাঙ্গী পর্বতমালা যেন রূপের জোয়ারে স্নান সেরে অসীমের বন্দনায় রত। ধ্যানমৌন শান্ত স্তব্ধ সে রূপের সম্মুখে দাঁড়িয়ে শুধু মনে হয়, কে বলে তুমি নেই।

দেবপ্রসাদের চোখে এক রকমের ভাবালুতা দেখি। যেন চোখের সামনে তিনি পাহাড়ের রূপ দেখছেন। পায়ে হেঁটে যাঁরা পাহাড় দেখেন, এ বোধহয় তাঁদেরই কথা। পাহাড়ের পথে বাসের ভিতর বসে আমরা যে রূপ দেখছি, মনের ভিতর তা কোন দাগ কাটে না। যেন একটা আয়নার উপর তার ছায়া ফেলে সরে গেল, মুছে গেল তার স্মৃতি।

টেগোর রোডের কথায় আমার রবীন্দ্রনাথের কথা মনে এসেছিল। তাঁর জীবনস্মৃতির কথা। বালক রবীন্দ্রনাথ তাঁর পিতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের সঙ্গে ডালহৌসি পাহাড়ে এসেছিলেন। বাক্রোটায় তাঁর বাসা একটা পাহাড়ের সর্বোচ্চ চূড়ায় ছিল।

দেবপ্রসাদ বললেন: সেই ডাকবাংলো বহু দিন হল বিক্রি হয়ে গেছে। এখন সে বাড়ির মালিকানা মিসেস এস. সি. মুখার্জীর। বাংলোর নাম স্নোডন।

আর একটি বাঙালী নামের সঙ্গে ডালহৌসির নাম যুক্ত হয়ে আছে। নেতাজী সুভাষচন্দ্র। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের অল্প দিন আগে অসুস্থ নেতাজী তাঁর স্বাস্থ্যোদ্ধারে এই পাহাড়ে এসেছিলেন। কৃতজ্ঞতায় ডালহৌসিবাসী তাঁর নামটিও ভুলতে পারে নি। দেবপ্রসাদ বললেন: ডালহৌসির সুভাষচক আড্ডার আর একটি মনোরম ঠাঁই। মিউনিসিপ্যালিটির দেওয়া কাঠের বেঞ্চগুলো কখনও খালি থাকে না। অনেকগুলো রাস্তা এসে ভিড় করেছে সুভাষচকে। এক পাশে রিডিং রুম কনভেন্ট দোকান পশার হাট বাজার। কাথলগ অঞ্চলে যাবার কাছারি রোড শুরু এই সুভাষচক থেকেই। কাথলগ পাহাড়েই ডালহৌসির কাছারি হাসপাতাল শিখ গুরুদ্বার আর্য সমাজের উপাসনা গৃহ রামের মন্দির ও ধর্মশালা। পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের হলিডে

হোমটি সুন্দর ও সুরুচির পরিচায়ক, একেবারে কাথলগ পাহাড়ের শেষ সীমানায়। অতি শান্ত নির্জন এই পাহাড়ের সুরম্য পরিবেশ। যত দূর চোখ যায় কেবল দেখা যায় অসংখ্য পর্বতশৃঙ্গ মাথা তুলে আছে আকাশকে ছোঁবে বলে। আর দেখা যায় গভীর সবুজ বনানী পাহাড়ের গায়ে যেন চিরকালের বাসা বেঁধেছে।

দেবপ্রসাদের চোখে আমি আবার সেই ভাবালুতা দেখলুম।

প্রবোধকুমার সান্যাল লিখেছেন যে পুত্র জওহরলালকে নিয়ে পণ্ডিত মতিলালও এখানে এসেছিলেন। আরও কত কৃতী ব্যক্তি এখানে এসেছিলেন, তার হিসাব আমরা রাখি নি।

ডালহৌসি থেকে হেঁটে বেড়াবার জায়গা কয়েকটি আছে। কালাটপ মাইল পাঁচেক দূরে। ডাইন কুণ্ড আট মাইল এবং চাম্বার পথে খাজিয়ার বারো মাইল। দেবপ্রসাদ এই পথেই চাম্বা গিয়েছিলেন। বললেন: লক্কর মণ্ডি থেকে তিনটি পথ বেরিয়েছে। একটি গেছে কালাটপ—সেখান থেকে দু মাইল, আর একটি খাজিয়ার হয়ে চাম্বা এবং তৃতীয়টি ডাইন কুণ্ডের পাকদণ্ডী পথ। লক্কর মণ্ডি থেকে কালাটপ পর্যন্ত পুরো দু মাইলের পথটাই একেবারে সমতল, কোথাও একটু উঁচু নিচু নেই, গভীর বনের ছায়ায় ছায়ায় গেছে কালাটপের সর্পিল সরণি।

ডাইন কুণ্ড তিনি যান নি। সেখানকার গল্প শুনেছিলেন এক বন্ধুর কাছে। অমন ভুবন-ভোলানো রূপ নাকি আর কোথাও নেই এ তল্লাটে। লক্কর মণ্ডি থেকে মাত্র তিন মাইল, অবশ্য পাকদণ্ডী পথ। কিন্তু ডাইন কুণ্ডের উচ্চ শিখর চূড়ায় একবার দাঁড়ালে পথের কোন দুঃখই আর মনে থাকে না। সবুজ কোমল ঘাসে ঢাকা অবারিত মাঠ। আর দূরে দেখা যায় সূর্যকিরণে কাঁচা সোনার রঙে আলোর মশাল জ্বেলে এঁকেবেঁকে সর্পিল রেখায় চলেছে পাঞ্জাবের চারটি খরস্রোতা—ইরাবতী চন্দ্রভাগা শতদ্রু ও বিপাশা। সেখান থেকে হাজারখানেক ফুট উপরে উঠলেই দেবী শিখর—যার উচ্চতা প্রায় দশ

হাজার ফুট। ডাইন কুণ্ড মানে ডাইনীর কুণ্ড, ইংরেজীতে বলে ম্যাজিক পুল। চারিদিকের সবুজের মাঝে এই কুণ্ডে নাকি পরীদের খেলাঘর।

তারপর খাজিয়ারের গল্প বলেছিলেন দেবপ্রসাদ: সবুজ ঘাসের মখমলে ঢাকা খাজিয়ারের ছোট্ট এই বৃত্তাকার অঙ্গনটুকু আর মাঝখানে ছোট্ট একটি স্বচ্ছ হ্রদ। গভীর বনানীর প্রাচীর দিয়ে ঘেরা বৃত্তের পরিধি। এখানে দাঁড়ালে শুধু দেখা যায় গভীর বন। নীল আকাশ আর অচ্ছোদ সরোবরের মাঝখানে বনবাদাড়ে ঢাকা ছোট্ট একটি ভাসমান দ্বীপ। প্রকৃতির এক পরম বিস্ময় এই ছোট্ট দ্বীপখানি। হাওয়ার তাড়নায় নিজের খেয়াল-খুশিতেই জলের বুকে ঘুরে বেড়ায়—কখন পূবে কখন পশ্চিমে কখন দক্ষিণে কখন বা উত্তরে।

পিরিচের মতো আকার খাজিয়ারের এই অপরিসর গোচারণ ক্ষেত্রটুকু, চারি দিকের উঁচু সীমানা সিডার ও চীরের বন দিয়ে ঘেরা। মাঝখানটা একেবারে ঢালু। দীঘির একটু উপরেই একেপাশে পি. ডবলিউ. ডির একজোড়া কাঠের বাংলো। তারপর খাজিনাগের মন্দির, আর বস্তি ছাড়িয়ে একটু গেলেই ঐ কোণের দিকটায় গভর্ণমেণ্টের সার্কিট হাউস। সপ্তদশ শতাব্দীতে নির্মিত খাজিনাগের সুন্দর দারুময় মন্দিরটি অতীত ভারতের মণ্ডন শিল্পের এক অপূর্ব নিদর্শন।

খাজিয়ারকে অনেকে দ্বিতীয় গুলমার্গ বলে। কিন্তু কাশ্মীরের গুলমার্গে শুনেছি সরোবর ও মন্দির নেই।

ইরাবতীর তীরে চাম্বা শহর। দেবপ্রসাদ যে পথে গিয়েছিলেন সে পথে চার মাইলে চার হাজার ফুট নিচে নেমে চাম্বা। কাছি-টানা লোহার পুল পেরিয়ে শহরে ঢুকতে হয়। প্রবোধকুমার সান্যাল ডালহৌসির বাসে চেপে বানিখেতে নেমেছিলেন। সেখান থেকে মাইল তিরিশেক পথ গিয়েছিলেন বাসে। ইরাবতীর উপর

লছমনঝুলার মতো কাছি-টানা সাঁকো পেরিয়ে গান্ধী তোরণের নিচে দিয়ে শহরে ঢুকেছিলেন।

দেবপ্রসাদ বললেন : ইরাবতীর পুল পেরিয়ে খাড়া চড়াই ভেঙে অতি প্রাচীন এক তোরণের নিচে দিয়ে হরিরায়ের মন্দির। আর ডাকঘরের পাশ কাটিয়ে তবে এসে চাম্বার প্রধান পৌর এলাকায় পৌঁছতে হয়—চাম্বা দি চৌঘানের পাশে। সম্প্রতি এই প্রাচীন সিংহদ্বারের নামকরণ হয়েছে গান্ধী ফাটক। নদীর একেবারে পারে খাড়া কিনারায় এই চাম্বার চৌঘান কচি শ্যামল ঘাসে মোড়া—এককালে সামন্ত রাজাদের পোলো খেলার ময়দান ছিল। আধ মাইল লম্বা আর প্রায় গজ আশি চওড়া এই ময়দানটি যেন চাম্বার হৃৎপিণ্ড। সকাল সন্ধ্যায় মানুষের ভিড়, পরবের মেলা—

পিছনে আমি স্বাতির গলা শুনতে পেয়ে অন্যমনস্ক হয়ে গেলুম। স্বাতি বলছিল : গোপালদা এমন মনোযোগ দিয়ে শুনছে যে ও সব জায়গা না গিয়েও লিখতে পারবে।

দেবপ্রসাদ আমার অন্যমনস্কতা লক্ষ্য করে থেমে গেলেন। আমি বললুম : তারপর?

লজ্জিত ভাবে তিনি বললেন : আমি অনর্গল কথা বলে যাচ্ছি। আপনাদের হয়তো বিরক্তি বোধ হচ্ছে।

এ কথার উত্তর না দিয়ে আমি বললুম : প্রবোধবাবু চাম্বাকে বলেছেন চম্পাবতী।

দেবপ্রসাদ বললেন : ঐ রাজ্যের এক রাজকন্যার নাম হল চম্পাবতী। তাঁরই অনুরোধে রাজা তাঁর প্রাচীন রাজধানী ভ্রামর থেকে এইখানে সরিয়ে আনেন। চম্পাবতী ভালবেসেছিলেন একজন ভিনদেশী যুবককে। বোধহয় বিয়েও করেছিলেন। তারপর সেই যুবকের আকস্মিক মৃত্যুতে তার চিতার আগুনে ঝাঁপ দিয়ে জীবন বিসর্জন দেন।

চম্পাবতীর মন্দিরে এখন দুর্গার মূর্তি।

চাম্বায় আরও অনেক মন্দির আছে, আছে রাজাদের রঙ মহল, আর আজবঘর।

জ্বালামুখীর পথে চলতে চলতে দেবপ্রসাদ আমাকে তাঁর গল্প শুনিয়ে মুগ্ধ করেছিলেন। অনেক কথাই ভুলে গিয়েছিলুম। তারপর দেশে ফিরে এক দিন তিনি আমার সঙ্গে দেখা করেছিলেন, উপহার দিয়েছিলেন তাঁর নূতন গ্রন্থ 'অপরূপা চাম্বা'। এই অঞ্চলের কথা আমি তাঁর বই থেকেই টুকে দিলুম।

৩০

জ্বালামুখীর পথ তত মসৃণ নয়। মোটর বাসও নয় আরামদায়ক। তাই যখন জ্বালামুখীতে এসে বাস থামল, আমরা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচলুম। বাস থেকে নেমে মামা কোমরে হাত দিয়ে খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলেন। আমি তাকালুম সামনের পাহাড়ের দিকে। পাহাড়ের উপরে জ্বালামুখীর মন্দির, কিন্তু নিচে থেকে দেখা গেল না।

দেবপ্রসাদ তাঁর প্রিয় ভৃত্য অনিলের সঙ্গে নিজের জিনিসপত্র নামাচ্ছিলেন। ছাদ থেকে আমাদের মালপত্রও নামল।

আকাশে অপরাহ্নের রৌদ্র কিছু স্তিমিত হয়েছে। পাহাড়ে উঠতে হয়তো কষ্ট হবে না। কিন্তু তার আগে একটা আশ্রয়ের ব্যবস্থা করতে হবে। দেবপ্রসাদ পাণ্ডাদের অনুচরদের আমল দিলেন না। আমাকে বললেন: ধর্মশালায় যাওয়া যাক, কী বলেন?

এ কথার উত্তর দিল স্বাতি, বলল: পাণ্ডার বাড়ির চেয়ে ধর্মশালাই ভাল হবে।

মামী বললেন: আর কোন ভাল জায়গা নেই?

কে একজন বলল: আছে।

আছে! তবে সেইখানেই চল না।

সে এখান থেকে অনেক দূর। কয়েক মাইল। নাধোন নামে একটা জায়গায় বিপাশা নদীর তীরে ভাল রেস্টহাউস আছে।

মামা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন।

আমি বললুম: ধর্মশালাটা একবার দেখা যাক, যদি পছন্দ না হয়—

মামী বললেন: সে কি আর পছন্দ হবে!

না হয়, অন্য ব্যবস্থা করতে হবে।

অন্য ব্যবস্থা আর কী হবে!

স্বাতি বলল: পরের বাসেই ফিরে যাব।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত ফিরে যেতে হল না। যেখানে আমরা নেমে-

ছিলুম, তার প্রায় সামনেই ধর্মশালা। পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন পাকা দালান, খোলামেলা। অনেক ঘর, সবই প্রায় খালি পড়ে আছে। ভাল ঘর আমরা বেছে নিলুম। পরিষ্কার খাটও পাওয়া গেল। দেব-প্রসাদ আমাকে তাঁর ঘরে টেনে নিলেন।

আমরা যতক্ষণ এই সব ব্যবস্থায় ব্যস্ত ছিলুম, ততক্ষণে শ্রীমান অনিলচন্দ্র তার স্টোভ ধরিয়ে চায়ের জল গরম করে নামিয়ে ফেলে-ছিল। নানা রকমের পাত্রে চা পরিবেশন হতে দেখেও দেবপ্রসাদ খুশী হলেন না। বললেন ঃ শুধু চা!

অনিল বলল ঃ জলখাবার তৈরি হচ্ছে। আপনারা মুখ হাত ধুয়ে নিতে নিতেই দিতে পারব।

দেবপ্রসাদ নিশ্চিন্ত হলেন। কিন্তু লজ্জা পেলেন মামী। বললেন ঃ আর আমাদের রামখেলাওনকে দেখ। তার ব্যবস্থা কী হল, তাই জানবার জন্যে দাঁড়িয়ে আছে।

চায়ের পেয়ালায় চুমুক দিয়ে মামা বললেন ঃ তাতে লজ্জা পাবার কী আছে! আমাদের মতো তাদেরও তো কিছু করে খেতে হয় না। বাড়িতে ওদের সেজেগুজে থাকার কথা। সেই কাজটিই পারে।

ততক্ষণে রামখেলাওন অনিলের কাছে গিয়ে জুটেছে। বুঝতে পেরেছে যে তার বদনাম কিছু লাঘব করতে হলে অনিলের সাকরেদী করতে হবে।

হাত মুখ ধুয়ে ফিরে আসার পর আমাদের বিস্ময়ের সীমা রইল না। ভোজ্য বস্তুর আয়োজন দেখে এবারে দেবপ্রসাদও আশ্চর্য হলেন। রসদ সঙ্গেই ছিল, এবং বাকি জিনিস এখানেই জুটিয়ে এনেছে। এমন তৎপরতা কদাচিৎ দেখা যায়।

পরম লজ্জিত ভাবে মামী বললেন ঃ এ সব জিনিসপত্র আপনার সঙ্গেই থাকে?

দেবপ্রসাদ হেসে বললেন ঃ রাখতে হয়।

কেন?

এমন করে বাসে তো আমি চলি না। পাহাড়ে হাঁটতেই আমরা অভ্যস্ত। নিজেদের জিনিসপত্র না থাকলে এক-আধ জায়গায় অনাহারে কাটাতে হয়।

স্বাতি জিজ্ঞাসা করল ঃ হাঁটবার দরকার কী?

দেবপ্রসাদ বললেন ঃ দরকার কম, আসলে শখ।

ভারি অদ্ভুত শখ তো!

একবার এই শখে পেলে শখ মেটাতেই আপনাকে বারে বারে আসতে হবে।

মামা বললেন ঃ সবাই তাই বলে বটে।

খেয়েদেয়ে স্বাতি বেশ সুস্থ বোধ করল, বলল ঃ চল গোপালদা, এইবারে পাহাড়ে ওঠা যাক।

দেবপ্রসাদ লাফিয়ে উঠলেন।

মামা বললেন ঃ খেয়েদেয়ে কি এখন পূজো হবে?

মামী বললেন ঃ পাহাড়ের নামে ভয় পেলে নাকি?

তাহলে চল।

বলে মামা খাটিয়া থেকে উঠবার চেষ্টা করলেন।

স্বাতি তাঁকে রক্ষা করল। বলল ঃ এখন না পূজোর সময়, না আরতির। তোমরা মন্দিরে গিয়ে কী করবে! তার চেয়ে আমরা দেখে এসে সব খবর দিই।

মামা বললেন ঃ এই তো বুদ্ধিমতী মেয়ের কথা।

মামী উঠবার চেষ্টা করেন নি, বললেন ঃ বেশি দেরি ক'রো না যেন।

আমরা তিনজনে বেরিয়ে পড়লুম। দেবপ্রসাদের সঙ্গে আমি ও স্বাতি। সামনেই পাহাড়। কে একজন বলল যে এই পাহাড়ের নাম কালীধর। মন্দিরে উঠবার রাস্তা কাউকে চিনিয়ে দিতে হল না। আমার নিজেরাই চিনে নিয়ে উঠতে লাগলুম। এ পথে গাড়ি উঠবে

না, কোন যানবাহনই চলবে না। অশক্ত মানুষের জন্য হয়তো ডাণ্ডি ডুলির ব্যবস্থা হতে পারে।

পাহাড়ে উঠতে উঠতে স্বাতি বলল: জ্বালামুখী পীঠস্থান নয় গোপালদা?

আমি সংক্ষেপে বললুম: হ্যাঁ।

পীঠস্থানের কথায় দক্ষযজ্ঞ ও সতীর দেহত্যাগের কথা মনে পড়ে। দক্ষ প্রজাপতির রাজধানী ছিল হরিদ্বারে, সেইখানেই বিখ্যাত দক্ষযজ্ঞ হয়েছিল। একদা শিব তাঁর শ্বশুর দক্ষকে অপমান করেছিলেন। অপমান নয়, সম্মান করেন নি। দক্ষকে আসতে দেখে ব্রহ্মা ও বিষ্ণু উঠে দাঁড়িয়ে বলেছিলেন, আসুন আসুন। শিব নির্বিকার ভাবে বসে ছিলেন। এই রাগ। তাই নিজের যজ্ঞে জামাইকে নিমন্ত্রণ করলেন না। এত বড় যজ্ঞ, স্বর্গ মর্ত্য পাতালের সবাই নিমন্ত্রিত। সতী বললেন, আমিও যাব। কিন্তু নিমন্ত্রণ কোথায়! বাপের বাড়ি যাব, তার জন্যে আবার নিমন্ত্রণের কী দরকার। শিব বললেন, দরকার আছে। কিন্তু সতী যাবেনই, আবার স্বামীর মত নিয়েই যাবেন। তাই একে একে দশমহাবিদ্যার রূপ ধারণ করতে লাগলেন। শিব ভয় পেলেন, দু চোখ ঢেকে বললেন, আর নয়, তুমি যাও।

সেই সতী বাপের বাড়ি এসে প্রাণ ত্যাগ করলেন। এ ছাড়া আর অন্য উপায় ছিল না। তাঁর স্বামী বাঘছাল-পরা জটাজূটধারী সন্ন্যাসী, গলায় সাপ জড়িয়ে ষাঁড়ের পিঠে চড়ে ঘুরে বেড়ান। তাই বলে স্বামীর নিন্দা স্ত্রী হয়ে শুনতে হবে! সতীর মৃত্যুসংবাদ পৌঁছল কৈলাসে শিবের কাছে। শিব ক্ষেপে উঠলেন, তাঁর ক্রোধ থেকে বীরভদ্রের জন্ম হল। সেই বীরভদ্র দক্ষের মাথা কেটে যজ্ঞ পণ্ড করলেন।

শিবের ক্রোধ কমল, তিনি দক্ষের প্রাণ দিলেন। তারপর শোকে অধীর হয়ে সতীর দেহ কাঁধে করে পৃথিবী পরিক্রমা শুরু করলেন। দেবতারা প্রমাদ গুনলেন। বিষ্ণু এসে তাঁর সুদর্শনচক্র দিয়ে সতীর

দেহ খণ্ড খণ্ড করে কেটে ফেললেন। দেহের এক এক অংশ এক এক জায়গায় পড়ে এক একটি পীঠস্থান হল।

এই পাহাড়ের উপরে পড়েছিল সতীর জিহ্বা। আর শিব এখানে আছেন উন্মত্ত ভৈরব নামে।

আমার সংক্ষিপ্ত উত্তরে স্বাতি সন্তুষ্ট হয় নি। বলল : গোপালদাকে আজ বড় গম্ভীর দেখাচ্ছে।

দেবপ্রসাদ বললেন : বাসে আপনার কষ্ট হয়েছে বুঝি ?

বললুম : মন এখন অন্য দিকে। বাস থেকে যখন নেমেছিলুম, তখন অনেকে ছেঁকে ধরেছিল। এখন আর কাউকে দেখছি না।

আমার বাঙলা কথার হিন্দী উত্তর এল, একসঙ্গে সামনে ও পিছন থেকে : আমরা আছি বাবু।

আমরা সকলেই আশ্চর্য হলুম। একজন আমাদের আগে আগে চলছিল, আর দুজন পিছনে। এরা যে আমাদের সঙ্গেই চলেছে এতক্ষণ আমরা তা বুঝতে পারি নি। স্বাতি বলল : এবারে খুশী তো ?

দেবপ্রসাদ বললেন : আপনি বুঝি এদের পছন্দ করেন ?

অনেক প্রয়োজনীয় কথা জানা যায়।

বলে সামনের লোকটিকে ডাকলুম।

সে পিছিয়ে এসে প্রশ্নের অপেক্ষা করতে লাগল।

জিজ্ঞাসা করলুম : এই মন্দির কত পুরনো বলতে পার ?

আমার প্রশ্ন শুনে সে ভারি খুশী হল, বলল : অনেক পুরনো বাবু, সে একেবারে সত্য যুগের কথা।

বলে ভূমিচন্দ্র নামে এক রাজার গল্প শোনাল। সেই রাজা শুনেছিলেন যে এই পাহাড়ে সতীর জিহ্বা পড়েছে, এবং দেবতাদের তেজে তা জ্বলছে। তিনি সেই স্থান নির্ণয়ের জন্যে অনেক অনুসন্ধান করে ব্যর্থ হলেন। তারপর নগরকোটে একটি ছোট মন্দির নির্মাণ করলেন। এক দিন একজন গোয়ালা রাজাকে সংবাদ দিল যে সে

পাহাড়ের এক জায়গায় আগুন দেখেছে। রাজা এসে নিজেও তা দেখলেন, এবং সবই বুঝতে পারলেন। তখনই তিনি এই জ্বালামুখী মন্দির নির্মাণ করে দিলেন। পূজার জন্য তিনি তুজন ব্রাহ্মণ এনেছিলেন শাক দ্বীপ থেকে।

বক্তাকে আমরা ব্রাহ্মণ পাণ্ডা বলেই ধরে নিয়েছিলুম। এবারে সে ব্রাহ্মণের গৌরবের কথা জানাল। রাজা ভূমিচন্দ্র যে পূজারী ব্রাহ্মণদের এনেছিলেন, তাঁরা ভোজক ব্রহ্মণ, নাম পণ্ডিত শ্রীধর এবং পণ্ডিত কমলাপতি। তাঁদের বংশধরেরাই এখনও পূজা করছেন।

স্বাতি বলল : সেই সত্যযুগের মন্দির এখনও আছে!

ব্রাহ্মণ বলল : দ্বাপরে পঞ্চপাণ্ডব এসে এই মন্দির বড় করে যান।

তারপর ইতিহাসের গল্পও শোনাল। ফিরোজ তুঘলুক এই মন্দির ধ্বংস করতে এসেছিলেন। দেবীর মহিমায় লক্ষ মৌমাছি নাকি তাঁকে আক্রমণ করে সসৈন্যে তাড়িয়ে দেয়। আকবর বাদশাহ দেবীর মাহাত্ম্য দেখে এখানে একটি ছত্র নির্মাণ করে দিয়ে যান। ঔরঙ্গজেব বাদশাহ নাকি কাঙ্গড়া থেকেই পালিয়ে যেতে বাধ্য হন। মহারাজা রণজিৎ সিংহ এই মন্দিরের চূড়া সোনা দিয়ে মুড়ে দিয়েছেন।

ততক্ষণে আমরা মন্দিরের প্রাঙ্গণে এসে পৌঁছে গেছি।

মন্দিরের শিখর খুব উঁচু নয়, নিচু মন্দির। তেমন প্রাচীন বলেও মনে হল না। চারি দিক পরিচ্ছন্ন নির্জন পরিবেশ। তু একজন যাত্রী ঘুরে ঘুরে দেখছিলেন, তু একজন বেরিয়ে এলেন মূল মন্দির থেকে। ব্রাহ্মণের সঙ্গে আমরাও মন্দিরে গিয়ে ঢুকলুম।

মন্দিরের দেওয়ালে অনেক জায়গায় আগুনের শিখা জ্বলছে। মনে হল এ আগুন পাহাড়ের দেহ থেকে জ্বলছে। মন্দিরের মাঝখানে একটা ছোট কুণ্ড, তারও চারিধারে আগুন জ্বলছে। কোন মূর্তি নেই, কোন চিত্র নেই, কোন ঘট মঙ্গলকলস নেই। কোন অলঙ্কার আভরণ নেই, নেই কোন বিচিত্র বিজ্ঞাপন। ব্রাহ্মণ বললেন : এই দেবী জ্বালামুখী, এইখানেই প্রণাম করুন।

গম্ভীর ভাবে আমাদের হৃদয় পূর্ণ হল। নত হয়ে আমরা প্রণাম করলুম। কুণ্ডের জলে আগুন দেখিয়ে ব্রাহ্মণ আমাদের বিস্মিত করলেন। দেওয়ালের আগুন নিবিয়ে দিতেই আবার জ্বলে উঠছে। ব্রাহ্মণেরাই এ সব দেখাতে লাগলেন।

স্বাতি বলল : এই পাহাড়ে নিশ্চয়ই নানা রকমের গ্যাস আছে।

বললুম : সে আলোচনা থাক। বিজ্ঞানের চর্চা আমরা অন্যত্র করব।

স্বাতি আমার মুখের দিকে তাকাল।

আমি কাতর ভাবে বললুম : দেবতাকে আমরা ভালবাসি। বিশ্বাসে তা বাঁচতে দাও।

স্বাতি আর কোন কথা কইল না, দেবপ্রসাদও না।

ব্রাহ্মণ আমাদের আরও অনেক জায়গা দেখালেন, দূরের জিনিস কিছু দেখাও হল না, ধীরে ধীরে অন্ধকার নামছিল।

ব্রাহ্মণ বলছিল, বীর কুণ্ডকে নাকি যোগিনী খর্পর বলে। এই কুণ্ডে স্নান করে বন্ধ্যা নারীর সন্তান হয়েছে। সেজা ভবনে ভগবতীর চতুর্ভুজ ও অষ্টভুজ দু রকম মূর্তি আছে। উন্মত্ত ভৈরব রাধাকৃষ্ণ মন্দির শিবশক্তি লাল শিবালয় সিদ্ধ নাগার্জুন অম্বিকেশ্বর সীতারাম মন্দির কপিস্থল তারাদেবীর মন্দির অষ্টভুজী দেবী—এই সব এখানকার দর্শনীয় স্থান।

আমরা যখন নিচে নামছিলুম, তখন একজন গান গাইতে গাইতে উপরে উঠছিলেন। সরল হিন্দী বলে গানের কথাগুলি আমার মনে গাঁথা হয়ে গেল।—

চলো চলো সব মিলকর ভক্ত
মা জ্বালাকে স্থানকো।
আদি শক্তিকে দর্শন পাবেঁ
জীবন সুফল বনানকো॥

পরদিন সকালবেলায় মামা মামী পীঠস্থানে পূজা দিলেন। আর তারপরেই আমরা জ্বালামুখী ত্যাগ করলুম। দেবপ্রসাদ আরও কয়েক দিন এখানে থাকবেন। আরও ভাল করে দেখবেন এ অঞ্চলটা। পায়ে হেঁটে পাহাড়ের সৌন্দর্য আবিষ্কারে তাঁর আনন্দ, সেই আনন্দ পেতে হলে তাড়াহুড়ো করা চলে না। কয়েক ঘণ্টাতেই তাঁর সঙ্গে আমাদের আত্মীয়তার মতো সম্বন্ধ স্থাপিত হয়েছিল। বিচ্ছেদের বেদনা তাই আন্তরিক হল।

আমাদের মোটর বাস জ্বালামুখী থেকে ধরমশালা যাবে। থামবে কাঙ্গড়ায়। কাঙ্গড়া এখান থেকে একুশ মাইল দূরে। আমরা সেখানেই নামব। বজ্রেশ্বরীর পূজার্চনা করে অপরাহ্নে ধরমশালায় যাব। রাত কাটাব টুরিস্ট বাংলোয়। পাঠানকোটের টুরিস্ট অফিসার ব্যবস্থা করে দেবার দায়িত্ব নিয়েছিলেন।

এবারে আমার পাশে যে ভদ্রলোক বসে ছিলেন, তাঁকে আমি এই পথের সম্বন্ধে দু একটা কথা জিজ্ঞাসা করলুম। জলন্ধর থেকে জ্বালামুখী আসবার একটা সোজা পথ আছে কিনা সেই প্রশ্নের উত্তরে ভদ্রলোক বললেন: সে পথ তেমন ভাল নয়। বর্ষায় তা প্রায় বন্ধই থাকে।

তারপর সেই পথের বর্ণনা দিলেন: জলন্ধর থেকে হোসিয়ারপুর হয়ে ডেরা গোপীপুর আসে। মাঝখানে একটা চো আর বিপাশা নদী।

চো কী?

একটা শুকনো পাহাড়ী নদী, বর্ষায় জল আর অন্য সময় বালি। জলের তোড় বেশি হলেই বিপদ।

বললুম: বিপাশা নদীর উপরে নিশ্চয়ই পুল আছে!

না। খেয়ায় পারাপার। মানুষের মতো গাড়ি পারাপারেরও ব্যবস্থা আছে।

তবে তো ঝামেলা অনেক !

ভদ্রলোক বললেন : সেই জন্যেই লোকে পাঠানকোট হয়ে আসে। হয় বাসে কাঙ্গড়া হয়ে আসে, নয় ট্রেনে জ্বালামুখী রোড স্টেশনে এসে বাস ধরে।

কাঙ্গড়া শহরের দ্রষ্টব্য স্থানেরও কিছু কিছু পরিচয় পেলুম। বললেন : বজ্রেশ্বরীর মন্দির তো অবশ্যই দেখবেন, সময় পেলে কোট কাঙ্গড়ার ভিতরটাও দেখে নেবেন।

কোট কাঙ্গড়া কী ?

ভদ্রলোক এবারে ইংরেজীতে বললেন : কাঙ্গড়া ফোর্ট। কোট মানে দুর্গ। পাতাল ও বাণগঙ্গার মাঝখানে যে দোয়াব, তারই উপর দুর্গ, একেবারে দক্ষিণ-পশ্চিম প্রান্তে। লম্বায় যদি সাড়ে তিন হাজার ফুট হয় তো চওড়ায় এক শো থেকে এক হাজার ফুট। দুর্গের ভিতর যে সমস্ত সুন্দর বাড়ি ছিল, উনিশ শো পাঁচ সালের ভূমিকম্পে তার অনেকগুলিই ভেঙে পড়েছে। দুর্গের দেওয়ালও ভেঙে পড়েছে অনেক জায়গায়। ভিতরের মন্দিরটি ধ্বংস করে গেছে সুলতান মামুদ। রাজার প্রাসাদ আর কোষাগার ছিল ভিতরে। এখন দুটি সুন্দর বড় ঘর আছে, আর ছোট একটি সেনানিবাস। জাহাঙ্গীরের তৈরি একটি মসজিদের ধ্বংসাবশেষও দেখতে পাবেন।

স্বাতি বাধা দিল, বলল : গোপালদা, পথের শোভা কি এবারে দেখবে না বলে স্থির করেছ ?

পথের শোভার যে কোন পরিবর্তন দেখতে পাচ্ছি নে। সমস্ত পথই আমার কাছে এক রকম মনে হচ্ছে।

মামা আমাকে সমর্থন করে বললেন : সমস্ত পাহাড়ী শহরও আমার কাছে একই রকম মনে হয়।

মামী কী ভাবছিলেন, তিনিই জানেন। হঠাৎ বলে উঠলেন : সমস্ত তীর্থেরও অবস্থা একই রকম। দেবতায় বিশ্বাস লোকের ফুরিয়ে যাচ্ছে।

এ একটা বেদনার কথা। জ্বালামুখী মন্দিরে বুঝি মামী এ কথা অনুভব করেছিলেন। আমি কোন মন্তব্য করলুম না।

কিন্তু স্বাতি বলল : মানুষও সব একই রকম।

এবারে আমি বললুম : বোধ হয় না। পাহাড়ের মানুষের সঙ্গে সমতলের মানুষে অনেক প্রভেদ আছে। এ অঞ্চলের কাউকেই তেমন খারাপ মনে হচ্ছে না।

মামা বললেন : ঠিকই বলেছ। এ দিকের পাণ্ডাদেরও লোভ দেখলুম না। পয়সার জন্যে কেউ ছেঁড়াছেঁড়ি করল না।

কাঙ্গড়ায় গেলে বাণগঙ্গার ধারাটি চোখে পড়বেই। নীল জলের সরু স্রোতটি তার পাহাড়ের কোল বেয়ে বেয়ে চলেছে। কাঙ্গড়ার পাহাড়টি বেষ্টন করে আমরা শহরের দিকে চলে এলুম। আবার সেই বাস-স্টেশনে এসে গাড়ি থামল। আমরা নেমে পড়লুম। জিনিস-পত্রও নিলুম নামিয়ে।

মামা বললেন : এখন কী ব্যবস্থা হবে বল, কার জিম্মায় এই মালপত্র থাকবে ?

মামী বললেন : কেন, রামখেলাওন বসে পাহারা দিক না। এ ছাড়া ও আর কী পারবে !

মামী এ কথা নূতন উপলব্ধি করেছেন দেবপ্রসাদের ভৃত্য অনিলকে দেখে। এখনও তিনি অনিলের কর্মতৎপরতার কথা বিস্মৃত হন নি।

কুলীরা মালপত্র ওয়েটিং রুমের ভিতরে তুলে রাখল। বলল : নিশ্চিন্তে বেড়াতে যান। এ মাল কেউ ছোঁবে না।

মামী তবু রামখেলাওনকে বসিয়ে রাখলেন।

বেলা তখন অনেক হয়েছে। আকাশের দিকে চেয়ে মামা বললেন : আহারটা আগে সেরে নেবে নাকি ?

মামী ক্ষেপে উঠলেন, বললেন : ম্লেচ্ছ নাকি যে খেয়েদেয়ে মন্দিরে যাবে !

মামা বললেন : তবে আর কী, এখানেও এক রাত্রি বাস করি। কাল সকালবেলা মন্দির দর্শনে বেরনো যাবে।

মামী বললেন : মন্দির দর্শন করে ফিরে এসেও তো খাওয়া যায়। মন্দির এখান থেকে কত দূর?

বলে আমার দিকে তাকালেন।

স্বাতি বলল : তা দূর আছে বৈকি, পাহাড়ে খানিকটা উঠতে হবে।

মামী বললেন : তবে তোমরা খেয়ে নাও, আমি অপেক্ষা করি।

শেষ পর্যন্ত আমাকেই সমস্যার সমাধান করতে হল। মন্দিরে গিয়ে পূজোআর্চা করে ফিরতে আমাদের ঘণ্টাখানেক সময় লাগবে। ইতিমধ্যে এক হোটেলওয়ালা আমাদের জন্য স্পেশাল খানা তৈরি করবে—ভাল চালের ভাত ডাল তরকারি। চাটনি আর দই দেবে তার সঙ্গে। যাবার আগে আমরা এক গ্লাস করে শরবৎ খেয়ে যেতে পারি। জ্বালামুখী থেকে আমরা জলযোগ সেরে বেরিয়েছি, কাজেই শরবতে কোন দোষ হবে না।

মামী খুব খুশী হলেন, বললেন : তোমাদের একটু ধর্মজ্ঞান থাকলে আমার এমন দুঃখ থাকত না।

মামা চলতে চলতেই বললেন : সত্যিই তোমার বড় দুঃখ।

এক ছোকরা ব্রাহ্মণ আমাদের সঙ্গ নিয়েছিল। সে বলল : পাকা সড়ক ধরে গেলে সময় বেশি লাগবে, এই মাঠের ভিতর দিয়েই চলে আসুন।

এই ব্রাহ্মণটিই আমাকে মন্দিরের দূরত্ব বলেছে, হোটেলে স্পেশাল খানার পরামর্শ দিয়েছে, আর এখন চলেছে সঙ্গে সঙ্গে। এমন কোন দুষ্কর্ম করে নি যে তার উপর অসন্তুষ্ট হতে পারি; কিন্তু স্বাতি এবারে আমার দিকে তাকিয়ে হাসল। বুঝতে পারলুম যে এই ব্রাহ্মণকে আমি আগে চিনতে পারি নি বলেই এমন করে হাসল।

মাঠ পেরিয়ে একটুখানি উপরে উঠতেই আমরা মন্দিরের রাস্তায় পৌঁছে গেলুম। সদর রাস্তা দিয়ে গেলে অনেকটা পথ ঘুরে আমাদের

এইখানে আসতে হত। এই পথের দুধারেই দোকানপাট। কাশীর বিশ্বনাথ গলির মতো না হলেও বেশ জমজমাট পথ। নানা রকমের প্রয়োজনীয় ও শৌখিন জিনিসপত্র বিক্রি হচ্ছে। আমরা খুব ধীর পদক্ষেপে উপরে উঠতে লাগলুম। সামনে স্বাতি ও আমি, পিছনে মামা মামী। জ্বালামুখীর মতো এখানেও তাঁদের উঠতে কষ্ট হচ্ছে।

কিন্তু এই দীর্ঘ পথ অতিক্রম করে আসতে সুলতান মামুদের কষ্ট হয় নি, ফিরোজ তুঘলুকেরও না। শুনেছি খোঁড়া তৈমুরলঙ্গও খোঁড়াতে খোঁড়াতে এসেছিলেন। তাঁরা তীর্থের টানে আসেন নি, এসেছিলেন ধনরত্নের লোভে। প্রথম দুজন আশা মিটিয়ে লুণ্ঠন করে যত পেরেছেন নিয়ে গেছেন। ফেরিস্তা তার হিসাব লিখে রেখে গেছেন। কিন্তু তৈমুরলঙ্গের লুণ্ঠনের কথা জানা যায় নি। যুদ্ধ করে নগরকোটের রাজাকে পরাজিত করার কথাই ইতিহাসে লেখা আছে।

মন্দিরের পথ হঠাৎ বাম দিকে ঘুরে গেছে। খানিকটা এগিয়েই ব্রাহ্মণ থমকে দাঁড়াল। আমরা নিকটবর্তী হতেই জিজ্ঞাসা করল: মন্দিরের শোভা দেখবেন?

মন্দির দেখতেই তো এলুম।

মামা মামী তখনও এসে পৌঁছন নি। ব্রাহ্মণ বলল: তবে আমার সঙ্গে আর একটু উপরে আসুন।

বলে ডান হাতের একটা পথ ধরে ধাপে ধাপে উপরে উঠতে লাগল।

দুধারে দোকান নয়, ঘরবাড়ি। খানিকটা উপরে উঠেই বলল: এইখান থেকে দেখুন।

দেখলুম। এমন অপরূপ শোভা আগে কখনও দেখি নি। মনে হল যেন মন্দির মিলিয়ে আছে ধবলাধারের কোলে, যেন মন্দিরের পিছন থেকেই উঠেছে ধবলাধার। পাহাড়ে আজ তুষার নেই। সাদা নীল আর গৈরিকে যেন তপস্বীর বৈরাগ্য, লঘু মেঘ উত্তরীয়ের মতো জড়িয়ে আছে।

যেখানে আমরা দাঁড়িয়েছিলুম, সেইখানেই মন্দিরের দ্বার। প্রথমে একটি চতুষ্কোণ মন্দির, উপরে গম্বুজ, তারপরে আর দুটি গম্বুজওয়ালা মন্দির, সূর্যকিরণে সাদা ধবধব করছে। সকলের শেষের মন্দিরের সুউচ্চ শিখর ধবলাধারের দেহের একাংশ আড়াল করেছে। কাঙ্গড়া উপত্যকার কিছু অংশ দু পাশে দেখা যাচ্ছে।

খানিকক্ষণ আমরা নির্বাক বিস্ময়ে স্তব্ধ হয়ে দেখলুম। তারপর স্বাতি তার ক্যামেরা খুলল।

মামা মামী এসে মন্দিরের দরজায় দাঁড়িয়েছিলেন। ব্রাহ্মণকে আমি তাঁদের কাছে যেতে বললুম। তাঁরা দেবতার পূজা করবেন, আর আমরা দেখব সৌন্দর্য। কল্পনায় আমি ধবলাধারকে তুষারাচ্ছন্ন দেখলুম, আর ভাবলুম কেদারনাথের কথা। কেদারনাথে বোধ হয় পৃথিবীর সুন্দরতম মন্দির।

স্বাতির ছবি তোলা শেষ হলে আমরাও মন্দিরের প্রাঙ্গণে এলুম। ঘুরে ঘুরে সব কিছু দেখতে লাগলুম। এখানে প্রাচীন কিছু আছে বলে মনে হল না। শুনলুম যে উনিশ শো পাঁচ সালের ভূমিকম্পে সব ভেঙে গিয়েছিল। কাঙ্গড়া টেম্পল রেস্টোরেশন কমিটি আবার নূতন করে সব গড়ে তুলেছে। একদা মহারাজা রণজিৎ সিংহও এই মন্দিরের সংস্কার করেছিলেন। মন্দিরের একটি সোনার চূড়া বোধহয় তারই সাক্ষ্য দিচ্ছে।

মামা মামী একাধিক মন্দিরে পূজা দিলেন। আমরাও প্রণাম করলুম নানা স্থানে। যাত্রীদের ভিড় নেই। ব্রাহ্মণ বলল যে কাঙ্গড়ায় ভিড় হয় চৈত্র ও আশ্বিনের নবরাত্রিতে। তখন এই পাহাড়ী শহরটি অসংখ্য যাত্রীর আগমনে সরগরম হয়ে ওঠে। বজ্রেশ্বরীকে এরা মাতাদেবী বলে। দেবীকে আমরাও মা বলি।

এই ব্রাহ্মণের কাছেই আমরা আরও একটি তীর্থের কথা শুনলুম। বাণগঙ্গা নদীর তটে নন্দিকেশ্বর চামুণ্ডা ক্ষেত্র। সে এখান থেকে অনেক দূর।

৩২

মন্দির থেকে নেমে এসে অনেক বেলায় আমরা মধ্যাহ্নের আহার শেষ করলুম। যত যত্ন করে খাওয়াল, তার তুলনায় পয়সা অতি যৎসামান্য নিল। এ দেশে দেখলুম পয়সার মূল্য আছে। লোকেরা ঠকিয়ে কিছু নিতে চায় না।

এরই মধ্যে ধরমশালার আর একখানা বাস চলে গেছে। সেখানাও আমরা ধরতে পারি নি। এর পরের বাস বিকেলে আসবে, সন্ধ্যায় পৌঁছবে ধরমশালা। মামা বেশ উদ্বিগ্ন হয়েছিলেন: অন্ধকার হবে না তো?

কে একজন সান্ত্বনা দিয়ে বলল: না। অন্ধকার হবার আগেই পৌঁছে যাবেন।

বিকেলবেলায় জ্বালামুখী থেকে ধরমশালার বাস নির্দিষ্ট সময়ে না এসে এল কিছু পরে। মামা ব্যস্ত হয়ে উঠেছিলেন। কাঙ্গড়ায় থাকবার ভাল জায়গা আছে কিনা যাত্রীদের কাছে জানতে চাইছিলেন। ডাকবাংলো ও সিভিল রেস্টহাউস আছে শুনে আমার দিকে তাকিয়েছিলেন। কিছু উত্তর দেবার আগেই বাস এসে গেল।

এখানে অনেক যাত্রী নামে। কেউ বৈজনাথের দিকে যাবে, কেউ যাবে পাঠানকোটের দিকে। ধর্মশালার যাত্রীই গাড়িতে কম। আমরা স্বচ্ছন্দে উঠে বসলুম।

মামা গম্ভীর মুখে বললেন: কাজটা ভাল হল তো গোপাল?

বললুম: এগার মাইল পথ, আধঘণ্টার আগেই হয়তো পৌঁছে যাব।

মামা বললেন: আকাশের আলোও তো দেখছি কমে এসেছে।

মামী বিরক্ত ভাবে বললেন: এমন ভয় নিয়ে পথে বেরতে নেই।

স্বাতি বলল: বাস এখানে কতক্ষণ থামবে গোপালদা?

বাহিরের দিকে চেয়ে দেখলুম যে যাত্রীরা চা খেতে নেমেছে। বললুম : ওদের চা খাওয়া শেষ না হলে গাড়ি ছাড়বে না।

আমরা চা খাব না ?

মামী বললেন : সময় থাকে তো খেয়ে নাও না।

আমি আর অপেক্ষা করলুম না। চট করে নেমে পড়ে কয়েক পেয়ালা চায়ের হুকুম দিয়ে দিলুম। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই চা এসে গেল। চায়ে চুমুক দিয়ে স্বাতি বলল : শুধু চা !

বললুম : আরও কিছু চাই ?

স্বাতির নজর কোন্ দিকে আমি তা দেখতে পেয়েছি। কালকের সেই দোকানটায় পকোড়া ভাজা হচ্ছে। ওজন না করে এরা জিনিস বেচে না। দু-হাতা ওজন করে একটা কাগজের ঠোঙায় এনে তার হাতে দিলুম। চায়ের সঙ্গে খাওয়া যাবে না। গরম বেশি। কাজেই চা শেষ করে পেয়ালা ফিরিয়ে দিলুম।

চাঁট ঘুগনি পকোড়া খাওয়া মামী পছন্দ করেন না। বললেন : এ সব অখাদ্য তেলেভাজা যে কেন খাও বুঝি নে। বাড়িতে কি ভাল জিনিস জোটে না !

স্বতি বলল : এও তো ভাল জিনিস।

বাড়িতে করলে তো মুখে রোচে না।

মামা বললেন : ও রসে তো তুমি বঞ্চিত গিন্নী, ওর অনুপান তুমি যোগাবে কী করে ! ঐ টক ঐ ঝাল আর ঐ মসলা !

বাস ছেড়ে দিয়েছিল। আমি বুঝতে পেরেছিলুম যে এই জন্যেই মামার মন একটু প্রসন্ন হয়েছে। কিন্তু এই প্রসন্নতা বেশিক্ষণ রইল না।

একজন যাত্রী চেঁচিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন : ওপরের মালপত্র ভাল করে ঢেকেছ তো ?

আর একজন উত্তর দিলেন : তা ঢেকেছে।

মামা জিজ্ঞাসা করলেন : ব্যাপার কি গোপাল ?

স্বাতি বলল : বোধহয় গড়িয়ে পড়ে যাবার সম্ভাবনা আছে।

বললুম : তাহলে ভাল করে বাঁধত, ঢাকত না।

তবে কি বৃষ্টির ভয় পাচ্ছে!

বলতে বলতেই ধুলো উড়িয়ে হাওয়া উঠল। একটু আগেও ঝড়ের লক্ষণ আমরা দেখতে পাই নি। তাই আমাদের বিস্ময়ের অবধি রইল না।

তিন মাইল পথ অতিক্রম করে আমরা যখন গগ্‌গলের চৌরাস্তায় পৌঁছলুম, তখন ঘন মেঘে আকাশ আচ্ছন্ন হয়ে গেছে, অন্ধকার হয়ে এসেছে পৃথিবী। কিন্তু যাত্রীদের কারও মুখে দুশ্চিন্তার চিহ্ন দেখতে পেলুম না। যেন এই রকমটিই স্বাভাবিক, অস্বাভাবিক কোন কিছু ঘটে নি।

স্বাতি বলল : এই জন্যেই ওরা মালপত্র ঢাকাঢাকির কথা বলছিল।

ভয়ে ভয়ে মামা বললেন : পাহাড়ের বর্ষা শুনেছি বিপজ্জনক।

মামী বললেন : গাড়ি আটকে যাবে না তো!

কিন্তু গাড়ি আটকাবার কোন লক্ষণ দেখা গেল না। চৌরাস্তায় একটু দাঁড়িয়েই ধরমশালার পথ ধরল। চড়াই পথ। একবার বাঁয়ে, একবার ডাইনে ঘুরছে, আর শব্দ হচ্ছে গোঁ গোঁ করে। কাঙ্গড়া শহরের উচ্চতা আড়াই হাজার ফুটের কম, আর ধরমশালা সাড়ে চার হাজার ফুট। আট মাইলে এই দু হাজার ফুট পথ উঠবে।

অল্পক্ষণ পরেই ঝিরঝির করে বৃষ্টি নামল। যাত্রীদের মধ্যে দু একজন ভারি খুশী হয়ে উঠলেন। একজন বললেন : এতক্ষণে ধরমশালা যাচ্ছি বলে মনে হচ্ছে।

আমি আর নীরব থাকতে পারলুম না। জিজ্ঞাসা করলুম : কেন বলুন তো?

ভদ্রলোক বললেন : বৃষ্টি নেই অথচ ধরমশালা! এ কথা যে ভাবাই যায় না।

মানে, ধরমশালায় সারাক্ষণই বৃষ্টি হয়। এত বৃষ্টিপাত এ অঞ্চলের আর কোথাও হয় না।

মামা বললেন: সর্বনাশ! এই বৃষ্টির ভিতর আমরা দাঁড়াব কোথায়!

সে ভদ্রলোক এবারে আশ্বাস দিয়ে বললেন: কপাল নিতান্ত মন্দ না হলে বিপদে পড়বেন না। কোথায় থাকবেন আপনারা?

বললুম: টুরিস্ট বাংলোয়।

পাহাড়ের উপর সেই রাজার বাড়িটায়!

তা জানি নে।

নতুন একটা খুলেছে বৈকি। তা এই বৃষ্টির ভিতর পাহাড়ে উঠতে আপনাদের কষ্ট হবে।

তবে উপায়!

ভদ্রলোক পরামর্শ দিলেন: বাস-স্ট্যাণ্ডের কাছেই একটা রেস্ট-হাউস আছে। খালি পেলে সেখানেই ঢুকে পড়বেন।

মামা যেন আকাশের চাঁদ হাতে পেলেন, বললেন: সেই ভাল গোপাল। দরকার নেই তোমার রাজবাড়ির।

অন্ধকার তখন আরও ঘনিয়েছে, পথঘাট আর কিছুই দেখা যাচ্ছে না। কিন্তু ড্রাইভার নিশ্চিন্ত মনে হেড লাইটের আলোয় ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটেছে।

ধরমশালায় পৌঁছতে আমাদের বেশি সময় লাগল না। অল্পক্ষণ পরেই আমরা লোকালয় দেখতে পেলুম। সহযাত্রী সেই ভদ্রলোক বললেন: অন্যান্য পাহাড়ী শহরের সঙ্গে ধরমশালার তুলনা হয় না।

কেন?

আমরা যেখানে নামব তার নাম লোয়ার ধরমশালা। বাজার হাট সরকারী দপ্তর সব সেখানেই। সেখান থেকে সাড়ে পাঁচ মাইল উপরে আপার ধরমশালা। উঁচুতেও বেশি, প্রায় ছ হাজার ফুট।

প্রথমে কোর্ট কাছারী, তারপরে ম্যাকলিওডগঞ্জ, তারপরে ধরমশালা ক্যান্টনমেন্ট, সকলের শেষে ডাল লেক।

বললুম : ডাল লেক তো শুনেছি শ্রীনগরে!

ভদ্রলোক বললেন : এখানেও একটা লেক আছে। সেখানে যদি নাও যান তো ভগ্‌সুনাথে যাবেন।

সে আবার কী?

একটি কুণ্ডে কতগুলি ঝর্ণার জল এসে পড়েছে। ম্যাকলিওডগঞ্জ বাজার থেকে হেঁটে চলে যাবেন।

কথাবার্তা বেশিক্ষণ হল না। পথে দু একবার থামবার পরে বাস-স্ট্যাণ্ডেই পৌঁছে গেলুম। তখনও বৃষ্টি পড়ছে, কিন্তু মুষলধারে নয়। ইলশেগুঁড়ির মতো ঝিরঝিরে বৃষ্টি। শীত নেই বলে মন্দ লাগছে না।

শীত একেবারে নেই বললে ভুল হবে। কলকাতার শীতের মতো শীত। মামার আদেশে গরম কাপড় সঙ্গে নিতে হয়েছে। গায়ে সবাই চাদর জড়িয়ে নিয়েছিলুম। মামা বললেন : দেখছ তো, কোট নিলেই ভাল হত।

মামী বললেন : তুমি একাই গায়ে দিতে।

মামা বললেন : কেন, তোমাদের কি গরম বোধ হচ্ছে!

মামী এ কথার উত্তর না দিয়ে বললেন : বৃষ্টিতে না ভিজে এবারে এগোও তো।

ছাদের ত্রিপল সরিয়ে কুলীরা মাল নামাচ্ছিল। তাদের বললুম : সামনের রেস্টহাউসে চল।

ধরমশালার বাস-স্ট্যাণ্ড দেখছি একেবারে বাজারের উপরেই। পথে নেমেই দু ধারে দোকানপাট দেখতে পেলুম। উজ্জ্বল আলোয় চারিদিক ঝকঝক করছে। খানিকটা এগিয়েই রেস্টহাউস। কিন্তু সেখানে স্থানাভাব। সরকারী কর্মচারীরা দখল করে আছেন। কাজেই আর উপায় নেই। টুরিস্ট বাংলোতেই উঠতে হল।

বাজারের ধার থেকেই একটা নির্জন পথ পাহাড়ের উপরে উঠে

গেছে। দূরে দূরে বাতি, তাতে সমস্ত পথ ভাল আলোকিত হয় না। তারপর বৃষ্টিতে কী অবস্থা হয়েছে দেখা যাচ্ছে না। কুলীদের অনুসরণ করে আমরা সন্তর্পণে উপরে উঠতে লাগলুম।

মামা বললেন : এ জায়গায় না এলেই হত।

তা হয়তো হত, কিন্তু বললুম : লোকে এই শহরে থেকেই কাঙ্গড়া উপত্যকা দেখে। সমস্ত দ্রষ্টব্য জায়গাই এখান থেকে কাছে।

আমার উত্তর শুনে মামা বিরক্ত হলেন, বললেন : তবে আর কী, এই চেরাপুঞ্জিতেই থেকে যাই।

কিন্তু বেশিক্ষণ নয়, আমরা টুরিস্ট বাংলোর দরজাতেই পৌঁছে গেলুম। পরিষ্কার ঝকঝকে সুন্দর বাড়ি, অনেক ঘর, চারি দিকে আলো জ্বলছে। পাঠানকোটের টুরিস্ট অফিসারের কাছ থেকে কোন খবর আসে নি শুনেই মামা চটে উঠছিলেন, কিন্তু পরক্ষণেই থেমে গেলেন। যে লোকটি কথা কইছিল, সে বলল : তার জন্যে কোন অসুবিধা হবে না, ঘর খালি আছে।

একখানা নয়, দুখানা ঘরই পাওয়া গেল। প্রচুর আসবাবপত্র দেওয়া ঘর। মামীও প্রসন্ন হলেন। খাবার ব্যবস্থাও যে এখানে হতে পারে, লোকটি তারও আশ্বাস দিয়ে গেল।

খানিকক্ষণ পরেই লোকটি এক ট্রে চা এনে হাজির করল। তাই দেখে মামা সোজা হয়ে বসলেন, বললেন : বুঝলে গোপাল—

বাধা দিয়ে মামী বললেন : গোপাল বুঝেছে।

চা তৈরি করবার জন্যে স্বাতি এগিয়ে এল।

মামা তাঁর পকেট থেকে তামাকের পাউচ আর পাইপ বার করলেন। বললেন : অনেকক্ষণ পরে তামাকটা ভাল জমবে।

চা খেয়ে স্বাতি একবার চার ধারটা ঘুরে এল। বলল : বুঝলে গোপালদা, ভাল লাউঞ্জ আছে কিনা পর্দা সরিয়ে দেখবার সাহস হল না। কিন্তু একটা ভাল ডাইনিং হল আছে। আর এক ভদ্রলোককে

দেখলুম টেবিলের উপর একটা বড় ম্যাপ বিছিয়ে গভীর মনোযোগে কী দেখছেন। বাইরের জীপ গাড়িখানা বোধহয় তাঁরই।

আমি জিজ্ঞাসা করলুম : মেজাজটা কেমন ?

স্বাতি বলল : তাকাচ্ছেই না কোন দিকে। আপন মনে ম্যাপ দেখছে আর চুরট টানছে।

কেউ শুনতে না পান এমনি ভাবে বললুম : খুব বেরসিক তো !

স্বাতি বলল : চল না একবার দেখে আসবে।

স্বাতির উদ্দেশ্য আমি বুঝি। এই ভদ্রলোকের কাছে যে এ অঞ্চলের অনেক সংবাদ পাওয়া যাবে তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু একা তাকে প্রশ্ন করতে সঙ্কোচ বোধ করেছে। আমার সাহায্য তার চাই। বললুম : আমাদের ম্যাপট্যাপগুলো সঙ্গে নাও না।

কী হবে ও সবে ?

বললুম : ওখানেই তা দেখতে পাবে।

আমরাও দুখানা চেয়ার দখল করে টেবিলের উপর ম্যাপ খুলে বসলুম। বইএর পিছনে আঁটা ছোট ম্যাপ। তার উপর হুমড়ি খেয়ে না পড়লে দুজনে দেখা যায় না। আমি ইংরেজীতে স্বাতিকে বললুম : একখানা ফিজিকাল ম্যাপ থাকলে এ অঞ্চল সম্বন্ধে কিছু ধারণা হত।

স্বাতি আমার দিকে চেয়ে প্রথমে হাসল, তারপরে ইংরেজীতে উত্তর দিল : নেই যখন তখন এতেই কাজ চালাতে হবে।

যে ভদ্রলোককে শুনিয়ে শুনিয়ে আমরা কথা বলছিলুম, মুখ তুলে দেখলুম যে তিনি আমাদের দিকে তাকিয়ে আছেন। আমাকে তাকাতে দেখে বাঙলায় বললেন : এই ম্যাপখানা কাজে লাগবে ?

ভদ্রলোকের মুখে বাঙলা শুনে স্বাতি আশ্চর্য হল আমার চেয়ে বেশি। লজ্জাও পেল। আমি বললুম : না না, আপনি এখন দেখছেন—

দেখুন না আপনারা।

বলে ভদ্রলোক আমাদের সামনে সরিয়ে দিলেন।

এখানা ভারতবর্ষের রোডম্যাপ। সমস্ত পথঘাট ভাল করে দেখানো আছে। মানচিত্রের উপর একটু চোখ বুলিয়ে নিয়ে স্বাতিকে বললুম : এই হল ধরমশালা, এখান থেকে কাল আমরা বৈজনাথ যাচ্ছি। তারপর কুলু।

স্বাতি বলল : কুলু যাবার সোজা রাস্তা নেই তো! মণ্ডি হয়েই যেতে হবে।

ভদ্রলোক নীরবে চুরট টানছিলেন। আমি এবারে তাঁকে জিজ্ঞাসা করলুম : আপনি কি পাঠানকোটের দিক থেকে আসছেন?

ঠোঁট থেকে চুরট সরিয়ে ভদ্রলোক বললেন : না।

ভদ্রলোকের এই সংক্ষিপ্ত উত্তরে আমি তাঁকে আলাপবিমুখ ভাবলুম। কিন্তু তারপরেই মনে পড়ল যে তিনি নিজে থেকেই আলাপ করেছেন। কাজেই একটু যাচাই করে নেবার জন্যে বললুম : তবে?

ভদ্রলোক বললেন : ফিরে যাচ্ছি।

তারপরেই প্রশ্ন করলেন : আপনারা?

স্বাতি বলল : আমরা কুলু উপত্যকার দিকে যাচ্ছি।

সঙ্গে গাড়ি আছে তো?

বললুম : না।

তাহলে কি বাসে যাবেন ভাবছেন?

বাসে ছাড়া আর উপায় নেই।

তবে খুবই কষ্ট হবে। কুলুর রাস্তা তেমন ভাল নয়।

বললুম : আমরাও তা শুনেছি। কিন্তু বাস যখন চলে তখন গন্তব্যস্থলে নিশ্চয়ই পৌঁছতে পারব।

তা পারবেন। কিন্তু গন্তব্যস্থলটা তো বড় নয়, বড় হল পথের সৌন্দর্য। পথের কষ্টে সে সৌন্দর্য আপনারা উপভোগ করতে পারবেন না।

ঠিক এই সময়ে ভদ্রলোকের কফি এল। বললেন : একটু কফি খান।

স্বাতি তাড়াতাড়ি বলল : ধন্যবাদ। এইমাত্র আমরা চা খেয়েছি।

উত্তরে ভদ্রলোক একটা চুরট আমার দিকে এগিয়ে দিলেন। এবারে আমি ধন্যবাদ দিলুম, বললুম : খাই নে।

উভয় পক্ষই ভদ্রতা করেছি। পরিচয়ের বাধা আর আমাদের রইল না। আমি আমাদের পরিচয় দিলুম, আর ভদ্রলোক দিলেন তাঁর নিজের পরিচয়।

মিস্টার ঘোষ ভারত সরকারের একজন পদস্থ কর্মচারী। লাহৌল ও স্পিতি উপত্যকায় উন্নয়ন কার্য চলছে। কিন্তু তার গতি মন্থর। পাঞ্জাব সরকার যে অর্থব্যয় করছেন, তার পরিমাণও অল্প। কেন্দ্র থেকে সাহায্য না পেলে এই সব অঞ্চলের উন্নয়ন পরিকল্পনা যথাযথ পরিচালিত হচ্ছে না। মিস্টার ঘোষ এই অঞ্চলে কিছু দিন কাটিয়ে মোটামুটি একটা ধারণা নিয়ে দিল্লী ফিরে যাচ্ছেন।

স্বাতি আমার দিকে তাকাল। আমি তার ইঙ্গিত বুঝতে পারলুম। শুধু কুলু নয়, লাহৌল ও স্পিতি সম্বন্ধেও অনেক কিছু এই ভদ্রলোকের কাছে জানা যাবে। তার জন্য এই প্রসঙ্গের অবতারণা করতে হবে নিপুণ ভাবে। আমি স্বাতির দিকে তাকিয়ে তাকেই এই কাজে নিযুক্ত করলুম।

মিস্টার ঘোষের কাছে আমরা এ অঞ্চলের অনেক কথা জানতে পারলুম। চোখে না দেখলে এ সব কথা আমাদের কোন দিনই জানা হত না।

স্বাতি বলল ঃ কাল আমরা বৈজনাথে যাব, তারপরে আর এগনো সম্ভব হবে কিনা জানি না।

ভদ্রলোক একবার তাঁর ঘড়িতে সময় দেখলেন, তারপর কফির পেয়ালাটা শেষ করে বললেন ঃ ম্যাপে বৈজনাথ জায়গাটা দেখুন। চার হাজার ফুটের কিছু বেশি উঁচু। তারপর ঘাট্টা পর্যন্ত তিন মাইল পথ ক্রমাগত উপরে উঠেছে। পাহাড়ের অপর দিকে মণ্ডি রাজ্য, সে এখন হিমাচল প্রদেশের অন্তর্গত।

বৈজনাথেই কাঙ্গড়া উপত্যকার শেষ দেখতে পাবেন, যোগীন্দ্রনগর সেখান থেকে পনর মাইল, অনেকে একটা নতুন জিনিস দেখবার লোভে সেখানে যায়।

নতুন কী জিনিস?

একটা হলেজ ওয়ে। পাহাড়ের এ পাশে জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের পাওয়ার হাউস, ও পাশে জলের বিরাট আধার। একটা পনর হাজার ফুট টানেল দিয়ে সেই জল পাওয়ার হাউসে আসছে। হলেজ ওয়ে হল সেই আট হাজার ফুট পাহাড়টা অতিক্রম করবার জন্য। লোহার রেলের উপর দিয়ে ইলেকট্রিকে ট্রলি চলাচল করে। ইচ্ছা করলে আপনারাও চড়তে পারবেন। তবে কর্তৃপক্ষ যেই আপনাদের স্ট্যাম্প্‌ড্‌ কাগজে ইন্‌ডেম্‌নিটি বণ্ড সই করতে বলবেন অমনি আপনারা ভয় পেয়ে যাবেন। যদি ভয় না পান তো সেই দুরন্ত চড়াইএ বিপদের কোন সম্ভাবনা নেই। পাহাড়ের মাথায় উঠে শোভা দেখে মুগ্ধ হয়ে যাবেন।

এই যোগীন্দ্রনগর, এর পর মণ্ডি শহর পঁয়ত্রিশ মাইল দক্ষিণে

বিপাশার তীরে। সমুদ্রতল থেকে প্রায় আড়াই হাজার ফুটে এই শহরটিই হিমাচল প্রদেশের প্রধান শহর, মণ্ডি রাজ্যের রাজধানী।

শহরে কোন বিশেষ দ্রষ্টব্য নেই ?

পাহাড়ী শহর যেমন হয়ে থাকে তেমনি। একটু যেন তিব্বত ঘেঁষা। বিপাশার পুল পেরিয়ে শহরে ঢুকবার সময়েই এ কথা আপনার মনে হবে। ঘণ্টা ঘরের গড়নই তিব্বতী ধরনে কোনা-তোলা। তবে মণ্ডির পথে দুটো নুনের খনি দেখতে পাবেন। বিপাশার তীরে মোটরের নূতন পথ হবার আগে ঐ নুনের খনির পাশ দিয়েই কুলু যাবার পথ ছিল দুটো—ভুবু পাস হয়ে আর ডুলচি পাস হয়ে। সে হাঁটা পথ। কিন্তু কিছুদিন আগেও কুলু যাবার অন্য পথ আর ছিল না।

এখন আমরা যে পথে যাই সে পথ আপনাদের কাছে স্বপ্নের মতো মনে হবে—স্বপ্নের মতো সুন্দর ও ভয়ঙ্কর। চোখ মেলে গেলে জেগে আছেন বলে বিশ্বাস করতে কষ্ট হবে।

কেন ?

মণ্ডি থেকে লারজি পর্যন্ত পঁচিশ মাইল বিপাশার দুই তীরেই কঠিন পাহাড় খাড়া উঠেছে হাজার ফুটেরও বেশি। এখানে কোন পথ হতে পারে এ কথা আগে কেউ কল্পনাও করতে পারে নি। এখন যে সংকীর্ণ অসমতল পথ তৈরি হয়েছে, তার উপরেও স্থানে স্থানে পাহাড় আছে। বিপাশার তীরে তীরে এঁকেবেঁকে সেই পথ চলেছে। একটি গাড়ি চলবার মতো পথ, তাই ওয়ান ওয়ে ট্রাফিক। একটু অসাবধান হলেই গাড়ি বিপাশার জলে পড়ে যাবে।

ভয়ে ভয়ে স্বাতি বলল : বাবাকে এ কথা বলো না।

আমি হাসলুম তার ভয় দেখে।

মিস্টার ঘোষ বললেন : আউট নামে একটা জায়গা থেকে উপত্যকা প্রশস্ত হয়েছে। তবে কাঙ্গড়ার মতো প্রশস্ত নয়। নদীর এধারে ওধারে উপত্যকা এক থেকে দু মাইল।

মণ্ডি থেকে কুলুর দূরত্ব মোট তেতাল্লিশ মাইল। তার মধ্যে পঁচিশ মাইল পথ আপনারা অতিক্রম করেছেন। এবারে এই কুলু উপত্যকার সৌন্দর্য উপভোগ করতে করতে যান। সাহেবেরা চাম্বাকে বলে ভ্যালি অব মিল্ক অ্যাণ্ড হানি, আর কুলুকে বলে ভ্যালি অব গড্‌স্। দশেরার সময় গেলে আপনারাও এই কথা বলবেন।

কুলু পৌঁছবার আগে বাজৌরার মন্দিরটি দেখে নেবেন। বশেশর মহাদেবের মন্দির। গাড়ি থেকে নেমে বিপাশা নদীর দিকে খানিকটা যেতে হবে। লোকে এই সংরক্ষিত মন্দিরটির কারুকার্য দেখে মুগ্ধ হয়। স্থাপত্য বিদ্যায় আমার অধিকার নেই, এক নজরে আমার এই মন্দিরটিকে উড়িষ্যার মন্দিরের মতো মনে হয়েছে। জগমোহন নাটমন্দির নেই, মন্দিরের শিখরটি শুধু উড়িষ্যার মন্দিরের দেউলের মতো মনে হয়েছে।

ভদ্রলোক একটু থামলেন।

আমি বললুম : তারপরেই বোধহয় কুলু।

ভদ্রলোক সংক্ষেপে বললেন : হ্যাঁ।

স্বাতি বলল : দেখবার কী আছে বলুন।

কিছু দেখবার আছে কিনা তাই ভাবছি।

সে কী কথা!

দেখবার কিছু নেই বললে বিশ্বাস করবেন না, তাই ভাবছি কী বলব। একটা ছোট সাবডিভিসনাল হেড কোয়ার্টারে যা থাকা উচিত তা আছে সুলতানপুর নামে একটা জায়গায়—অফিস কাছারি হাসপাতাল রেস্টহাউস। সেখান থেকে মাইল দেড়েক দূরে আখারা বাজার। চারি দিকের গ্রাম থেকে লোকেরা সেখানেই বাজার করতে আসে। আর—

হ্যাঁ বলুন।

আর একখানা মস্ত সবুজ মাঠ বিপাশার তীর থেকে পাহাড় পর্যন্ত বিস্তৃত।

স্বাতি হেসে ফেলেছিল। তাই দেখে মিস্টার ঘোষ বললেন: আপনি হাসবেন না। ঐ ময়দানটিই হল কুলুর প্রাণ, কুলুর কর্তৃপক্ষ তাই সেটাকে সযত্নে বাঁচিয়ে রেখেছেন। বড় বাড়ি করতে দেন না। সমুদ্রসমতল থেকে চার হাজার ফুট উঁচু এই জায়গায় বৃষ্টিপাত হয় প্রায় চল্লিশ ইঞ্চি। শীতে ও বর্ষায় দুবার বৃষ্টিপাত হয়।

স্বাতি বলল: মাঠে কী হয় বললেন না?

মাঠে সারা বছর গরু চরে, আর দশেরার সময় হয় কুলুর শ্রেষ্ঠ উৎসব।

কুলুর দশেরা আপনি দেখেছেন?

মিস্টার ঘোষ হেসে বললেন: একবার দেখেছি।

স্বাতি ভারি প্রফুল্ল হল, বলল: তবে তো আপনার কাছেই গল্পটা শোনা যাবে।

মিস্টার ঘোষ বললেন: না দেখলে এই উৎসব সম্বন্ধে সঠিক ধারণা হয় না। শুধু কুলু কেন, মনে হয় সমস্ত হিমালয়ের এটা উৎসব। বিরাট মেলা, ক্রেতা ও বিক্রেতা আসে নানা দেশ থেকে—পশমের জিনিস আসে লাডাখ ও ইয়ারখন্দ থেকেও। আসে টুইড শাল আর কুলুর টুপি। আর আসে সমস্ত উপত্যকা থেকে গ্রামের দেবতা। সুসজ্জিত পালকিতে চেপে বিচিত্র সব দেবতার সমাবেশ। বিচিত্র বাদ্যযন্ত্র, কথাবার্তা নৃত্যগীত সবই বিচিত্র।

তারপরেই আমাকে বললেন: আপনার কুলু কাঙ্গড়ার বইটা দেখি।

সরকারী গাইড বইখানা আমি এগিয়ে দিলুম।

মিস্টার ঘোষ বললেন: কুলুর দশেরার কিছু বর্ণনা এখানে আছে। বলে খানিকটা পড়ে শোনালেন। বাঙলায় তার মানে এই রকম।

মেলার একধারে হয়তো দেখবেন যে এক দেবতার পালকি ভীষণ ভাবে দুলছে, আর তার বাহকেরা আপ্রাণ চেষ্টা করেও পালকিকে কাঁধের উপর স্থির রাখতে পারছে না। সবাই বুঝতে পারছে যে

দেবতা রেগে গেছেন, অথবা কোন ভবিষ্যৎবাণী করবেন। সেই দেবতার পুরোহিত অমনি কাছে এসে পালকির ঢাকা ছুঁতেই তার উপর দেবতার ভর হবে। প্রথমে সে বিড়বিড় করে কথা কইবে, তারপরে তার কথা বোঝা যাবে। দেশের লোকেরা খারাপ হয়ে গেছে বলে এবারে বৃষ্টি নামবে দেরীতে, কিংবা আগের চেয়ে বন্যা হবে ভয়াবহ। ভিড়ের মধ্যে থেকে কেউ হয়তো চেঁচিয়ে জিজ্ঞেস করে, বারে বারে আমার নতুন বাড়ির ছাদ ভেঙে পড়ছে কেন, কবে আমি বাড়িটা সম্পূর্ণ করতে পারব? পুরোহিতের কাছ থেকে তখনই উত্তর পাওয়া যায়, মন্দির থেকে তোমার বাপ যে আধ সের পেরেক চুরি করেছিল তা ফিরিয়ে দিলেই পারবে।

ভারি মজার ব্যাপার তো!

লোকেরা সব বাড়িতে তৈরি করা মদ নিয়ে আসে। সেই মদ খেয়ে মেয়ে পুরুষের কী উল্লাস!

স্বাতি জিজ্ঞাসা করল: আপনি ওদের নাচ দেখেছেন?

কুলুর মেলায় উপস্থিত হলে সবই দেখতে পাওয়া যায়। এ অঞ্চলের লোক যে শুধু দশেরায় নাচে তা নয়, নানান ঋতুতে এদের নানান রকমের নাচ। চাম্বায় এবং আরও উত্তরে শুনেছি যে লোকেরা নাচবার জন্যেই নাচে। আমার তো মনে হয় শীতপ্রধান দেশে লোকে শারীরিক প্রয়োজনে নাচে।

বললুম: তা না হলে হয়তো শরীর আড়ষ্ট হয়ে থাকবে।

স্বাতি বলল: এই সব নাচের কোন নাম আছে?

মিস্টার ঘোষ স্বীকার করলেন: জানি নে। তবে আপনাদের বোধহয় ১৯৫৪ সালের কথা মনে আছে। এ অঞ্চলের একদল গদ্দি মেয়েপুরুষ দিল্লীতে নেচে ফোক ডান্সের ন্যাশনাল ট্রফি নিয়ে গেল। সেই মেয়েরা নাকি নিজেদের গ্রামের বাইরে কখনও যায় নি।

সত্যি!

তাইতো শুনেছি।

এর পরে খানিকক্ষণ নীরবে কাটল।

আমি তাঁকে খেই ধরিয়ে দেবার জন্য বললুম ঃ কুলুর পরে তো মানালি!

মিস্টার ঘোষ বললেন ঃ এ উপত্যকায় আরও অনেক জায়গা আছে, রায়সন কাটরাইন নাগর চান্দেরখনি মালানা কোটি মণিকরণ কাসধার। সব জায়গাতেই কিছু না কিছু দর্শনীয় স্থান আছে। রায়সন ও কাটরাইনে ফলের বাগান দেখবেন, কাটরাইনে একটা ট্রাউট মাছের হ্যাচারিও আছে। সেখানেই নদীর পরপারে প্রায় হাজার ফুট উঁচুতে নাগর। নাগরে দু তিনটে মন্দির আছে। এক মন্দিরে প্রবাদ আছে যে একটা সুড়ঙ্গ পথে পার্বতী উপত্যকার মণিকরণের সঙ্গে যোগাযোগ ছিল। একজন সাধু রোজ মণিকরণের উষ্ণ প্রস্রবণে স্নান করতে যেতেন। ১৯০৫ সালের ভূমিকম্পে এই সুড়ঙ্গের মুখ বন্ধ হয়ে গেছে। নাগরে এক প্রাসাদ আছে, এখন সেখানে রেস্টহাউস হয়েছে। কিন্তু খবরদার! একটা ঘরে কিছুতেই থাকবেন না! রাজার অবিশ্বাসের জন্যে তাঁর রাণী নিচে ঝাঁপিয়ে পড়ে আত্মহত্যা করেছিলেন, সেই রাণী এখন ভূত হয়ে সেই ঘরে থাকেন।

স্বাতি খিলখিল করে হেসে উঠল।

খুশী হয়ে ভদ্রলোক বললেন ঃ আর আছে রাশিয়ান শিল্পী রোয়রিখের সম্পত্তি। রুশবিপ্লবের সময় তিনি নাকি এদেশে আশ্রয় নিয়েছিলেন। শুনতে পাই, আমাদের বিখ্যাত চিত্রতারকা দেবীকারাণী নাকি তাঁর পুত্রকে দ্বিতীয় পক্ষে বিবাহ করেছেন।

সংবাদটা আমি কোথাও পড়েছিলাম বলে মনে হল।

মিস্টার ঘোষ বললেন ঃ পথ খারাপ না হলে আমি আপনাদের একবার চান্দেরখনি থেকে মালানা যেতে বলতাম। সে একটা নতুন জগৎ বলে আপনাদের মনে হত। নাগর থেকেই একটা সরু পথ বনের ভিতর দিয়ে গুজরদের গ্রাম চান্দেরখনি গেছে। তারপর

একটা পাস পেরিয়ে তিন হাজার ফুট নিচে মালানা। খুব সাবধানে পা ফেলে ফেলে নামতে হয়। এ পথের প্রাকৃতিক দৃশ্য যেমন অপরূপ, মানুষও তেমনি আদিম। মাঠের মধ্যে একখানা পাথরকে তারা জমলু দেবতা বলে, আর নিজেদের বলে তাঁর প্রজা। জমলুর চেয়ে বড় দেবতা নাকি গোটা কুলু উপত্যকায় নেই। একটা দরজাহীন ঘরে তারা দেবতার নামে কত ধনরত্ন জমিয়েছে তার হিসেব নেই। ওদের জীবনযাত্রা গল্পের মতো মনে হবে, না দেখলে বিশ্বাস করতে পারবেন না।

তারপর মানালি। কুলু থেকে মাত্র তেইশ মাইল। আগে এই পর্যন্ত পথ ছিল, এখন রোটাং পাস দিয়ে লাহৌল উপত্যকায় যাবার জন্যে কোটি পর্যন্ত পথ তৈরি হয়েছে। প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের ভক্ত হলে দু এক দিন মানালিতে থাকতে পারেন। এক দিকে বিপাশা, আর এক দিকে মানালসু নদী, ফলের বাগান আর বরফের পাহাড়। হাসপাতাল পোস্টঅফিস আছে, রেস্টহাউস বোর্ডিংহাউস আছে, আর কিছু দূরে আছে হিড়িম্বার মন্দির। কুলুতে রঘুনাথজীর পরেই হিড়িম্বার স্থান।

স্বাতি বলে উঠল : হিড়িম্বা তো রাক্ষসী, তার আবার মন্দির কেন ?

মিস্টার ঘোষ হেসে বললেন : মহাভারতে হিড়িম্বার গল্প মনে নেই ! পঞ্চপাণ্ডব যখন এ অঞ্চলে আসেন বনবাসে, তখন হিড়িম্বার ভাই সবাইকে খেয়ে ফেলবার মতলব এঁটেছিল। কিন্তু হিড়িম্বার ভাল লেগেছিল ভীমকে। সুন্দরী নারীর রূপ ধারণ করে হিড়িম্বা সব কথা ভীমকে বলে পঞ্চপাণ্ডবকে রক্ষা করেছিল। কৃতজ্ঞতায় ভীম তাকে বিয়ে করেছিল। তারপরেও হিড়িম্বাকে আপনি রাক্ষসী বলবেন ?

স্বাতি খিলখিল করে হেসে উঠল।

মিস্টার ঘোষও হেসে বললেন : যদি পাহাড়ে উঠতে ভালবাসেন তাহলে ঝিন্না রাণার দুর্গে উঠবেন, মাত্র এগার হাজার ফুট উঁচু।

সর্বনাশ !

ভয় পেয়ে গেলেন ! তবে বশিষ্ঠ কুণ্ডে যাবেন মাইল দুয়েক দূরে। গন্ধকের উষ্ণ প্রস্রবণ। আর একটু উপরে লেক, যেখানে ভৃগু মুনি তপস্যা করেছিলেন। রোটাং পাসের কাছে আর একটা পাহাড়ের নাম নাকি ব্যাসঋষি। এইখানেই কোথাও বিপাশা নদীর উৎপত্তি-স্থল।

পুরাণের কথা আমার মনে পড়ল। বশিষ্ঠকে পাশমুক্ত করেই নদীর নাম বিপাশা হয়েছে। বিশ্বামিত্র বশিষ্ঠের শত পুত্র বিনাশ করেছিলেন। শোকার্ত পিতা প্রাণবিসর্জনের জন্য পাহাড় থেকে ঝাঁপ দেন, কিন্তু তাতে তাঁর মৃত্যু হয় না। পরে নিজেকে পাশবদ্ধ করে নদীতে ঝাঁপ দেন। নদী তাঁকে পাশমুক্ত করে কূলে পৌঁছে দেয়। বশিষ্ঠ তাই নদীর নাম দেন বিপাশা। বিপাশাই এই কুলু উপত্যকার প্রাণ।

স্বাতি ভেবেছিল, কুলু উপত্যকার কাহিনী বুঝি শেষ হয়ে গেছে। তাই বলল ঃ আপনি যে কাজে এসেছিলেন, তার সম্বন্ধে কিছু বলবেন না ?

মিস্টার ঘোষ বললেন ঃ তার আগে পার্বতী উপত্যকার মণিকরণের গল্প বলি।

আমি এই উপত্যকার নাম আগে শুনি নি।

মিস্টার ঘোষ বললেন ঃ কুলুর কাছেই পার্বতীর নদীর তীরে মণিকরণ। একটি উষ্ণ প্রস্রবণের জন্য বিখ্যাত। নানা রকমের রোগ সারে বলে বহু লোকের যাতায়াত। কিছু কৌতুকও হয়। যাত্রীরা গরম জলে ভাত রাঁধে, তরকারি রাঁধে, রুটিও সেঁকে, সে এক অদ্ভুত ব্যাপার। স্থানীয় লোকেরা এই প্রস্রবণের উৎপত্তির সম্বন্ধে একটি গল্প বলে। একদা শিবের সঙ্গে পার্বতী এই উপত্যকায় যখন বেড়াচ্ছিলেন, তখন পার্বতীর কান থেকে একটি মণিকুণ্ডল খুলে পড়ে। শেষনাগ সেটি নিয়ে পাতালে পালায়। পার্বতী সেটি ফিরে

চাইতেই শিব তপস্যায় বসলেন। কঠিন তপস্যা। তাতে চরাচর কেঁপে উঠল। ভয়ে শেষনাগ মণিকুণ্ডল ফেরত দিলেন। পাতাল ফুঁড়ে এই প্রস্রবণ উঠল, তারই সঙ্গে এল মণি। এই জন্যেই এই স্থানের নাম হয়েছে মণিকরণ। কিছু দিন আগেও এই প্রস্রবণের জলে নানা রকম পাথর পাওয়া যেত।

এর পর মিস্টার ঘোষ লাহৌল ও স্পিতির গল্প বললেন। তখন তাঁকে ক্লান্ত দেখাচ্ছিল। অনেকক্ষণ ধরে কথা বলেই বোধ হয় তাঁর ক্লান্তি এসেছিল। বললেন : মানালির উত্তরে লাহৌল উপত্যকা, তার পশ্চিমে হিমাচল প্রদেশ আর উত্তরে জম্মু ও কাশ্মীর। স্পিতি উপত্যকা তার দক্ষিণে, মণ্ডি রাজ্য হিমাচল প্রদেশের যে অংশে তা স্পিতির দক্ষিণে। মানালি থেকে রাহালা ন মাইল পথ তৈরি হয়ে গেছে। রাহাল থেকে রোটাং পাসের কঠিন চড়াই প্রায় সাড়ে তের হাজার ফুট। এক মাইল প্রশস্ত এই পাস পেরিয়ে যাওয়া কিছু দুঃসাধ্য নয়। তারপরে লাহৌলের প্রধান শহর কাইলং পর্যন্ত আটাশ মাইল জীপের রাস্তা তৈরি হয়ে গেছে।

রোটাং পাসের উপর দিয়ে কি জীপ চলে?

স্বাতি জানতে চাইল।

মিস্টার ঘোষ বললেন : না। এক দিন একখানা জীপ যখন ভেঙে-চুরে ওপারে নিয়ে গিয়ে জোড়া দিয়ে চালানো হল, সমস্ত উপত্যকার লোক সেদিন এই দৈত্যটি দেখবার জন্যে জড়ো হয়েছিল। লাহৌল হল চন্দ্রা ও ভাগা নদীর উপত্যকা। দুইএ মিলে চন্দ্রভাগা হয়েছে।

স্পিতি উপত্যকার পথ খুবই দুর্গম। রোটাং পাস থেকে কুনজুম পাস পর্যন্ত পথ তৈরি হচ্ছে। পনর হাজার ফুট উঁচু এই পাস পেরিয়ে স্পিতি উপত্যকা। এ যেন সভ্য জগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন একটা দেশ। ইয়াকের দুধ মাখন আর বার্লির ছাতু খেয়ে এরা বেঁচে আছে। লোক-সংখ্যা খুবই কম, এবং যাতে লোক না বাড়ে তার জন্যে সমাজে নিয়ম-

কানুন আছে বাপের বড় ছেলেই জমিজমা পাবে এবং বিয়ে করে সংসারী হবার অধিকার পাবে। অন্য ছেলেরা যাবে মঠে লামা হতে। বড় ভাই না মরলে ফিরে এসে সংসারী হবার অধিকার তাদের নেই। সব মেয়ের বিয়ে হয় না। অবিবাহিত মেয়েরা কনভেণ্টে থাকে। কিন্তু সব সময়ই যে তাদের একটি পুরুষের একটি স্ত্রী তা নয়। একটি পুরুষের একাধিক স্ত্রী আছে। আবার একটি স্ত্রীর একাধিক স্বামীও আছে।

ভদ্রলোক এই উপত্যকায় কী কাজ করে এলেন তা বললেন না। আমাদের ভরসা দিলেন যে রোটাং পাসের উপর দিয়ে রোপ ওয়ে তৈরি হয়ে গেলে আমাদের যাতায়াতের আর কষ্ট থাকবে না।

মিস্টার ঘোষ এবারে নতুন একটা চুরট ধরালেন। আমি আর তাঁকে কোন প্রশ্ন করা উচিত মনে করলুম না।

কিন্তু স্বাতি জিজ্ঞাসা করল : আপনি এখানে কদিন থাকবেন ?

ভদ্রলোক হেসে বললেন : কাল ভোরবেলাতেই দিল্লী যাত্রা করব। সত্যি কথা বলতে কি, এখানে আমার কোন দরকারই ছিল না। পাঠানকোটে ফিরবার পথে দালাই লামার কথা মনে পড়ল। এই পাহাড়েই আছেন। তাঁকে একবার দেখে গেলুম।

আমি আশ্চর্য হয়ে বললুম : তাঁর দেখা পাওয়া যায় ?

তাঁর লামা অনুচরদের খোশামোদ করে দর্শন পেয়ে গেলুম।

আমি কৌতূহলী হয়ে জিজ্ঞাসা করলুম : কেমন দেখলেন ?

মিস্টার ঘোষ বললেন : সে কথা বলতে গেলে রাজনীতির কথা এসে পড়ে। থাক সে কথা।

একদা দালাই লামা তিব্বতের সর্বময় কর্তা ছিলেন। শুধু রাজনীতির রাজা নয়, ধর্মেরও রাজা। তারপর লাল চীন তিব্বত অধিকার করল। আর দালাই লামা এসে এই ধরমশালার পাহাড়ে আশ্রয় নিলেন। ইংরেজীতে আমরা দালাই লামা বলি, তিব্বতীরা নাকি তাদের নিজেদের ভাষায় বলে তালে লামা।

মিস্টার ঘোষ তাঁর ছড়ানো মানচিত্রটা গুটিয়ে নিলেন। বললেন : উঠি এবারে।

তারপর নমস্কার করে ঘরে থেকে বেরিয়ে গেলেন।

আমি স্বাতির মুখের দিকে তাকিয়েছিলুম। স্বাতি কিছু ভাবছিল। অনেকক্ষণ পরে বলল : বুঝলে গোপালদা, আমরা একবার বরফের ওপর দিয়ে হাঁটব।

তার উত্তর না দিয়ে আমি শুধু হাসলুম।

স্বাতি বলল : জবাব দিলে না ?

বললুম : একবার নয়, বারবার।

পরদিন সকালবেলায় আর বৃষ্টি পড়ছিল না। চা খেয়ে আমরা শহর দেখতে নামলুম।

মিস্টার ঘোষের কথা স্বাতি কাল রাতেই মামা মামীকে বলেছিল। আমি নাকি আর কুলু দেখতে চাই না। কুলু দেখা আমার হয়ে গেছে, যা শুনেছি তাতেই লোককে ফাঁকি দিতে পারব।

আমি বলেছিলুম : বরফের উপর দিয়ে হাঁটা আমাদের বাকি আছে।

এখানে বরফ কোথায়?

খুব ভোরে উঠতে পারলে ইলাকা পাসের বরফ দেখে আসা যাবে।

মামা বলেছিলেন : সে আবার কোথায়?

উত্তর আমি দিয়েছিলুম : এখান থেকে এক দিনেই ঘুরে আসা যায়।

কিন্তু এ প্রস্তাবে স্বাতির উৎসাহ দেখি নি।

ধরমশালার বাজার দেখতে আমাদের আধ ঘণ্টাও সময় লাগল না। দর্শনীয় কিছুই নেই। ক্যাণ্টনমেণ্ট ও আপার ধর্মশালা দেখতে হলে বাসে চাপতে হবে। ভগ্‌সুনাথের জলপ্রপাত দেখতে হলেও অনেকটা হাঁটতে হবে, মামা মামী তা পারবেন না। ডাল লেক আরও একটু দূরে। কাজেই আমরা খেয়েদেয়ে বৈজনাথ যাত্রাই যুক্তিযুক্ত মনে করলুম।

মামা বললেন : আজ আর বিকেলে নয়, বিকেলের আগেই আমাদের বৈজনাথ পৌঁছতে হবে। দরকার হলে দুপুরে আমরা কাঙ্গড়াতেই খাব।

মামী বললেন : ঝড়বৃষ্টিকে অত ভয় কেন?

মামা বললেন : তবে আর কী, ঝড়বৃষ্টির জন্যেই এইখানে অপেক্ষা করে থাকি!

বাজারে আমরা একটা ভাল হোটেল খুজে নিরাশ হলুম। কাঙ্গড়া জেলার প্রধান শহরে একটা ভাল হোটেলের অভাব দেখে আশ্চর্য হলুম। মসুরিতে শুনেছিলুম সাড়ে তিন শো হোটেল। আর এই পার্বত্য শহরটিতে দু দশ দিন থাকবার উপযোগী ভাল হোটেল দু দশটা আছে বলেই আশা করেছিলুম। খুঁজেপেতে আমরা একটা খাবার জায়গা বার করলুম। এবং মামাকে সন্তুষ্ট করবার জন্য অসময়েই খেয়ে নিলুম।

মামা বললেন : আমি আর উপরে উঠতে পারব না। জিনিসপত্র তোমরাই নামিয়ে আন।

বলে আমার দিকে তাকালেন।

মামী বললেন : তোমার দৌড় আমি জানি।

মামা বললেন : বেশ তো, তুমি দৌড়ও।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত মামীও উপরে উঠলেন না। স্বাতিকে বললেন : জিনিসপত্র সব গুছিয়ে আনতে পারবি তো!

স্বাতি হেসে বলল : তুমি বাবার সঙ্গে থাক।

দুজন কুলি নিয়ে আমরা উপরে গেলুম। স্বাতি তার ব্যাগ খুলে পয়সাকড়ি মিটিয়ে দিল। তারপর জিনিসপত্র নিয়ে নামতে লাগলুম। কুলিরা সামনে, আমরা তাদের পিছনে। স্বাতি বলল : এ যাত্রায় বৈজনাথ থেকেই আমাদের ফিরতে হবে।

কেন ?

কুলুর পথের কথা কাল রাতেই বাবা জেনে নিয়েছেন। মিস্টার ঘোষ বলেছেন, অমন দুর্গম পথে এখন কী দেখতে যাবেন, খুব শখ থাকলে দশেরার সময় যাবেন। কাজেই বুঝতে পারছ, আমরা যেতে চাইলেও তিনি রাজী হবেন না।

তোমারও যে আপত্তি আছে তা জানি।

কে বললে ?

যে কখনও ভুল করে না সে।

সে আবার কে ?

নিজের মন।

কিসের আপত্তি বল তো ?

বললুম : মৃত্যুকে ভয় পায় প্রেমিক। আত্মদানে নয়, ভয় হারাবার। 'যাহারে পেয়েছি তারে কখন হারাই'।

স্বাতি আশ্চর্য হবার ভান করে বলল : আজ তোমাকে একটু বেশি রোমান্টিক মনে হচ্ছে।

আমাদের হিমাচল ভ্রমণ যে শেষ হয়ে এল।

স্বাতি বলে উঠল : দোহাই তোমার গোপালদা, তোমার সব গল্পের শেষগুলো এক রকম হয়ে যাচ্ছে। এবারে নতুন কিছু কর।

ঝগড়া ?

স্বাতি নিরুত্তর।

ছাড়াছাড়ি ?

স্বাতির মুখের দিকে তাকিয়ে দেখলুম, পরম কৌতুকে সে হাসছে। তাড়াতাড়ি বললুম : তবে আমি সত্যি কথাই বলব।

মামা মামীর দেখা বাস-স্ট্যাণ্ডে পেলুম। তাঁরা একখানা কাঙ্গড়াগামী বাসে উঠে বসেছিলেন। এবং উদ্‌গ্রীব হয়ে আমাদের জন্যে পথ চাইছিলেন। এবারে দেখতে পেয়ে মামী বললেন : তোমাদের এত দেরি হল কেন ?

মামা বললেন : দেরি আর কোথায়, উঠতে নামতে সময় লাগবেই তো।

যথাসময়ে বাস ছাড়ল। পুরনো পথে আমরা কাঙ্গড়ায় ফিরে এলুম। সেই দোকানপাট, সেই যাত্রীর ভিড়, সেই বাসের প্রতীক্ষা। তারপর পাঠানকোট থেকে বৈজনাথের বাস এল। চমৎকার গদি-আঁটা ঝকঝকে বাস। বাসে বসে মামা খুশী হলেন। স্বাতি তার ব্যাগের ভিতর থেকে চিনেবাদামের একটা ঠোঙা বার করল। এটি

সে এইখানেই সংগ্রহ করেছিল। তারপর উঠে দাঁড়িয়ে আমার কোলের উপর ঢেলে দিল খানিকটা। আমি তার সামনের সীটে বসেছিলুম।

আবার আমরা কাঙ্গড়া উপত্যকার প্রশস্ত পথে এসে পৌঁছলুম। এই পথ পালমপুরের মাঝখান দিয়ে বৈজনাথ যাবে। বৈজনাথেই কাঙ্গড়া উপত্যকার শেষ।

আমরা পূর্ব মুখে চলেছি। উত্তরে উত্তুঙ্গ ধবলাধার। পাহাড়ে বরফ থাকলে এখন সূর্যকিরণে ঝলমল করত। বরফ নেই বলে দু ধারের শস্যক্ষেত্রের শ্যামলিমার সঙ্গে অবাধে মিলে গেছে। এই উপত্যকায় বুনো ফুলের সমারোহ নেই। মিস্টার ঘোষ বলেছিলেন যে ফুল দেখতে হয় তো জুন জুলাই মাসে যেতে হয় কুলু উপত্যকায়। নানা রকম ফুলের নামও বলেছিলেন—আইরিস বাটারকাপ ডেইজি আর অ্যানিমোন, ক্রোকাস সোরেল বুনো গোলাপ আর লিলি, প্রাইমুলাস রেনানকিউলাস ডগভায়োলেট ব্লু বেল, ভার্বিনা আর জিরেনিয়াম, আলো-করা রডোডেনড্রন। কুলুতে আরও আছে ফলের বাগান। নানা রকমের আপেল—রেড ডিলিশাস গোল্ডেন আর কক্সেস অরেঞ্জ পিপিন, চেরি অ্যাপ্রিকট আর পীচ, নাশপাতি আর বাবুগোসা। বাবুগোসার আস্বাদ পেয়েছিলুম কাশ্মীরে।

কাঙ্গড়া উপত্যকার চাষবাস সমতলভূমির মতো। অনেক চা বাগানও আছে। ধরমশালায় ছিল, পালমপুরেও অনেক আছে। এই সব চা বাগান আমরা বাসে যেতে যেতে দেখলুম।

এক সময় স্বাতি জিজ্ঞাসা করল : একটা জিনিস আমাদের দেখা হল না গোপালদা।

বললুম : কী?

কাঙ্গড়ার শিল্প।

চাম্বার আজবঘরে কিছু নমুনা আছে।

আর কোথাও নেই?

বললুম : তোমার গাইড বই যে এ বিষয়ে নির্বাক।

মামা বললেন : কুলুর শিল্প জানি, ওদের শাল আর টুপি!

বললুম : কাঙ্গড়ার শিল্প হল তাদের ছবি। একদা মুসলমানের অত্যাচারে যখন রাজপুতেরা এ অঞ্চলে পালিয়ে আসে তখন সঙ্গে করে রাজস্থানের শিল্পবোধও এনেছিল। শিল্পী হলে এ বিষয়ে কিছু বলতে পারতুম।

মামী আমাকে রক্ষা করলেন, বললেন : বৈজনাথে আমরা কী দেখব?

তাড়াতাড়ি উত্তর দিলুম : বৈজনাথের প্রাচীন মন্দির। ৮০৪ খ্রীষ্টাব্দে নির্মিত হয়েছে বলে উৎকীর্ণ আছে।

মামা আশ্চর্য হয়ে বললেন : এত প্রাচীন!

বললুম : এ অঞ্চলে প্রাচীন নিদর্শন আরও আছে। খ্রীষ্টের জন্মের পূর্বে এখানে বৌদ্ধপ্রভাব ছিল। পাথিয়ার ও কানিয়াবার শিলালিপিতে তাই জানা যায়। সে লিপি খ্রীষ্টের জন্মের তিন শো বছর আগে প্রচলিত ছিল। মসরুর নামে একটা জায়গায় গুহামন্দির আছে। তা হিন্দু ধর্মের প্রাচীনতম নিদর্শন।

স্বাতি জিজ্ঞাসা করল : এ সব কথা আবার কার কাছে শুনলে?

হেসে বললুম : তোমারই একখানা বইএ পড়েছি। নামগুলো কোন রকমে মনে রেখেছি। কিন্তু জায়গাগুলো কোথায় জিজ্ঞেস করলেই বিপদে পড়ব।

পালমপুরে বাস কিছুক্ষণ দাঁড়ায়। গগ্‌গলের চৌরাস্তা থেকে আমরা চব্বিশ মাইল এসেছি। উঁচুতে উঠেছি চার হাজার ফুটের কিছু বেশি, বৈজনাথেরই সমান। বৈজনাথ এখান থেকে মাত্র এগার মাইল। দু ধারের চা বাগান আমরা দেখতে দেখতে এসেছি। ঝিরঝির করে একটু একটু বৃষ্টি পড়ছে। এখন শরৎকাল। শীতেও এ দেশে বৃষ্টি হয়। বাসে চলতে চলতে একটা শহরের সম্বন্ধে ধারণা করা যায় না। তবু মনে হল যে শহরটি ধরমশালার মতো পরিচ্ছন্ন

নয়, তবে হয়তো বেশি জনবহুল, কিংবা ধরমশালার মতো অমন ছড়ানো নয় বলেই জনবহুল ও অপরিচ্ছন্ন মনে হচ্ছে। পথের ধারে রেলওয়ের একটা রেস্টহাউস চোখে পড়েছে, আর ছোট লাইনের ট্রেনও দেখেছি নিকটে।

দিনের আলো মিলিয়ে যাবার অনেক আগেই আমরা বৈজনাথ এসে পৌঁছে গেলুম। আকাশ মেঘাচ্ছন্ন ছিল। বৃষ্টির সঙ্কেত ছিল বাতাসে। আমরা ডাকবাংলোয় উঠব বলে স্থির ছিল। বাস থেকে নেমেই কুলিদের সেই দিকে ছুটতে বললুম। কিন্তু বেশি দূর অগ্রসর হতে পারলুম না। বৃষ্টির ধারা থেকে আত্মরক্ষার জন্য যেখানে আমরা আশ্রয় নিলুম, সেটা বৈজনাথের ডাকঘর। তার দু ধারে দোকানপাট, ফলমূল শাকসবজির দোকান, খাবারের দোকান। আমাদের কুলিরা কিন্তু দাঁড়াল না, বৃষ্টির মধ্যেই তারা এগিয়ে গেল।

জিনিসপত্র হারাবার ভয়ে মামী উদ্বিগ্ন হলেন। হাওয়ায় শীত করছিল। ভাল করে চাদর জড়িয়েও শীত যাচ্ছিল না। জিনিসপত্র হারিয়ে গেলে এই শীতে রাত্রিবাস করা অসাধ্য হবে। মামীর উদ্বেগের কারণ জানতে পেরে পোস্টমাস্টার আমাদের সান্ত্বনা দিলেন : পাহাড়ে এ সব ভয় একেবারেই নেই। যেখানে যেতে বলেছেন সেইখানেই তারা আপনাদের অপেক্ষা করে থাকবে।

তবু মামীর উদ্বেগ গেল না। বৃষ্টি থামবারও কোন লক্ষণ নেই। এরই মধ্যে একটু সুবিধে দেখে চাদরে মাথা ঢেকে আমি রাস্তায় নেমে পড়লুম।

মামা চেঁচিয়ে উঠলেন : করছ কী!

স্বাতিও কোন কথা না বলে মাথায় শাড়ির আঁচল তুলে পথে নেমে পড়ল। দুজনেই জোরে জোরে চলতে লাগলুম।

স্বাতি বলল : রামখেলাওনের মজা দেখেছ? ও হয়তো বাসেই বসে আছে।

এতক্ষণ তার কথা মনে ছিল না। এখন দেখলুম সত্যিই তাই। সে হয়তো অন্যান্য যাত্রীদের সঙ্গে সামনের ধর্মশালাতেই আশ্রয় নিয়েছে।

বৈজনাথের ছোট্ট বাজার একটু চলতেই শেষ হয়ে গেল। ডান হাতে ডাকবাংলোর পথ, নিশানা দেওয়া আছে। খানিকটা এগিয়ে একটা টিলা, সেই টিলার উপর সুন্দর একটি বাংলো। বৃষ্টি তখন থেমে এসেছে, কুলিদেরও দেখতে পেলুম। বারান্দায় মালপত্র নামিয়ে অপেক্ষা করছে। আমাদের সংবাদ পেয়ে চৌকিদার এল, এক পাশের একটি সুইট খালি পাওয়া গেল। চমৎকার সাজানো সুইট, দুখানি ঘর আর একটি বাথরূম। এত জায়গা যে আমাদের কাছে অপর্যাপ্ত মনে হল। কুলিদের পয়সা মিটিয়ে তাদের একটু সাহায্য চাইলুম। মামা মামীকে এখানে পৌঁছে দেবে আর রামখেলাওনকেও আনবে খুঁজে।

বারান্দায় দাঁড়িয়ে আমরা মেঘের গর্জনের মতো একটা ধ্বনি শুনতে পাচ্ছিলুম। একটানা অবিচ্ছিন্ন ধ্বনি। সামনে ধবলাধারের নগ্নদেহ। বরফ গলে শেষ হয়ে গেছে, কিন্তু সৌন্দর্যের শেষ হয় নি। তরু-লতা-গুল্মহীন পাহাড়ের এও এক অপরূপ রূপ। তপোমগ্ন সন্ন্যাসীর মতো। শীতে যখন তুষারে সাদা হয়ে যাবে, তখন তার অন্য রূপ দেখব। এই পাহাড়ের খাদ কত নিচে নেমে গেছে দেখা যাচ্ছে না। ঝিরঝিরে বৃষ্টিকে উপেক্ষা করে আমরা ডাকবাংলোর সামনের সীমানা পর্যন্ত এগিয়ে গেলুম।

স্বাতি আমার মুখের দিকে তাকাল, আর আমি তাকালুম তার মুখের দিকে। এ তো মেঘের গর্জন নয়, এ যে এক চঞ্চল স্রোতস্বিনী তার কলধ্বনি তুলে খাদের ভিতর দিয়ে বয়ে চলেছে। ছোট বড় পাথরের বাধা অতিক্রম করে তার কলগানের যেন শেষ নেই।

মামীর ডাকে আমাদের চমক ভাঙল : বাইরে দাঁড়িয়ে ভিজছ কেন?

স্বাতি কোন উত্তর না দিয়ে বারান্দায় ফিরে এল। আমিও এলুম। ব্যবস্থা দেখে মামা খুশী হয়েছিলেন, মামীও বোধ হয় হয়েছিলেন। স্বাতি আরও একটা সুখবর দিল : চৌকিদার চা আনছে।

চা খাবার পরে মামা বললেন : অন্ধকার হবার আগেই মন্দিরটা দেখে আসা যাক।

বৃষ্টি তখন থেমেছিল। মামী বললেন : তা না হলে আবার হয়তো বৃষ্টি নেমে যাবে।

বৈজনাথ পাহাড় এখানে বৃত্তাকারে ঘুরে গেছে। সমস্ত শহরের পিছনটা আমরা দেখতে পাচ্ছিলুম। মন্দিরের চূড়োও দেখা যাচ্ছিল। চৌকিদার আমাদের একটা সোজা পথ দেখিয়ে দিল, তারপরেই বলল : এ পথে যাবেন না, বৃষ্টির জলে হয়তো কাদা হয়েছে। তার চেয়ে বাস-স্ট্যাণ্ডে চলে যান, সেখান থেকে কয়েক ধাপ নিচে নামলেই মন্দির।

মন্দিরে পৌঁছতে আমাদের বেশি সময় লাগল না। বৈজনাথে কোন কিছুই দূর নয়। বড় রাস্তা থেকে ধাপে ধাপে আমরা মন্দিরের দরজায় নেমে এলুম। দরজার পাশেই দেখলুম গঙ্গা যমুনা প্রভৃতির মূর্তি। মন্দিরের সামনে একটি মণ্ডপ, এক নজরে উড়িষ্যার মন্দির বলে মনে হল। কারুকার্যময় মন্দিরগাত্রে প্রাচীন যুগের গাম্ভীর্য লেগে আছে।

বৈজনাথ বৈদ্যনাথ শিব। ভারতের সর্বত্র তার একই রূপ। মন্দিরে এখনও বাতি জ্বলে নি, আমরা অন্ধকারেই দেবতাকে প্রণাম করলুম। মামী বললেন : কাল সকালে আমরা পূজো করব।

স্বাতি বলল : আজ রাতে আমরা আরতি দেখব।

মন্দিরের ব্রাহ্মণ বললেন : এখানে আরও ষোলটি মন্দির আছে। একে একে সেগুলিও দেখবেন।

এই রকম মন্দির ?

সে সব ছোট মন্দির। যাত্রীরা এই মন্দির দেখেই ফিরে যান বলে আপনাদের জানালাম।

পশ্চিমের পাহাড়ের পিছনে ক্লান্ত সূর্য অস্ত যাচ্ছিল। মেঘলা আকাশে সূর্য প্রখর ছিল না কোন সময়েই। মন্দিরের অঙ্গনে এইবারে ছায়া নামল।

নূতন জায়গায় মামা এই অন্ধকারকে ভয় পান। অন্ধকার হবার আগেই ফিরে আসতে চান তাঁর নিশ্চিন্ত আশ্রয়ে। তাই ব্রাহ্মণের সঙ্গে কথা না বলে আমাদের বললেন: চল।

পুরনো পথ দিয়েই আমরা ডাকবাংলোয় ফিরে এলুম।

ডাকবাংলোর ঘরে বসে আমরা গল্প করছিলুম। এখান থেকেই আমরা পাঠানকোট ফিরব। সেখানে রাত কাটিয়ে পরের দিন ধরব শ্রীনগরের বাস। চৌকিদার খবর দিয়ে গেছে যে রাত নটার আগেই আমাদের খাবার দিতে পারবে। বৃষ্টি ও বাতাসের জন্যেই আজ একটু বেশি শীত বোধ হচ্ছে। তা না হলে রাত নটা এখানে রাতই নয়।

মামী হঠাৎ বলে উঠলেন : স্বাতি গেল কোথায় ?

তাইতো! স্বাতি তো অনেকক্ষণ এখানে নেই!

আমি তাড়াতাড়ি বাহিরে বেরিয়ে গেলুম, মামী গেলেন ভিতরের দিকে। স্বাতি বাহিরে নেই। মামী বেরিয়ে এসে বললেন, ভিতরেও নেই।

তবে কোথায় গেল ?

অন্ধকারে নদীর দিকে যায় নি তো!

আমি বললুম : না।

আর্তস্বরে মামী জিজ্ঞাসা করলেন : তবে কোথায় গেল!

আমি জানি সে কোথায় গেছে, কিন্তু সে কথা তাঁদের বললুম না। চাদরখানা জড়িয়ে নিচে নেমে যাবার সময় বলে গেলুম : আপনারা একটুও চিন্তা করবেন না।

পথ চলতে চলতে দু বছর আগের কথা আমার মনে পড়ল। সেদিন রামেশ্বরে স্বাতি হারিয়ে গিয়েছিল। আর আমি তার সঙ্গে ছিলুম। সেদিন মামা নিজে আমাদের খুঁজতে বেরিয়েছিলেন। পাণ্ডাদের বাড়ি গিয়ে বলেছিলেন আমাদের খুঁজে বার করতে। নিজের দায়িত্বহীনতার জন্য সেদিন আমার মাথা হেঁট হয়ে গিয়েছিল।

সেদিনের সেই ঘটনা আমার চোখের সামনে ভেসে উঠল।

রামেশ্বরে রাত তখনও বেশি হয় নি। তবু ক্লান্তির জন্য মামা

শুয়ে পড়েছিলেন, মামীও মুখে পান দিয়ে শোব-শোব করছিলেন। এমন সময় পাণ্ডার লোক এসে খবর দিল যে রামেশ্বর আজ রুপোর রথে শোভাযাত্রা করে বেরিয়েছেন।

স্বাতি ধড়মড় করে উঠে বসেছিল, আর মামী চমকে উঠেছিলেন, যাবি নাকি এত রাত্তিরে! স্বাতি বলেছিল, এত রাত কোথায় মা! তারপর পাণ্ডার লোকের সঙ্গে আমরা দুজনে বেরিয়ে পড়েছিলুম।

স্বল্পালোকিত রামেশ্বরের পথ তখনও প্রাণচাঞ্চল্যে জেগে ছিল। একটি মন্দির নিয়ে শহর। সেই মন্দিরে যখন উৎসব, তখন শহর ঘুমবে কোন্ লজ্জায়!

মন্দিরের দরজায় এসে আর এগনো যায় নি। রুপোর রথ বেরিয়েছিল পথে, তার ভিতর রামেশ্বরের সোনার ভোগমূর্তি। ফুলে মাল্যে আলোকে ও সজ্জায় উজ্জ্বল রথ। পথে পুণ্যার্থীর ঠেলাঠেলি, উল্লাস আর জয়ধ্বনি। ভিড়ের তরঙ্গের ভিতর আমরাও মিশে গিয়েছিলুম। অশান্ত অবিচ্ছিন্ন তরঙ্গ। বেরিয়ে আসবার পথ আর ছিল না।

এক সময় মন্দির প্রদক্ষিণ শেষ হল। রুপোর পালকিতে ব্রাহ্মণের কাঁধে চড়ে রামেশ্বর আবার মন্দিরে ফিরে এলেন। যাত্রীর ধাক্কায় কী ভাবে কোথা দিয়ে মন্দির প্রাঙ্গণে এলুম জানি নে। নিজেকে দেখবার অবকাশ পেলুম যখন বাবার শয়নারতি আরম্ভ হল। যাত্রীর স্রোতে তখন ভাঁটা পড়েছিল। ভিড়ের ভিতর আমাদের ঠেলে দিয়েই পাণ্ডার লোক সরে পড়েছিল দেখেছিলুম। এবারে আর স্বাতিকেও নিজের পাশে খুঁজে পাই নি। ওধারে মেয়েরা জমায়েত হয়েছিল এক জায়গায়। হয়তো তাদের সঙ্গেই সে আছে। ফেরার সময় খুঁজে নিলেই হবে।

বৈজনাথে রুপোর রথ নেই, হয়তো একটা রুপোর পালকিও নেই। আজ বৈজনাথের পথে কোন শোভাযাত্রা বার হয় নি! তবু আমি মন্দিরের দিকে অগ্রসর হলুম।

রামেশ্বরের শয়নারতির কথা মনে পড়ছে। এমন শয়নারতি আমি কোথাও দেখি নি। ধূপে ধুনোয় বাদ্যে ও উদাত্ত স্বরে মন্দিরের প্রাঙ্গণ ভরে গিয়েছিল। চাতালের উপরে একটু স্থান পেয়েছিলুম। একটা থামে হেলান দিয়ে দেবতার মাহাত্ম্যে সারা দিনের ক্লান্তি ভুলে গিয়েছিলুম।

এক সময় আরতি শেষ হল। ব্রাহ্মণেরা বাবার ভোগমূর্তি পার্বতীর কাছে নিয়ে চললেন। বাজনার বিরাম নেই, ত্রুটি নেই আয়োজনের, আর কৌতূহলেরও সীমা নেই সমবেত যাত্রীর। প্রাঙ্গণের এক ধারে দোলায়মান মঞ্চের উপর পার্বতীর ভোগমূর্তি বিরাজিতা। ব্রাহ্মণেরা তাঁরই পাশে রামেশ্বরের ভোগমূর্তি স্থাপন করলেন।

এইটুকুর যেন নিতান্ত প্রয়োজন ছিল। সারা দিন দেবতা ভক্তের পূজা নিয়েছেন। পার্বতীর দিকে তাকাবার অবসর ছিল না তাঁর। এইবারে কর্মক্লান্ত দেহে অবসর নিতে এলেন পার্বতীর কাছে। দেবতারও এই বিশ্রামের প্রয়োজন আছে। কী প্রশান্ত পরিতৃপ্তি! দেহ মন আমার জুড়িয়ে গিয়েছিল।

বাদ্যভাণ্ডের প্রবল সমারোহে প্রভাতে যখন ঘুম ভেঙেছিল, আমি চমকে জেগে উঠে বিস্ময়ে স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিলুম। সারা রাত্রি আমি মন্দিরের চাতালে ঘুমিয়েছি, আর স্বাতি নেই। পরে সমস্ত ঘটনা জেনেছিলুম। মামা আমাদের খুঁজতে বেরিয়েছিলেন, আর বেরিয়েছিল পাণ্ডা তার দলবল নিয়ে। সকালের দিকে স্বাতিকে তারা ধর্মশালার কাছে খুঁজে পেয়েছিল। রাতে আমার হদিস তারা পায় নি, ধর্মশালারও না।

বৈজনাথের মন্দিরে প্রবেশের সময় আমার মনে হল যে আজও সে শয়নারতি দেখতে এসেছে। মন্দিরের প্রাঙ্গণেই আমি তার দেখা পাব।

পেলুমও দেখা! মন্দিরের একটা থামে হেলান দিয়ে সে চুপ

করে বসে আছে। ব্রাহ্মণেরা ভিতরে আরতির আয়োজন করছেন দেখলুম।

ভেবেছিলুম, নিঃশব্দে আমি তার পাশে এসে বসব। কিন্তু তার আগেই সে বলল : তুমি কেন এলে গোপালদা ?

তার অস্পষ্ট কথায় আমি বিস্মিত হলুম। সে কি আমার পদধ্বনিও চেনে! তা না হলে সে কী করে আমার আগমনের কথা জানল! অনুভব!

তার পাশে একটু জায়গা দেখিয়ে বলল : তোমাকে ক্লান্ত দেখেই তো সঙ্গে আসবার জন্যে ডাকলুম না।

আমি তার পাশে বসে বললুম : কাউকে বলে এলে না কেন ?

অনুমতি!

স্বাতি হাসল। মন্দিরের স্বল্পালোকে আমি তার সেই হাসি দেখে মুগ্ধ হলুম।

একটু থেমে বলল : আর কত কাল আমাকে অনুমতির অপেক্ষায় থাকতে হবে গোপালদা!

সহসা বেজে উঠল মন্দিরের শঙ্খঘণ্টা, বৈজনাথের আরতি শুরু হল।

স্বাতি উঠল না, আমিও বসে রইলুম।

কয়েক দিন আগের কথা আমার মনে পড়ল। চাওলা ও মিত্রার সঙ্গে আমি যখন মসুরি পাহাড় থেকে ফিরছিলুম, মিত্রা আমাকে স্বাতির কথা বলেছিল। সে নাকি মিত্রাকে স্বাধীন হবার পরামর্শ দিয়েছে। নিজেও চাকরি নিয়ে স্বাধীন হবার কথা ভাবছে। সে কি এই অনুমতির প্রয়োজন থেকে অব্যাহতি পাবার জন্য!

মন্দিরের ভিতরে আরতি হচ্ছে। বাহিরে ধবলাধার এখন অন্ধকারে আবৃত। নিচের স্রোতস্বিনীর কলধ্বনি আরতির শব্দে আর শোনা যাচ্ছে না। আমরা দুজনে স্তব্ধ হয়ে বসে রইলুম।

মিত্রা আমাকে স্বাতির কথা বলেছিল। স্বাতি নাকি তাকে বলেছে যে মনের মিলনের জন্য তো কোন উপঢৌকনের প্রয়োজন নেই, অর্থ প্রতিপত্তি কেন তার প্রতিবন্ধক হবে !

বলেছিল, স্বাতিকে যেন আমি কোন দিন ভুল না বুঝি।

কোন দিন কি আমি তাকে ভুল বুঝেছি !

মনে পড়ে না।

হিমাচল পর্ব সমাপ্ত

রম্যাণি বীক্ষ্য

ভ্রমণের আনন্দ চিরন্তন—নতুন নতুন দেশ দেখা একটা নেশার মত। কিন্তু ভ্রমণ না করেও ভ্রমণের আনন্দ পেতে হলে রবীন্দ্রপুরস্কারে সম্মানিত সাহিত্যিক শ্রীসুবোধকুমার চক্রবর্তীর রম্যাণি বীক্ষ্যের পর্বগুলি পর পর পড়ে যান। আর যাঁরা ভ্রমণ করেন তাঁদের পক্ষেও অনন্য ভ্রমণ-সঙ্গী হিসেবে **রম্যাণি বীক্ষ্য** গ্রন্থমালা অপরিহার্য।

রম্যাণি বীক্ষ্য নামটি কালিদাসের অভিজ্ঞান শকুন্তলম্-এর একটি শ্লোকের প্রথমাংশ। রবীন্দ্রনাথ এর অনুবাদ করেছেন 'সুন্দর নেহারি'। তার মানে, রম্যবস্তুসমূহ প্রত্যক্ষ করে মনে যে ভাব এল, তারই কথা। আর বাস্তবিক রম্য-দর্শনই হল **রম্যাণি বীক্ষ্যের** মূল সুর। তার বিস্তার অতীতের ঐতিহ্য আলোচনায়। ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে যেখানে যা-কিছু মনোহর ও সুন্দর দ্রষ্টব্য স্থান আছে, সাবলীল ভাষায় ও মনোজ্ঞ ভঙ্গীতে তাদের বিবরণ লিপিবদ্ধ করে গ্রন্থকার এক ধারাবাহিক কাহিনী পাঠকের সামনে উপস্থাপিত করেছেন।

ভারত-পরিক্রমার এই সুদীর্ঘ কাহিনীকে ভারত-উপমহাদেশের ভৌগোলিক সাংস্কৃতিক পৌরাণিক ও ঐতিহাসিক তথ্যপুঞ্জের এক বিশাল আকর-গ্রন্থ বললেও অত্যুক্তি হয় না। এতে সমগ্র ভারতের বিচিত্র দর্শনীয় স্থানগুলির সবিস্তার বর্ণনা তো আছেই, সেই সূত্র ধরে লেখক তাদের প্রাচীন ইতিহাসের অস্পষ্ট-আলোকিত কুঠরীতেও যথেষ্ট আলোকপাত করেছেন। তীর্থমাহাত্ম্যের বিবরণ দিতে গিয়ে বিদগ্ধ গ্রন্থকার মন্দির-স্থাপত্যের বা সংশ্লিষ্ট তীর্থস্থানের বর্তমান পরিচয় দানেই ক্ষান্ত থাকেন নি, তার পাশে পাশে তার অতীত কাহিনী পুরাণ কিংবদন্তী জনশ্রুতি ইত্যাদি সব কিছুকেই টেনে এনেছেন আলোচনার বলয়ের মধ্যে। এতে বিবৃতি হয়ে উঠেছে পূর্ণাঙ্গ—নূতন ও পুরাতন কাল মিলিয়ে ভারতের একটি সামগ্রিক রূপ উদ্‌ঘাটিত হয়েছে পাঠকের কৌতূহলী দৃষ্টির সমক্ষে।

শুধু ভ্রমণ-বিবরণই এই গ্রন্থের বৈশিষ্ট্য নয়। **রম্যাণি বীক্ষ্যের** একটিমাত্র খণ্ডও যাঁরা পড়েছেন তাঁরাই জানেন যে এই বইয়ে ভ্রমণ-কাহিনীর পাশে পাশে একটি রম্য কাহিনীও গ্রথিত আছে। এই একান্ত মনোরম কাহিনীটি বইগুলির ভিতর এক অপূর্ব স্বাদের সঞ্চার করেছে। এতে শুধু যে কাহিনীই জীবন্ত হয়ে উঠেছে তাই নয়, ভ্রমণের রসের ভিতর উপন্যাসের রসেরও

অনুপ্রবেশ ঘটেছে। ভ্রমণে যাঁরা ততটা উৎসাহী নন, জীবনের সর্বক্ষেত্রে প্রাণরসের সন্ধানী, একমাত্র উপন্যাসের রসের আকর্ষণেই তাঁরাও **রম্যাণি বীক্ষ্য** পর্যায়ের বইগুলি পাঠে আগ্রহ বোধ করবেন—এ কথা অসংশয়ে বলা যায়। ভ্রমণরসসিক্ত উপন্যাস অথবা উপন্যাসরসসিক্ত ভ্রমণ—এই দুই নামেই বইগুলিকে অভিহিত করা চলে।

মামা, মামী, তাঁদের কন্যা স্বাতি ও এক দূর-সম্পর্কের পাতানো ভাগ্নে গোপালকে নিয়ে এই রম্য কাহিনীর বুনন। রায় সাহেব অঘোর গোস্বামী এক ধনী জমিদার, এম. পি.-ও। একদিন তিনি তাঁর স্ত্রী-কন্যা সমভিব্যাহারে দক্ষিণ ভারত ভ্রমণোদ্দেশ্যে হাওড়া স্টেশনে গাড়ী ধরতে এসেছেন। স্টেশনে তাঁদের ভৃত্য নিখোঁজ, আর এই সময় প্ল্যাটফর্মে অপ্রত্যাশিতভাবে গোপালের সঙ্গে দেখা। গোপাল লোকাল ট্রেনের যাত্রী, কাজ করে ডালহৌসী স্কোয়ারের এক সওদাগরী আপিসে। সাধারণ কেরাণীর কাজ। কিন্তু পদ-মর্যাদা বা সামাজিক শ্রেণী-বিন্যাসের মাপকাঠিতে গোপালের বাজারদর যাই হোক, সে উচ্চশিক্ষিত, সুরুচিবান্ যুবক, অপিচ প্রকৃত জ্ঞানান্বেষী। তার নম্র বিনীত ব্যবহার অথচ সপ্রতিভ কর্মকুশলতা সকলেরই মনোহরণ করে। ভৃত্যহীন যাত্রার মুখে এরকম অকস্মাৎ গোপালের সঙ্গে দেখা হয়ে যাওয়ায় অঘোর গোস্বামী যেন হাতে চাঁদ পেলেন। জোর করে তাকে ভ্রমণের সঙ্গী করে নিলেন।

এইখান থেকে কাহিনীর শুরু। প্রথম গ্রন্থ **দক্ষিণ ভারত** পর্বে মামা মামী স্বাতি ও গোপালের একত্রে দাক্ষিণাত্য-ভ্রমণ। ভ্রমণের অবকাশে স্বাতি ও গোপালের মধ্যে একটা প্রীতির সম্পর্ক গড়ে ওঠে। স্বাতি গোপালের চরিত্র-মাধুর্যে ও বিদ্যাবত্তায় মুগ্ধ। গোপাল অমায়িক ও শিষ্ট স্বভাবের মানুষ হলেও কোথায় যেন তার চরিত্রে এমন একটি বলিষ্ঠতা ও মর্যাদাবোধ আছে যার শক্তিতে সে শত প্রলোভনেও অটল ব্যক্তিত্বে অনমনীয়। গোপালের এই নির্লোভ চরিত্র ও ব্যক্তিত্ব স্বাতিকে গভীরভাবে আকর্ষণ করেছে এবং সে সকলের অলক্ষিতে এরই মধ্যে হৃদয়মন্দিরে গোপালের বিগ্রহ স্থাপন করে তার পূজার্ঘ্য নিবেদন করতে শুরু করেছে। বাইরে অবশ্য সে গোপালকে নিয়ে যথেষ্ট ঠাট্টা-বিদ্রূপ করে, তাকে 'সবজান্তা' পণ্ডিত বলে টিপ্পনী কাটে; কিন্তু বলাই বাহুল্য, সেটি তার আসল মনের কথা নয়। এইরূপ একপক্ষের আপাত-বিদ্রূপের মধ্য দিয়েই বুঝি মন দেওয়া-নেওয়ার প্রথম পর্বের খেলা শুরু হয়। মাদ্রাজে, মহাবল্লীপুর ও পক্ষীতীর্থে, কাঞ্চীপুর ত্রিচিনপল্লী ও মাদুরায়,

ধনুষ্কোডি ও রামেশ্বরে আমরা এই খেলা দেখি। তারপর কন্যাকুমারীতে এসে আমরা দেখতে পেলাম এক অপূর্ব জ্যোৎস্নালোকিত রাত্রে মনোরম প্রাকৃতিক দৃশ্যের সম্মোহনের মধ্যে স্বাতি ও গোপাল বিবেকানন্দ শিলাকে সাক্ষী রেখে পরস্পরের প্রতি বিশ্বাসের অঙ্গীকারবদ্ধ হচ্ছে। এইখানেই দক্ষিণ ভারত পর্ব শেষ হয়েছে।

তারপর **দ্রাবিড় পর্ব**। তাদের ঘরে ফেরার পালা। কেরালা রাজ্য থেকে মহিসুর রাজ্য। হালেবিদ বেলুর ও শ্রাবণ বেলগোলার প্রাচীন নিদর্শন দেখে এল হায়দ্রাবাদ রাজ্যে। ইলোরা ও অজন্তার গুহা মন্দিরে এই দ্রাবিড় পর্বের পরিসমাপ্তি হয়েছে।

তারপর যখন যবনিকা উঠল তখন আমরা গোপালকে দিল্লী মথুরা বৃন্দাবন ও আগ্রা অঞ্চলে ভ্রমণরত দেখলুম। এই বিবরণ সংকলিত হয়েছে **কালিন্দী পর্বে**। এই পর্বে গোপালের পৌরুষ ও নির্লোভ ব্যক্তিত্বের এক আশ্চর্য চিত্র অঙ্কিত হয়েছে। সেই সঙ্গে স্বাতিরও আপাত-পরিহাস-প্রিয়তার অন্তরালে যে কী গভীর আত্মমর্যাদাবোধ সুগুপ্ত রয়েছে তারও পরিচয় ব্যক্ত হয়েছে। গোপাল সাধারণ মধ্যবিত্ত ঘরের সন্তান হলেও সে কোনমতেই উপযাচক হবার পাত্র নয়। এমন কি হৃদয়-বিনিময়ের ক্ষেত্রেও সে আত্মমর্যাদায় দৃঢ় থাকতে চায়। গোপালের স্বভাব-মাধুর্যে আকৃষ্ট হয়ে মামা অঘোর গোস্বামী গোপালকে গরীব জেনেও জামাই করতে পারতেন, কিন্তু মামীর তাতে গভীর আপত্তি। সব ব্যাপারেই তাঁর নাক উঁচু। কোথাকার কোন্ হাড়-হাভাতে ঘরের ছেলে গোপাল, চাল নেই চুলো নেই, তার সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দিয়ে যে নিজেদের ধনীমানী সমাজে মুখ দেখাতে ভয় পান তিনি। কাজেই স্বাতি ও গোপালের ঘনিষ্ঠতা স্বতঃই তিনি অপ্রসন্ন দৃষ্টিতে দেখেন। মামীর এ মনোভাবের কথা মামার অজানা নয়, কিন্তু তাই বলে গোপালের প্রতি মামার অন্তরে যে সস্নেহ প্রশ্রয় রয়েছে তার পরিমাণও কিছুমাত্র কমে না।

মামী দিল্লীর এক পদস্থ সরকারী কর্মচারীর ছেলে রাণার সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দিতে চেয়েছিলেন। তারই পরিণতি দেখি এই পর্যায়ের চতুর্থ গ্রন্থ **রাজস্থান পর্বে**। দিল্লী থেকে জয়পুর, পুষ্কর, চিতোর, উদয়পুর দেখে তাঁরা আবু রোডে এলেন। সেখানে রাণার বোন মিত্রা এল তার প্রেমিক চাওলার সঙ্গে, কিন্তু রাণা এল না। মামী আহত হলেন, কিন্তু দুঃখ পেলেন না মামা। গোপাল ও স্বাতির সম্পর্ক আগের মতোই সহজ রইল।

রাজস্থান থেকে সৌরাষ্ট্র। এই অঞ্চলের বিখ্যাত তীর্থস্থান দ্বারকা, সোমনাথ ও জুনাগড়ের কথা এই **সৌরাষ্ট্র পর্বে** বিবৃত হয়েছে। মামী আগের মতোই গোপালের প্রতি অপ্রসন্ন; আর মামা বাইরে গোপালকে তার সংসারবিমুখতার জন্য ভর্ৎসনা করেন, কিন্তু অন্তরে তার চারিত্রিক দৃঢ়তায় মুগ্ধ। সহসা এই রঙ্গমঞ্চে এল জো রায়। দ্বারকা থেকে বেট দ্বারকা যাবার পথে তার সঙ্গে দেখা। উঠতি সমাজের এই বিত্তবান যুবককে দেখে মামীর অপত্যস্নেহ আবার নূতন করে উদ্বেলিত হয়ে উঠল। তিনি স্বাতিকে এরই হাতে সমর্পণ করবেন বলে কৃতসংকল্প হলেন। জো রায়ের কাহিনী সৌরাষ্ট্র পর্বেই শেষ হয়নি, ষষ্ঠ গ্রন্থ **মহারাষ্ট্র পর্বে**ও তা টানা হয়েছে। বম্বেতে জো রায় যখন স্বাতির সঙ্গলাভে সমুৎসুক, সে তখন গোপালের সঙ্গে পুণা ভ্রমণে ব্যস্ত। তারপর সবাইকে পরিত্যাগ করে গোপাল একা দেশে ফিরল। পথে দেখল মধ্যভারতের দ্রষ্টব্য স্থানগুলি।

সপ্তম ও অষ্টম গ্রন্থ **উৎকল ও উত্তর ভারত পর্বে** সাক্ষাৎভাবে মামা-মামী-স্বাতির কথা নেই। তবে স্মৃতিচারণের খিড়কি পথে তাঁদের আবির্ভাব ঘটেছে মুহুর্মুহু। পুরীর সমুদ্রবেলায় ভুবনেশ্বরে ও কোনারকে গোপাল ঋতার মধ্যে স্বাতিকে প্রত্যক্ষ করেছে। আবার বারাণসী ও হরিদ্বারে গোপাল সাবিত্রীকে বলেছে স্বাতির কথা। মসুরিতে চাওলা ও মিত্রার সঙ্গে তার দেখা হয়েছে। তারা বিবাহ করে সুখী হয়েছে। গোপালকে দিয়েছে নূতন জীবনের প্রেরণা। তার হৃদয় জুড়ে আছে স্বাতি, সুতরাং সাধ্য কি সে স্বাতির ভাবনা বাদ দিয়ে দৃশ্যমান স্থান-কালের সবটুকু রস আহরণ করে? তার সব ক'টি আনন্দ ও বিষাদের মুহূর্তে স্মৃতির সুতোর টানে অনিবার্য ভাবেই স্বাতির প্রসঙ্গ এসে পড়েছে।

এর পর বর্তমান গ্রন্থ **হিমাচল পর্বে** গোপাল আবার মামা-মামী ও স্বাতির সঙ্গে মিলিত হয়েছে। সে আবার তাঁদের ভ্রমণের সরিক। এই পর্বে স্বাতির ভূমিকা গোপালের চেয়ে কম নয়। সিমলায়, অমৃতসরে ও কাঙ্গড়া উপত্যকায় ভ্রমণের অবকাশে আমরা দুজনের মুখেই শুনি জীবনের জয়গান।

অপরূপ শোভাময় হিমাচল প্রদেশের বিচিত্র সৌন্দর্য-সুষমার বর্ণাঢ্য বর্ণনা এই পর্বের অন্যতম আকর্ষণ।

অমিয়রঞ্জন মুখোপাধ্যায়
প্রকাশক



রম্যাণি বীক্ষ্য

